বিদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

এক

অকথ্য কথন। সে বিত্তান্ত কওনের নয়, বলনের নয়। তবু যদি সে বিত্তান্ত শুননের জন্যে মন আনচান করে তবে ফিরে যেতে হবে বাইশ বছর আগের পূববাংলার আসমানে জমিনে। সাহজাদপুরের আরও অনেকটা দক্ষিণে লাঙ্গলমুড়ার চর পেছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে যেতে হবে দোয়ালী গাঁয়ের বকুলতলার ধারে একটা ছোট কুঁড়ে ঘরে। সেখানে সেই ছোট্ট ঘরে অন্ধকারে চাঁদ ওঠে, রূপসায়রে জোয়ার ভাটা খেলে, আর জোয়ার ভাটার খবর জেনে নাও চালিয়ে অরূপরতনের সন্ধান করে বিদ্যেধরী।

অকথ্য কথন। সে বিত্তান্ত কওনের নয়, বলনের নয়। বিদ্যেধরী রসের তরী বায়, জোয়ার ভাটার আনাগোনায় সন্ধান চালায়। কে জানে কখন চাঁদ ওঠে আর মাছ ধরা পড়ে জালে। জাল পেতে বসে থাকে বিদ্যেধরী। ধরা দেয় না, ধরা পড়ে না। শুধু ধরতে চায়। ধরা কি যায়? অত সহজ কর্ম নয়। বিদ্যেধরী জাত পাটনী। যাওয়া-আসার বিরাম নেই তার। তার সে বিত্তান্ত কেই বা বোঝে। কেই বা শোনে? শুনলেই কি বোঝা যায়।

অকথ্য কথন। সে বিত্তান্ত তবু যদি শোনবার জন্যে মন টনটন করে, তবে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে সায়েরের মেলা শুরু, সেদিকে চোখ ফেরাতে হবে। নিতাই চাঁদের জন্মদিনে সায়েরের খ্যাপা খেপীর মেলা। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিটি পড়ে ফাল্গুনে। তখনো শীতের দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে গা শিরশির করে। আবার দুপুরের চাঁদিফাটা রোদে গা চিড়বিড় করে। সকাল আর বিকালের রোদ বড় মিঠে। শীতও নয়, গরমও নয়, একটানা হাঁটো। সড়ক পেরিয়ে বাঁদিকে ঘোর। একটা ছোট খাল পেরোতে হবে হাঁটু অব্দি কাপড় তুলে। খালটার যমুনার সঙ্গে যোগ, জোয়ার ভাটা স্রোত আছে। বোঁচকা-বুঁচকি সাবধান। চ্যাঙারি ধামা সাবধান, একবার জলে পড়লে স্রোতে টেনে নিয়ে যাবে। পার হবার সময় টিপে টিপে পা ফেলতে হয়। স্রোতের টানে পা ফসকালে নাকানি-চুবুনি।

এক মন না হলে পার হওয়া বিপদ। দু'মন তিন মন হয়েছ কি স্রোতের মুখে কুটো, মন এক করে পার হও। এদিক ওদিক তাকিও না, পায়ের নিচে স্রোত বড় জবর।

পড়েছে। কালোপানা ধামড়া ছেলেটা পড়েছে। বিন্ধেশ্বরী এপারে এসে হেসে খুন।

ওর পরেই আসছিল একটা যাত্রা দলের গোটা বারো চোদ্দ মনিষ্যি। ছ্যামড়ার দল। সঙ্গে জন দু'চার ভারিক্কি মানুষ। দুটো বেঁটেখাট ঘোড়ার পিঠে যাত্রা দলের সাজসরঞ্জাম। ওদেরও গন্তব্য সায়েরের মেলা। খাল পার হয়ে আরও সাড়ে তিন কোশ পথ পেরোতে হবে। সন্ধ্যার মুখে পৌছোন যাবে কি যাবে না সেইটেই ভাবনা।

বিন্ধেশ্বরীর শাড়ি তখনো হাঁটুর ওপরেই। হাঁটু পর্যন্ত ভিজে। একটু শুকোলেই শাড়ি নামাবে। নাম'বে আর কদ্দুর? হাঁটুর নীচে আর না হয় আঙুল পাঁচেক। খাট শাড়ি। এখানকার জোলার তাঁতে বোনা। বুক পেঁচিয়ে শাড়ির আঁচল উঠেছে কাঁধে, কিন্তু তাতেও সবটা আব্রু হয় না। নাই বা হোল, বাইরের আব্রু যেমন তেমন, মনের আব্রু ওর বড় জবর।

ওর বাপের মৃত্যুর খবরটা কে না জানে! মৃত্যুই বা বলা কেন, অপমৃত্যু! সে মৃত্যুর কথা ভাবলে গা জারিয়ে ওঠে। বকুলতলার পূবেও নয় দক্ষিণেও নয়, কোণাকুণি দিকে একটা বিল, বিলের পাড়ে বটগাছ একটা—গাঢ় সবুজ ঝাঁপালো মাথা নিয়ে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছ তলায় কচি-কাঁচা ছেলেপুলে মরে গেলে পোড়ান হয়, এধারে ওধারে দু-চারখানা পোড়া কাঠের টুকরো চাদর কাঁথার টুকরো। পাশে বিল। কোথাও এক হাঁটু জল, কোথায়ও বা এক মানুষ। ডাঙায় জোলো জমি। পাঁকের সোঁদা গন্ধ। পাঁকের ওপর টুক টুক করে লম্বা লম্বা হাল্কা পা ফেলে অক্লেশে বেড়ায় বক, বিলে হাঁস আর কাদাখোঁচা।

ওখানে কি করতে গিয়েছিল বিন্ধেশ্বরীর বাপ কে জানে? রাতবিরেতে ওই সব স্থানে শনশনে হাওয়া আর হাওয়ার আগে পাছে চলেন তেনারা। তেনাদের এক একটা ঝাপটায় ডাল ভেঙে পড়ে। আর মনিষ্যির ঘাড় তো নরম বস্তু। ঘাড় মটকে গিয়েছিল নিশ্চয়। ভোরে দেখা গেল দাস খ্যাপার মুখখানা বিলের ধারে পচা পাঁকের ভেতরে কে যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে। পাঁকের ভেতরে মুখখানকে একেবারে সেঁদিয়ে দিয়ে দমবন্ধ করে মেরেছে। ঘাড়টা কি আর মটকায় নি, নিশ্চয় মটকেছে। তেনাদের অসাধ্যি কিছু নেই। বাতাসের আগে পাছে চলেন। দুত্ত রে বাপু রাতবিরেতে ওই সব স্থানে যাওয়া।

এ সব সুজনের কথা। কুজন মুচকি হাসে। সব জানা আছে। এসব বেহ্মদত্যি আত্মা ফাত্মার কম্ম নয়। দাস খ্যাপাকে মেরেছে। পাঁকে জোর করে মুখ সেঁদিয়ে দিয়ে চেপে ধরে দম বন্ধ করে মেরেছে। এ সব বিত্তান্ত কি আর ঢাকা রাখা যায়। মেরেছে জুড়ান। ধামড়ধস্তি যুবাপুরুষ জুড়ান। পিঠখানা মস্ত ঘামে ভেজা কাছিমের

পিঠের মত নীখেঁট। দেহখানা খাট. শক্ত যেন গাব ভেজান কাঠের মত। ওই নাটা জুড়ান মেরেছে দাস খ্যাপাকে।

না বললেও বোঝা যায় অনেক কিছু। কত জলে কত মাছ, আঁসটে গন্ধে বোঝা যায়।

খ্যাপার কাছে কিছুকাল ধরে গতাগতি ছিল ওর। নাটা জুড়ান দাড়ি রেখেছিল, খ্যাপার কাছে সাধনভজন করত। খাটো একখানা কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে কোমরে কাপড়ের একটা দিক আঁট করে বেঁধে মাঝে মধ্যেই বকুলতলার ধারে তাকে দাঁড়িয়ে বসে থাকতে দেখা যেত। চোখদুটি সব সময়ই করমচার মত লালচে। কুজন বলে কল্কের গুণে। কল্কের দোষ অথবা গুণ খ্যাপারও ছিল। দমের কাজ করতে হয়, দম না দিলে চলবে কেন ?

সুজন বলে, নাটা জুড়ান কল্কের লোভে যেত বকুলতলায় দাস খ্যাপার কুঁড়ে ঘরে। কুজন বলে, ও সব তামাসার কথা রাখ। আসলে নজর ছিল ওর বিন্ধেশ্বরীর ওপর।

নাটা জুড়ান ভ্যাড়া বনে গিয়েছিল। দিন রাত পড়ে থাকত দাস খ্যাপার কাছে, দমের কাজ করত তখন। নিশ্বাস প্রশ্বাসে দমের কাজ,—খ্যাপার একতারাটা নিয়ে দু-চারবার মনের আনন্দে গান ধরবার চেষ্টা করেছিল। ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় ধরেছল, অ গুরু, আমি ত' জানি না সাতার। আমারে মাইর না চুবাইয়া! গুরু গ-গ অ-অ-অ।

সুরের টানের চোটে দুটো কাক উঠোন থেকে কা-কা করতে করতে পালিয়ে গেল। একটা বাচ্চা বকুলগাছে উঠতে গিয়ে চেঁচানি শুনে দুম করে পড়ল। বিন্ধেশ্বরী হেসে খুন। অরে আমার গাওনদার! গাওনা শুইন্যা গাদা হাইস্যা মইল। নাটা জুড়ান—গুরু—গ-অ-অ-অ—থামল।

ওটা ওর হলো না। খ্যাপা দাস অনেক তালিম দিয়েও ওর দ্বারা ওই দমের কাজটা কর্যাতে পারল না। তা না পারুক। মাঝে মধ্যে কুমড়োটা লাউটা কখনো বা একটা আস্ত তরমুজ নিয়ে আসে নাটা জুড়ান। চুরি করে আনে। খ্যাপা জানে না।

বিন্ধেশ্বরীর কেমন একটা সন্দেহ হয়। কনে পাইলা ফলফলারি ?

চাইয়া চিন্ত্যা নিয়া আইলাম।

নাটা জুড়ান হাসে। সামনের দুটো দাঁতের মধ্যের ফাঁক দেখা যায়।

কুজন বলে, জুড়ান নাকি বিন্ধ্যাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চেয়েছিল। গুরুকন্যা তা হউক, বিয়া করলে কিছু অধর্ম নেই। খ্যাপা কিন্তু রাজী নয়। বিন্ধ্যা শুনে হেসে খুন। জলের কাছিম আকাশের চান্দ ধরতে চায়। সখের বলিহারী! হাসনেরই কথা।

নাটা জুড়ান নাছোড়বান্দা। গায়ের জোর ওর আছে, দমের জোরও বেড়েছে। নাটা জুড়ান ছাড়বে না। একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চায়। দাস খ্যাপা নারাজ। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে মিটি মিটি হাসে।

—আর শোন, হালায় শোন, মুখ বুইঝ্যা নে।

রসিক যে জন প্রেম জোয়ারে রসের তরী বায়। তারা জোয়ার ভাটার খবর জাইন্যা সন্ধানে তরী চালায়। ডুবাক বাজে। শুধু ডুবাক। বিন্ধেরী খঞ্জনী বাজায়।

প্যামত্যা হয় প্র্যামের থানা, লোভী কামুক যাইতে মানা। সাধু বাইয়া বাইয়া যায়।

নাটা জুড়ানকে বোঝান দায়। দাস খ্যাপার কথাতেই দাস খ্যাপাকে ঘায়েল করতে চায়।

পিকিতি লইয়া সাদন।

নাটা জুড়ান প্রকৃতি চায়। ভজনের জন্যেই প্রকৃতি চায়। প্রকৃতি ছাড়া আবার কিসের সাধন! ও সব কথা জুড়ান মানবে না।

দাস খ্যাপা বুঝোয়। সে পৈঠেয় উঠতে তোর দু-চার জন্ম কাটাতে হবে।

নাটা জুড়ানের খাট দেহটা আরও শক্ত হয়, কল্কে নিয়ে চোখ লাল করে গুম হয়ে বসে।

কুঞ্জন বলে, নাটা জুড়ানই মেরেছে দাস খ্যাপাকে।

আশ্চর্য তামাসা এই, দাস খ্যাপা এত সিধ্যা এত ঝাড়ফুঁকে উদুরি-ভাজার, বাত, কফ, জ্বর পিত্ত ভাল করে, জলে ডোবা নাওয়ের খোঁজ বলে দেয়। বৃষ্টির দিনক্ষণ বলে দেয়, সে কিনা জানতে পারল না জুড়ান ওকে মারবে আর তার কোন পিতিকার করতে পারল না? তাজ্জব কারখানা।

কথাটা কিন্তু সত্যি নয়, প্রতিকার করতে যে খ্যাপা ঈশান দাস পারেনি তা নয়। মরবার পর তার আত্মা কার্য করেছে। বেশিদিন নয়, একদিনের ভেতরেই নাটা জুড়ানের রক্তবমি রক্ত বাহ্যি। ব্যস, জুড়ান চোখ কপালে তুলল। মৃত্যুর পর ওপারে গিয়েও কি দাস খ্যাপা তাকে ছাড়বে? হাওয়ায় হাওয়ায় লড়াই চলবে। দেখা যাক হাওয়ার আগে পাছে ঘোরে কিনা।

কিন্তু খ্যাপা রাতবিরেতে অমন জায়গায় গেল কেন? কারণ একটা ছিল। ছাদেক ফকির থাকে ওখান থেকে দু' রশি তফাতে। বটগাছটা ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে বেশ কিছুটা গিয়ে জোলাপাড়ার কাছে একটি ঘরে থাকে ছাদেক ফকির। মুরশেদের কৃপায় তার সিদ্ধি সামর্থ্য অনেক বেশি বলেই লোকে জানে, তার ছেঁড়া বস্ত্রের একটা

টুকরো পেলে এবং ধারণ করলে উঙুরি-ভাদুরি, জ্বর জ্বালা সব ভাল হয়ে যায়। জোলাদের সব মুস্কিলের অবসান এই ছাদেক ফকির। মাঝে মধ্যে দাস খ্যাপা ছাদেক ফকিরের কাছে যেত রাতবিরেতে। মস্ত একটা রোয়াইল গাছের তলায় ছোট একটা ছাপরা। গোটা দুই নারিকেলের মালাই আর একটা পুরোন সারিঙ্গা। ছাদের ফকির এই নিয়েই আছে। সারিঙ্গা কাঁধে নিয়ে নারকেলের মালাই নিয়ে ভিক্ষেয় বেয়োয়। মুরশেদের নাম আর তাঁরই দয়ার কথা শোনায় ফকির।

দাস খ্যাপা গহিন রাতে ওর কাছে গতাগতি করত রসের ভিয়ান জ্বাল দিতে। দমে দমে রসের ভিয়ানে নাড়াচাড়া। নীরে-ক্ষীরে একাকার। গুরু মুরশেদ একাকার। দাস খ্যাপা সেই সন্ধানে যেত ফকিরের কাছে। ফকির নাকি সন্ধান জানে। এ গহিন রাতে গহিন জলের কথা। কেই বা বলতে পারে।

সে রাতেও বোধ হয় ফকিরের কাছেই যাচ্ছিল ঈশান দাস।

মাঝ পথে নাটা জড়ান তার গেঁটে হাতের কাঁকড়া চিপুনিতে ধরেছিল তাকে। ফেলেছিল পাঁকে।

মরতে মরতেই কি সিদ্ধা খ্যাপা বাণ মেরে দিয়েছিল তাকে? তা হবে। তা নইলে ফিরে ঘরে গিয়ে রক্তবমি!

কুমি বলে—বাণের কথা যদি কও, জড়াইন্যার নিকাশ করছে খেপী।

বাণ নাকি মেরেছিল খেপী, বিদ্যাধরী। ও তখন দমের কাজ করছিল, অক্লেশে টের পেয়েছিল। এর পরেই জড়ান ধেয়ে আসবে তার দিকে। সেই সময়েই বাণ মেরেছিল। বিদ্যেধরী বড় ভয়ঙ্কর মাইয়া। জাত সাপের মত।

কুমি থাকে বকুলতলায় বিদ্যাধরীর ছাপরার কাছাকাছি খেজুর গাছটার কাছে। কালো কুচকুচে মেয়েমানুষ কুমি। বড় ডেয়ো পিঁপড়ের মত চকচকে কালো। কুমির ভাই আছে একটা ছোট বছর দশেকের। জাতে মালী, বাবুদের বাড়ির উঠোন ঝাঁট দেয়, ময়লা পরিষ্কার করে। ভাই যাই করুক, মালিনীর কাজ কুমি পছন্দ করে নি। যদিও হাটে মেলায় ঘর নিয়ে বসে না, তবু সবাই জানে। কুমির ছাপরায় রাত্তিরে মানুষের যাতায়াত আছে। সন্ধ্যের পর ঘরে লণ্ঠন জ্বালাবার কিছু পরেই গা ঢাকা দিয়ে ওর ছাপরায় আসে কবিরাজ মশাই। দয়াল কবিরাজ।

বয়েস ষাট হলেও বেশ শক্ত সমর্থ মানুষ। নিয়মের ব্যতিক্রমটি হবার জো নেই। রাত্রে অনিদ্রা স্নায়ুর পক্ষে হানিকর। তাই সন্ধ্যের কিছু পরেই মাঝে মাঝে বেতঝোপ, পিঠা কুমড়ার গাছের তলা দিয়ে নোংরা একটা পথে কুমির ঘরে চলে আসে। পথটা বাবুদের বাড়ির পেছন দিকের পথ। আবর্জনা ফেলবার আর বাসন-কোসন মাজবার জায়গা। ওদিকটায় লোকজন চলাচল প্রায় করেই না। ওই পথেই আসে

দয়াল কবিরাজ। কাকপক্ষী টের পায় না। কবিরাজ মশায় ভাবে তাই। কিন্তু বাতাসের চোখ আছে। গাছ-গাছালির দৃষ্টি আছে। সবাই জানে কবিরাজ মশায় কুমির ঘরে যায়। শুধু কবিরাজ মশায় জানে না যে কথাটা সবাই জানে।

পথটা আসতে এক-আধ দিন কষ্ট হয়। মোটা বেঁটে মানুষ। ঘরে ঢুকেই ঝাঁপটা নিজেই বন্ধ করে দেয়।

তার আগেই কুমি চুলে মশলা দেয়া তেল মেখে পাতা কেটে জোলাদের বোনা তাঁতের লাল শাড়িটা পরে বসে বসে পান চিবোয় কবিরাজ মশায়ের জন্যে।

একদিন বলে,—গলাডা শুকাইয়া গ্যাছে গা।

—জল খাইব্যান ?

—আস্পদ্দা তর কম না রে মাগী। তর হাতে জল খামু ? কথাডা কইলি কি বুইল্যা ?

কুমির হাতের জল খাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না কবিরাজ মশায়। আরে রামো, রামো। বিশেষ করে কবিরাজ মশায় সাত্ত্বিক মানুষ।

তারপর বাড়ি ফিরে স্নান করে শুদ্ধ কাপড় পরে জপে বসে কবিরাজ মশায়। দিনের পাপ দিনে খণ্ডন। জমা করা-করি নেই।

কিন্তু তাই বলে ওর হাতের জল গলাধঃকরণ করা। রাম রাম হরি হরি।

মাসে মাসে পাঁচটা করে টাকা দিত কবিরাজ মশায়। বলে-কয়ে আরও আট আনা বাড়িয়েছে কুমি। তাতেও ওর কুলোয় না। আলতা, ফুলেল তেল, বছরে চারখানা শাড়ি, খাওয়া-পরা সব কি কুলোয় ? ভাইটা মালীর কাজ করে। উঠোন ঝাঁট দেয়, বাগানে কোদাল চালায়, আম পেড়ে দেয় আগডাল থেকে। বাবুদের বাড়ি থাকে, খায়। দু' টাকা মাইনে পায়। পূজো-পার্বণে দু'খানি ধুতি, একটা গামছা। দিদির কাছে আসে দুপুরে। বাবুদের বাড়ির আচারটা, আমটা, জামটা, মুড়ি, জিলিপী নিয়ে আসে। দিদিকে দেয়। দিদির পাশে শুয়ে একটা ঘুম দেয়। নয়তো দুপুরে বেরিয়ে যায় আর পাঁচটা ছ্যামড়ার সঙ্গে গাব পাড়তে বা তেঁতুল খেতে।

খেপীর সঙ্গে কুমির পরাণের টান দু'-চার দিনের নয়। ছোটবেলা থেকেই দু'জন একসঙ্গে খেলা করেছে, ঝগড়া করেছে। সাঁতার কেটেছে, শাপলার মালা গেঁথেছে, বিলে গিয়ে পদ্মপাতা এনে পিঁপড়ে ধরে পুষেছে। খেপীকে ও জানে। পরাণ দিয়ে জানে। বিদ্যাধরী ভিক্ষে করে খায় বরং বলা যায় গান বেচে।

কুমি জানে ও বড় জাঁহাবাজ মাইয়া। কাক শকুন ঠোকরাতে এলে রুখতে জানে বিদ্যাধরী। ওর নিজের যৌবনের উজানে নিজেই চান করে খেলা করে আর নাকি অপেক্ষা করে একজনার—ওর মনের এক আশ্চয্যি মানুষের। এসব কথা কুমি

ভাল বোঝে না। ও চিল শকুনের ঠোক্করে আর ঝাপটা-ঝাপটিতে নিজের যৌবনকে নিঃশেষ করে দিতে দিতে বিন্ধেশ্বরীর কথা ভাবে। পরাণটা টনটনিয়ে ওঠে। হিংসেও হয়, খুশিও হয়।

নাটা জুড়ান খেপীর কিছু করতে পারবে না কুমি জানত।

প্রথম প্রথম অতটা বুঝতে পারে নি। ভেবেছিল বিন্দা খেপী এইবারে বোধ হয় মজল। নাটা জুড়ান ওখানে গিয়ে জুটল কেন? নাটাকে ও চেনে। ওর কাছে দু'-চারদিন এসেছিল। একদিন চারটে পয়সা নিয়ে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার পর আর কুমি ওকে নিজের ঘরে আসতে দেয়নি। হঠাৎ কিছুদিন বাদে একেবারে ঈশান খ্যাপার চেলা হয়ে উঠল কি করে জুড়ান! ওর ভেতরের জন্তুর লালামাখা দাঁত দেখেছে কুমি। নাটা জুড়ানকে তার চিনতে বাকি নেই, নজরটা ওর কোন্‌দিকে। বিন্দা খেপীর দিকে সন্দেহ কি?

দিনকতক পরে বকুলতলার ছাপরার ধারে দাঁড়াল বিকেলে। তখনো সূর্য ডোবে নি। দূরে গাছ-গাছালির আগায় রোদের চিকচিকে আভা রয়েছে। বকুল গাছটার মাথায় পাতার ওপর ছিটে ছিটে নরম রোদ। নিচে ঘাটে ছায়া ছায়া অন্ধকার হয়ে আসছে। ঘাটলার কাঠখানার ঠিক পাশে একটা কুকুর এসে হাঁপাতে হাঁপাতে জিভ বার করে জল খাচ্ছে।

কুমি গা ধুয়ে উঠল। ভিজে কাপড় দু' ভাঁজ করে গায়ে জড়াল। ফাঁকা রাস্তা মাঠ, কত রকমের জনমনিষ্যি যায় আসে। বাইরে লাজলজ্জা কুমির একটু বেশি। খেপীর আবার ঘরবার সমান। ঘরেও যেমন, বাইরেও তেমন। সরম ঘেন্নার বেশি কম নেই। ওই এক পদের মাইয়া।

মাটিলেপা ছোট উঠোনটায় বসে পুরোন সারিঙ্গার তার কসছিল বিন্দা। বাপ ঘরে নেই। বোধ হয় বলে গেছে সারিঙ্গার তারটা বেঁধে রাখতে। ওর পেছনে লাউগাছের গোড়া। লাউডগা তরতরিয়ে উঠেছে ছাপরার চালে। চাল ভর্তি লাউডগা আর লাউ ফুল। বিন্দা একটা চট পেতে বসে তার কসছে।

একটু সময় দাঁড়িয়ে দেখে কুমি একটা হাঁক দিয়ে বলল,—অ খেপী, তর ঘরে নি মানুষ আইল?

মোটা তারটা আঁটতে আঁটতে চোখ তুলল বিন্দা। মস্ত কাঁসার বাটির মত চকচকে মুখখানা। দম ফেলে একটু হাসল। তারটা বেশ জুত করে লাগান হয়েছে। কানটা মোচড়াতে মোচড়াতে তারটা টান টান করে আঙুলে আওয়াজ তুলল—ডুং-ডুং-টং—

সারিঙ্গার ছড়িটা ঘরে। আঙুলে আওয়াজ তুলে গলা ছাড়ল খেপী।

হায়রে পিরীত কেমুন জানল্যাম না। মন-দরদী খুইজা পাইলাম না।

মস্ত চোখ দুটো যেন রসে ভরা দুটি লিচুর মত। স্বচ্ছ পরিষ্কার। হাসি হাসি খুশি লেপটে রয়েছে মুখখানা। ছাপরার ছায়ায় উঠোনটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। ভিটের তলায় নাবাল জমিনের ওপারে একটা গাছপালা জঙ্গল, চালতে আর বেত বন। হাওয়ায় হাওয়ায় পাখীর কিচির-মিচির ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছে। তারও ওধারে বেশ দূরে বাবুদের বাড়ির জয়কালী মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। অস্পষ্ট অনেক রকম আওয়াজ খেপীর গানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে।

নয়ডা দুয়ার খুইল্যা রাখলাম, ভেতরে ঢুকল যন্ত্রনা। মন-দরদী খুইজ্যা পাইলাম না।

কুমি থমথমিয়ে তাকিয়ে থাকে। খেপীর গাওনা শুনলে নড়তে পারা যায় না। যেমন আছ তেমনি থাক, যেন পাথর বানিয়ে দেয়। একটু নড়তে-চড়তে ভয় করে। নিশ্বাসের বায়ু কণ্ঠায় এসে থম্ ধরে।

খেপী নিশ্চয় মন্তর-তন্তর জানে, নইলে ও আওয়াজ তুললে সবশরীর ঝিম ধরে যায় কেন। পরাণটা যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে থাকে কেন? কি গুণ-তুক আছে ওর আওয়াজে।

বড় ভয়ানক মাইয়া। কমি জানত, বিন্ধ্যা একখান সোজা মাইয়া নয়।

নাটা জড়ানকে মেরেছে বিন্ধ্যা খেপী। এতে ওর কোন সন্দেহ নেই।

বাইরের আব্রু যেমন তেমন, মনের আব্রু ওর বড় জবর। তাই সায়েরের মেলায় যেতে যেতে খালটা পেরিয়ে বিন্ধ্যা যখন হাঁটুর ওপর কাপড় তুলল, কুমি কিছু বলতে পারল না।

যাত্রাদলের কালো ধিনকেষ্ট গদাধরের মত ছেলেটা যখন খালের জলে চুবুনি খেল, আর বিন্ধ্যা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, তখনো কিছু বলতে পারল না। কুমি জানে, খেপীর মনের আব্রু বড় জবর।

বাপতো মরে গেছে—বছর ঘুরতে এল। এখন পর্যন্ত কোন জুয়ান মরদ ওর কাছে ঘেঁষতে পেল না। দু-একজন যে চেষ্টা করে নি এমন নয়। কানাকান্দির দাউসা পাল দু-একবার ঘুর-ঘুর করেছিল ঘাটের কাছাকাছি। দাশু পাল মস্ত ব্যাপারী। পাটের ব্যাপারী। আণ্ডিল আণ্ডিল টাকা। কোত্থেকে খবর পেয়ে এখানে ঘুর-ঘুর করেছিল কিছুদিন। ঝোপে-ঝাপে কথাটা পাড়বার চেষ্টা করছিল।

কুমির সঙ্গে বিন্ধ্যা একদিন গা ধুতে এসেছিল বকুলতলায়। কুমির সামনেই দু-চার কথার আদান-প্রদান হোল। বিন্ধ্যা কিন্তু একটুও চটে নি। হাসছিল।

দাউসা ব্যাপারী এদিক-উদিক তাকিয়ে কুমিকে লক্ষ্য করেই বলেছিল,—এডি কার কন্যারে। এয়ানে তর সঙ্গে দেখি ক্যান? থাকে কনে?

বিদ্যাধরী জবাব দিল। কুমি কিছু বলবার আগেই বলল,—এয়ানে ত' পাটের চাষ নাই। তোমাক্ ক্যান এয়ানে ফুচি-ফাচি দিব্যার দেহি?

পাটের ব্যাপারী দাসু মুখের ঘাম মোটা মোটা আঙুলে মুছে হাসে,—বুঝব্যার পারছস ক্যান আসি? তয় কথাডা পাকা কইর‍্যা কইয়া ফ্যালা।

বিদ্যা খেপী হেসে খুন।—কয় কি লো কুমি! ব্যাপারী পাট চেনে, মাইয়া চিনল না। মাছ ধরব্যার চায়, ঘাট চিনবার পারে না। বলি অ ব্যাপারী, আগে ঘাট চিন্যা লও, তয় স্যান চান্দ ধরা পড়ব।

দাউসা বলে,—ঘাটেই ত' আইছি।

—আঘাটায় কুমীর আছে, তাও জান না ব্যাপারী?

বিদ্যা ঝলকে ঝলকে হাসে। কুমিও হাসে। কথার মানে সব বোঝা যায় না, তবু বোঝা যায় ব্যাপারীকে নিয়ে তামাসা করছে বিদ্যা। তামাসাই করে। একটুও রাগে না। কুমি কখনো কারো ওপর রাগতে দেখে নি বিদ্যেকে। হাসতে জানে, চোখা চোখা কথা কইতে জানে। আর কুমির মনে হয়, গুণ-তুকও জানে।

দাসু ব্যাপারীকে কি যে করে দিলে খেপী। ঘাট থেকে ধরে নিয়ে এল উঠোনে, —আইস, বইস, জুত কইর‍্যা বইস, গান শোন। পাটের ব্যাপার নিয়া কাল কাটাইল্যা, মানুষের ব্যাপার জানলা না।

কুমি কলসীটা উঠোনে রেখে মজা দেখতে দাঁড়ায়। ও জানে, বিদ্যা খঞ্জনী নিয়ে আওয়াজ তুললে দাসু ব্যাপারীর কমুঝুমু সব ভেঙে যাবে। মুখের ত্যাড়া-বাঁকা হাসি থাকবে না। কিছুক্ষণের জন্যে ব্যাপারীর বুকের হাওয়া কণ্ঠে এসে থমকে যাবে। দম ফেলতে পারবে না। মন্তর-পড়া সাপের মত থির হয়ে নুয়ে পড়বে।

বিদ্যা আওয়াজ তুলল,—

আগে তর ষোল আনা করগা ঠিক।

নদীর তলে ফান্দ পাইত্যা চান্দ ধরবি যদি ও রসিক।

বলিহারী। কুমি যা বলেছে তাই। ব্যাপারীর চোখ থির, দম কমে আসতে আসতে থম্ ধরে গেছে। কুমির অবস্থাও তাই। ওর আওয়াজের হাওয়া বুঝি বুকের হাওয়ায় মিলে তাকে থমকে দেয়। চমকে দেয়। কি করে কে জানে!

ওরা নাকি দমের কাজ করে। হাওয়ার খবর জানে। তাই কি ব্যাপারীর বুকের হাওয়া রোধ করে দিতে পারলে কণ্ঠে। আওয়াজের হাওয়া ভারি মজার। গান সবাই গায়, হাওয়ায় ঠিকমতে আওয়াজ তুলতে পারে না।

কোথায় বা পাটের চাষ। গঞ্জের দর। আর আণ্ডিল আণ্ডিল টাকা! ব্যাপারী তখন অন্য হাওয়ায়। বুকের বাতাস ভাটায় চলেছে। উজানের বুকভাঙা টান নেই।

আগে ওর ষোল আনা করগা ঠিক।

ষোল আনার ওপর সতেরো আনা ঠিক করেই এলেন দাউসা ব্যাপারী। বেশ জমিয়েও তুলেছিল। কুমির সঙ্গে বিত্মাকে দেখে ভরসাও পেয়েছিল। কুমিকে সে জানে, হাটের দ্রব্য না হোক, টাকায় এ দ্রব্য মেলে। কুমিকে পাটের মত টাকায় কেনা-বেচা করা যায়। তার সঙ্গে যখন এ খেপীটা ঘোরাফেরা করছে, তখন এটাও নিশ্চয় তাই। টাকার কথাটা নিজে না পেড়ে বিত্মার কাছ থেকে পাকা কথা শুনতে চেয়েছিল।

ষোল আনার ওপর সতেরো আনা বোঝে পাটের ব্যাপারী। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু কি যে একটা আওয়াজ তুললে। হাওয়ার টানে যেমন আওয়াজ আছে তেমনি আওয়াজ। হাওয়ায় আর আওয়াজে কেমন মিলে মিশে যায়।

ব্যাপারীর মনে আর কাণাকড়িও রইল না। সব ঠিক করা সতেরো আনা হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

—বাইর‍্যা, বাইর‍্যা গাইছস্। আর একখান শুনা।

মজা লেগেছে ব্যাপারীর। বুকের হাওয়ায় কাঁপুনী। কেমন একটা খুশির কাঁপুনী উঠেছে।

ওর ঠিক করা সতেরো আনা বুদ্ধি সেদিন মাটি। কোন কাজে লাগল না।

গান শুনল। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা আস্ত টাকা বার করে বিত্মার হাতে দিয়ে সেই থমথমে বুক আর আনমনা চোখ গিয়ে পথ ধরল। কানা-কান্দির পথ। কে জানে কতক্ষণ এই আচ্ছন্ন ভাবটা থাকবে। বেশ কিছু সময় পরে হয়তো মনে হবে, এ য্যাঃ! কিছুই তো হোল না।

আবার মনে হবে, কিছুই কি পায় নি, কিছু পেয়েছে।

যা চাইতে চেয়েছিল, তা পাওয়া গেল না।

কিছু পেল। রোদপড়া বিকেলে কিছু খুশি পেল। সে তার পরাণডার ওপর কেমন একটা মজা টের পেল। এ মজাটুকুর দাম আর যা চাইতে গিয়েছিল তার দামের সঙ্গে দর কষাকষি করতে বসল হয়তো ব্যাপারী। এ কারবারের হিসেব-নিকেশ করতে গেলে রাতভোর হয়ে যাবে।

কাজ নেই আর ওসবে।

কুমির মনটা বড় জ্বালা করছিল। খেপীর সঙ্গে তার আর বোধ হয় মেশা চলে না।

সে কি! আর খেপী কি! এক-একবার ভেবে বড় দমে যায় কুমি। খেপী কেমন আলগোছে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছে, কোন ব্যাটার সাধ্যি হচ্ছে না তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে। কি করে পারে ও? কি পেয়েছে ও, যার জন্যে দেহের সুখকে সুখ বলে মানতে চায় না। চৈত মাসের কাঠফাটা রোদের মত দেহটা ওর জ্বলে না, চিড়বিড় করে না তাপে-উত্তাপে। কোত্থেকে এত ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস পায় দিন-রাত, ব্যাটাগুলোর সামনে অক্লেশে অমন ভিজে ব্যানার মত ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পারে! মিটিমিটি হাসতে পারে মজা পেয়ে। কিসের মজা পায় ও!

কুমি অতসব বোঝে না, ও একটি মাত্র সুখ জানে, দেহের সুখ। কালো পাথরের মত দেহটিকে নিত্য তেলেজলে মাজা-ঘষা করে। খিদে পেলে আধ সের চালের ভাত খায় গোটা চারেক পেঁয়াজ দিয়ে আর কাঁচা মরিচ দিয়ে। তারপর হয়তো খেল খানিকটা চালতে মাখা। খুব কসে নুন মরিচ ডলে নিয়ে টকে ঝালে টং হয়ে ওঠে। লালার শোসানী বেশ ভাল লাগে। তারপর চাটাই অথবা ছোট শীতলপাটিটি পেতে ঘুম। দিব্যি টসটসে চোখ-মুখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠে বিকালে ফুলেল তেল চাঁদিতে কপালে দিয়ে পাতা কাটা, বিকেল গড়াবার আগেই বকুল-তলার ঘাট।

না, খেপীর সঙ্গে ওর মিল নেই একটুও। তবু কোথায় যেন একটা মিল। যেন রশি দিয়ে ওর মনের একটা কোনও জায়গা সব সময় টেনে রেখেছে খেপী। কিসের এই টান! না, সে খেপীর সঙ্গে আর মিশবে না। মেশা উচিত নয়।

তার জন্যে খেপীকে মানুষ ভুল বোঝে, ভাবে খেপীও বোধ হয় ভেতর ভেতর নষ্ট। বাবুদের বাড়ি কথাটা নিয়ে একটা গোল উঠেছিল। যেমন কুমি, তেমনি বিদ্যা খেপী, একই পদার্থ। এগুলোকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া উচিত।

না, কি দরকার! বলেছিল মেজবাবু, ওরা তো কারও ক্ষেতি করছে না। ঘরে ঘরে যা মনে নেয় করুক, বাইরে কিছু তেরিবেরি দেখলে মাথা ন্যাড়া করে নেংটি পরিয়ে বিদেয় করে দোব।

বাবুদের বাড়িতেই যখন এমন সব কথা উঠেছে, তখন খেপীর সর্বনাশ করাটা তার আর উচিত নয়।

কথাটা বলেওছিল বিদ্যাকে।

—এউগ্‌গা কথা কমু তরে।

—এউগ্‌গা ক্যান, দশগা কথা কইবার পারস।

—তামসা করিস না। আমি ভাবত্যাছি—

——ভাবনা কিসের?

—তর কথা ভাবত্যাছি। তর লগে আর কথা কমু না। এয়ানে আস্থম না।

—ক্যান? কি অইল?

—অইব আবার কি? তুই আর কথা কইস্ না আমার লগে।

বিন্ধ্যা খুব হেসে উঠল।

মুখ ব্যাজার করে কুমি বলল—আমি নষ্ট হইয়া গেছি গা। মান্‌ষে তক নষ্ট ভাবব।

— আমিও নষ্ট।

—দূর্‌ বালাই। আমার নাগাল জাইত মারা মাইয়ার লগে তর মিশাব কাম নাই।

—আমার জাইত কবে নষ্ট হইয়া গ্যাছে গা। তুই আর আমি একই পদ।

—এডা তুই কেমুন কথা কইলি?

বিন্ধ্যা ওকে জড়িয়ে ধরেছিল।—ঠিকই কইছি। আমার ভিতরে ছয়ডা কুজন আমারে টাল সামলাইবার দেয় না। জাইত লইয়া টানাটানি করে। ছয়ডা দস্যিরে আমি সামলাইব্যার পারি না। বাইরে তুই নষ্ট হইলি, মান্‌ষে দেখল। ভিতরের খপর রাখে কেডা?

অতশত বোঝে না কুমি। ওর কালো কুচকুচে মুখের ভেতর লালচে চোখ দুটো ভেজা ভেজা লাগে। বিন্ধ্যা ওকে চেপে ধরে হাসে।

—ভাবিস না। তুই আর আমি একই পদ। সগ্‌গলেই তাই। ছয় দস্যিরে যে সামলাইব্যার পারে, জাত আছে সেই সাইয়ের। জাইত আর কারু নাই। সগ্‌গলে আমরা এক জাইত।

কি যে বলে খেপী। কিছু বোঝবার উপায় নেই।

কুমি না বোঝে ওর কথা, না বোঝে ওর ভাব-গতিক। মাথাটা খ্যাপা গোছের। মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকে। বরাবরই এমনি খ্যাপা-খ্যাপা ভাব-গতিক।

তা হোক, ওর কথা বোঝা যায় না। কিন্তু গলার মিঠে আওয়াজটা বুকের হাওয়ায় মিষ্টি ছড়ায়। গলাখানা যেন রসে ভিজিয়ে রেখেছে সব সময়। কি যে টান লাগে। চিনির রস জ্বাল দিয়ে দিয়ে যেমন আঠা আঠা করে মোটা দড়ির মত লম্বা করে নিয়ে কদমা বানায়, ও যেন সেই কদমা বানানর মিষ্টি রশি দিয়ে মনটাকে আঠালো করে টানে।

সায়েরের মেলায় বিন্ধ্যেশ্বরী যখন যবার গোছগাছ করল, কুমি ওর পেছন ধরল। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে নিতাইচাঁদের জন্মদিনে সায়েরের মেলা। খ্যাপা খেপী, বাউল বোষ্টম জমায়েত হয় সেখানে।

বিদ্যাধরী বুঁচকি গোছাল। পেছন ধরল কুমি। ধর্ম-কর্ম তো কিছুই হোল না, তবু যদি বিদ্যেধরীর কল্যাণে কিছু ধর্ম হয়। কুমিও পোঁটলা কাঁধে নিল। দুজনেই হাঁটা ধরল মেলার পথে।

দুই

ফাল্গুনের দুপুরে মাটি ফাটা রোদ্দুর। মাঠের আলের মাটি চিড় খেয়ে গেছে। ধুলো মাটির চনচনে গরমে অনেকটা পথ পার হয়ে সূর্য ডোবার বেশ খানিকটা আগে মেলায় পৌঁচেছে বিদ্যাধরী আর কুমি।

মস্ত মাঠে মেলা বসেছে। ছোট ছোট দরমা আর টিনের ছাপরা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ছাপরার সামনে দোকান পেছনে বসবাস। মাঝখানে একটা চট অথবা কাপড়ের আড়াল।

মাঠের উত্তরে গৌরাঙ্গ মন্দির। মস্ত নিতাই-গৌর মূর্তি। মন্দিরটা পাকা অনেকদিনের পুরান, তাই জায়গায় জায়গায় আস্তর খসে পড়েছে। অনেককাল আগের পাতলা ইটের গাঁথুনি বেরিয়ে পড়েছে। তারি ওপর চুনের পোঁচ লাগান হয়েছে। আস্তর করবার সময় ছিল না, নয়তো পয়সা ছিল না।

অধিকারীদের মন্দির। এক সময় সায়েরের অধিকারীরা মস্ত মানুষ ছিল। বাখীর ব্যবসা ছিল। এমন হাটুরে পঞ্চাশ হাটে ছিল না, যারা এদের কাছ থেকে বাখীর মাল না কিনত, আর এমন চাষী ছিল না, যারা এদের কাছে মাল না বেচত। গুড়, চাল, ডাল, কলাই, কমড়ো বহু মাল তারা সস্তার সময় কিনত, বর্ষার আকালে অনেক চড়া দরে মাল ছাড়ত।

ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও ধর্মজ্ঞান ছিল এদের গোড়া থেকেই। অনেকে বলে নিতাই-চাঁদের দয়ায় ওদের পয়সা দেখতে দেখতে পাহাড় হয়ে উঠল। আবার নিতাই-চাঁদের রোষেই নাকি ক্রমে ক্রমে অবস্থা পড়ে গেল। মেলায় আগুন লাগল সেবার। নিতাইচাঁদের সেবার ত্রুটির জন্য যে তাতে আর সন্দেহ কি।

তারই মাস কয়েক পরে আগুন লাগল বাখী মালের গুদামে। লাখ টাকার মালপত্র কয়েক ঘন্টায় ভস্মনাশ। সেই শোকে মাস দুয়েক পরে মোহনচাঁদ অধিকারীর মৃত্যু। তার পরে যথারীতি ভাই ভাই খাওয়া-খাওয়ি। ভাগাভাগি, শরিকি, মামলা মোকদ্দমা, এক বছরে অধিকারীরা সর্বস্বান্ত।

বড় জাগ্রত এই নিতাইচাঁদ। কথা কয়, স্বপ্ন দেয়, নামেতে ভাব লাগে।

চব্বিশ প্রহর নাম হয় এই মেলার সময়। ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

দমাদম আছড়ে পড়ে নৃত্য করতে করতে। শ্রীখুন্তি যে অধিকারীর ছেলেটি ধরে তার তো ধুলোয় গড়াগড়ি। ভাবের বন্যা বয়ে যায়। জয় গৌর, জয় নিতাই —বলতে বলতে কত পাষণ্ড ভাবে দুমড়ে মুচড়ে ধুলোয় পড়ে। চোখের জলে ধুলো ভিজে যায়। নিতাইচাঁদের অপার মহিমা!

পঞ্চাশ একশ' গ্রামের কত মানুষ আর কত ভক্তসাধু জমায়েত হয় এ মেলায়। তার ঠিকঠিকানা নেই। যাত্রা, গ্যান রোজই চলে। তিনদিন তিনরাত নামকীর্তন। সাতদিন মেলা। যত মানুষ আসে সবাই প্রসাদ পায়। খিচুড়ি, ভাজা, বোঁদে। ছোট এক একটা ডোবার মত মস্ত কড়ায় রান্না চড়ে। সকালের রান্না শেষ হয় বিকেলে। রাত্রের রান্না মাঝরাতে। দিনরাত একটানা কলরব। শুধু শেষ রাতের দিকে একটু নিঝুম।

ঈশান খ্যাপা বার কয়েক এসেছিল। বছর দশেক আগে বাপের সঙ্গে একবার এসেছিল বিদ্যাধরী। আর এসেছে এইবার। কুমি এসেছে এই প্রথম।

এসে ওর চক্ষুস্থির।—উ রে বাপু রে, দম বন্ধ হয়্যা আছে!

এত মানুষ, এত ভিড়, এত দোকানপাট, গাওনাবাজি, দম বন্ধ হয়ে আসা আর বিচিত্র কি?

—থাকুম কনে? খামু কি?

কুমির তেল চুকচুকে আয়েসী দেহখানা খসখসে, চুল রুক্ষ, চোখ লাল।

বিদ্যাধরীর মুখখানা যেমন তেমনি। মস্ত চোখ দুটোয় খুশি উপচে পড়ছে। বোঁচকা-বুঁচকি নামিয়ে বসল ওরা একটা কুলগাছতলায়। কুলগাছের ঝাপড়া পাতাগুলোয় বাতাস লাগে। ঝুরঝুর করে নড়েচড়ে।

বিদ্যাধরীর মস্ত চোখ দুটো দীঘির জলের মত নিথর। আহা রে কত মানুষ। মানুষের জোয়ারে ডুব দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা। অগুন্তি টুকরো টুকরো প্রাণ। নানা মানুষ, নানা মন, এ যেন বেম্মাণ্ড দর্শন।

বড় ভাল লাগে বিদ্যাধরীর। বড় বড় চোখ দুটো মেলে ধরে চারদিকে।

এরি ভেতর মেলা জমজমাট। ছোট ছোট খুপরীর মত ছাপরার সামনে কাঠের পাটাতন পেতে কত দ্রব্য সাজিয়ে বসেছে। খেলনা কাঠের মাটির চিনে-মাটির, চুড়ি-বালা কাঁচের, তাঁতের শাড়ি, চাদর ধুতি। জিলিপী কদমা মুড়ি।

কুমি বিদ্যার দিকে তাকায়।—চাট্টি মুড়ি জিলাপী কিন্যা লইয়া আয়।

বিদ্যা বলে—রইস, আগে দেইখ্যা লই। দেখছস্ রঙের বাহার, আহা রে রঙের শোভা দ্যাখ।

রোদ্দুরে হেঁটে হেঁটে প্রাণ আইঢাই। খিদেয় পেট চচ্চড়ি আর বিদ্যা কি না রঙবেরঙের মেলার শোভায় মশগুল। একেবারে খেপী!

—অলো, রাখ তর খ্যাপামী। শোভা পরে দেখিস অনে। আগে মুড়ি লইয়া আয়।

কুমি নিজেই ওঠে। বিদ্যাধরী বসে থাকে ফুলগাছটার নিচে। কুমিটা ঘর বাঁচাতেই দিন কাটাল। মনের খবর জানল না। ঘরের যত্নে দিন কাটাল। ঘরের মানুষের খবর জানল না।

চোখের দৃষ্টি এক ছুটে সড়ক পার হয়ে আকাশের কিনারায় গিয়ে ঠেকেছে। পশ্চিম গগন লাল। সূর্য ডুবতে আর কতই বা দেরি। সড়কের ওপর সারি সারি মানুষ তখনও। তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে মেলার দিকে। ওই তো সেই যাত্রার দলের মানুষগুলো আসছে। ওই সেই কালো ধিনকেষ্ট গদাধর ছেলেটা। যেটা খাল পেরোতে গিয়ে আছাড় খেয়েছিল। পেছনে গোটা কতক অল্পবয়েসী ছ্যামড়া। বিদ্যা চোখ মেলে দ্যাখে। শুধু দেখতে চায়।

তার মনের রঙে আর কারো রঙ মেলে কি না দেখতে চায়। ভিতরে যার সন্ধান করেছে এতকাল বাইরেও তার সন্ধান চায়। পরাণটায় রঙ ধরেছে কিছুকাল, রসের ধারা বইছে। ও সে রসের তুফান তুলতে চায় বাইরে ঘরে সেই মনিষ্যির দর্শনে। সেই মনিষ্যির সন্ধান করছে বেশ কিছুকাল। তার দেখা পেল না।

হাওয়ায় হাওয়ার তুফান তোলে, রসের ছোঁয়ায় রসের জোয়ার বয়। তারই সন্ধান করে চলেছে খেপী ঘরে আর মন টেকে না। বড় হাসফাঁস করে মাঝে মধ্যে। সেই মনিষ্যির দেখা না পেলে রসের তুফান উঠবে না। তাকে মনের পৈঠেয় বসান যাবে না।

বিদ্যাধরীর গা শিরশির করে। বুকের হাওয়া বাইরে ছুটতে চায়। আওয়াজ হয়ে কণ্ঠ দিয়ে বেরোয়।

হয়ে রে হায়! হায় পিরীতি কেমুন জানলাম না। মন দরদী খুইজ্যা পাইল্যাম না।

নয়ডো দুয়ার খুইল্যা রাখলাম। ভিতরে ঢুকল যন্তন্না।

বিদ্যাধরীর খঞ্জনীও আওয়াজ তুলেছে নিমেষ কয়েকে মানুষ ঘিরে ধরে।

হায় রে হায়! বাইর‍্যা গাইছে বাউলী!

ওই পাউচা, অই মুকুইন্দা, শুইন্যা যা। বাউলীর গান শুইন্যা যা রে!

অগো অ পচার মায়। এখানে আইস। অ খেন্দী, অ আন্নি, শুইন্যা যা।

ডাকাডাকিতে ভিড় জমে গেল কুলতলার চারপাশে।

বিদ্যাধরীর খোঁপাটা মাথায় চাঁদির ওপর চূড়ো করে বাঁধা। মুখে ভরা-ভরন্ত খুশি। চোখ দুটো যেন রসাল দুটো লিচু।

—গলাখান বড় মিঠ্যা গো। এয়াকে নোতুন দেখি জ্যান!

হউক, আর একখান হউক।

কুমির চক্ষু স্থির। মুড়ি জিলিপী কিনে নিয়ে আসতে আসতে পিঁপড়ের জাঙালের মত মানুষের ভিড়!

খেপী আওয়াজ তুলেছে। ওকে সামলান দায়। কটা দিন খেপীটাকে সামলে নিয়ে চলতে হবে। নইলে ওর আওয়াজের হাওয়া যদি এগুলোর বুকের হাওয়ায় লাগে, তবেই সব্বনাশ।

ভিড় আর কমবে না। এ কি আকর্ষণ রে বাবা। টেনে ধরে রাখবে সেই কদমা চিনির বশি দিয়ে।

—সরেন আপনেরা সরেন। অখন আর গান অইব না।

তাকাল সবাই কুমির দিকে। এ কচকচে কালো মাগীটা আবার কে? এটাও কি বাউলী নাকি? এটাও কি গান জানে নাকি? এমনি জবর গান? এমন মন-টনটনানি গান?

—অখন আমরা থামু। আপনেরা যান অখন।

দু' চারটে পয়সা আধলা সুমেনে পড়েছিল। মুকুন্দ দোকানী একখানা সিকি নিয়ে নিজে এগিয়ে এল বিদ্যার কাছে। ওর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বলল,—বাইর‍্যা গাইছস। ল, একখান সিকিই দিল্যাম তরে।

কে এই বড়লোকের ব্যাটা। একখানা গান শুনে একটা সিকি দেয়। কুমি তাকাল।

—অই ওয়ানে আমার দোকান। যাইস, চুড়ি দিমু অনে।

চুড়ির দোকান দিয়েছ মেলায়, তার এত ফুটানী!

বিদ্যাধরী হাসল, পয়সা নিল। খঞ্জনী রাখল থলেয়। থলেয় সাজ আছে। খুনখারাপী রঙের সেমিজের মত লম্বা জামা। ফটিকের মালা খঞ্জনী, গুবগুবা। একতারাটা পাশে পড়ে আছে। সেজেগুজে যদি আওয়াজ তোলে খেপী এই মেলায়। কি কাণ্ডটা যে হবে, কুমির ভাবতেই বুক কাঁপে।

মুকুন্দ দোকানী চলে গেল।

কুমি বিদ্যার কাঁকালে একটা ঠ্যালা দিল।—অ খেপা, সাবধান কইল, আল্লার চোখে নিশা দেখলাম ক্যান।

বিদ্যাধরী হেসে উঠল। ও সব নেশা অনেক দেখেছে বিদ্যাধরী। নাটা জুড়ানের চোখেও নেশা ছিল। চোখের নেশার আগুন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বাঙ্গ পুড়ে মরে। ছিবড়ে নিয়ে দিন কাটাল। রসের খবর জানল না। এদের জন্যে দুঃখ হয় বিদ্যাধরীর।

নাটা জুড়ানের জন্যেও ওর কষ্ট হয়। ও জানে, বাপকে নাটা জুড়ানই মেরেছে। বাবার মৃত্যুর কারণ নাটা জুড়ান নয়। সে নিজেও নয়। ওই চোখের আগুন। আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল নাটা জুড়ানের অঙ্গ থেকে বাবার দিকে, তার দিকে। সে আগুন নেভান গেল না।

বাবার কোন দোষ ছিল না। নির্দোষী মানুষটা অমন করে মোলো গো! যাকে সাঁই যেভাবে নেয়। যাকে দিয়ে সাঁই যা করায়। এ ভবে সাঁইয়ের লীলা চমৎকার। নাটা জুড়ানেরই বা কি দোষ। ওর চোখের নেশা ওকে পাগল করে তুলেছিল। তাতে ওর দোষটা কি? যার হাওয়া যেমন বয়। হাওয়ার খবর না জানতে পারলে তার আর দোষ কি?

মুড়ি আর জিলিপী এনেছিল কুমি। বিদ্যাধরীর কোঁচড়ে ঢেলে দিল মুড়ি। জিলিপী এনেছে পদ্মপাতায় মুড়ে। গোল পাতাখানা মেলে রাখল সামনে ঘাসের ওপর।

—ল' খাইয়া ল'।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে জিলিপী তুলে কামড় দিল কুমি।

—অলো, থাকুম কনে?

মুড়ি চিবোতে চিবোতে বিদ্যা বলল,—থাকার ভাবনা কি? এত বড় মাঠ পইড়্যা রইছে।

—ওম্মা, কস্ কি?

—ক্যান, এই বোড়ইগাছের নিচে থাকুম।

কুলগাছের নিচে রাত কাটাতে কুমি রাজী নয়। সারা রাত এই কুলগাছতলায়। কি সর্বনাশ! খেপীর য্যামন কথা!

—এয়ানে আমি রাইত কাটাইবার পারুম না।

—ক্যান?

—মর্দাগুলান রইছে।

বিদ্যা হাসল—তর এত মর্দা মানুষের ভয় থাকনের কথা না।

এটা একটা খোঁচা। কুমির অত ভয় কিসের? তবু ভয়টা কুমিরই বেশি, লজ্জাও বেশি। গায়ের শাড়ি সাপটে ঢেকেঢুকে থাকে। কিন্তু কেন, কুমির তো এমন লজ্জাবতী হবার কথা নয়।

বিত্মার খোঁচাটা খেয়ে কুমির মুখখানা শুকোল। বিত্মা বুঝতে ভুল করেছে।

লজ্জা আর ভয় কুমিরই বেশি থাকবার কথা। চিল-শকুনের ঠোকর খেয়ে ক্ষতবিক্ষত ও দেহ। ও নোতুন কোন চিল-শকুনের আশঙ্কায় ভয় পায়। তাদের নজর এড়াবার জন্যে ভাগাড় ঢেকে রাখতে চায়। বিত্মা কি বুঝবে? বিত্মা জানে না এই মরদ মানুষের বেহায়া ব্যাভার। তাদের দয়ামায়াহীন অত্যচার। ওগুলো শকুনের মত ঠোকরায়। রক্তাক্ত হয়ে উঠলেও তাদের উন্মত্ত সুখের একটু কম পড়া চলবে না।

বিত্মা সেই উন্মত্ত চোখ দেখে নি। সময়কালে ওদের চোখ জানোয়ারের মত জ্বলে।

কুমি সে যন্ত্রণা জানে, তাই ভয় পায়। চুপচাপ আর একটা জিলিপী তুলে নেয় কুমি। কোঁচড় থেকে মুড়ি মুঠো করে তুলে মুখে ফেলে। আবার জিলিপী কামড়ায়। শুকনো মুখে এদিক ওদিক তাকায়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কুলগাছের নিচে অন্ধকার ঘন হয়ে আসবার আগেই কিছু দূরে নাটমন্দিরে পাঁচ-ছটা হ্যাজাক বাতি জ্বলে। দোকানে কোথাও লণ্ঠন ঝোলে, কোথাও বা ছোট ছোট গ্যাসের বাতি। আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে মস্ত মাঠটা। বিত্মার মুখে হ্যাজাক বাতির শাদা আলো এসে পড়েছে। মুচ মুচ করে মুড়ি চিবোতে চিবোতে তাকায় চারিদিকে। আলোয় মানুষে ছড়াছড়ি। কলরব বেড়েই চলেছে। আশেপাশের গাঁয়ের ছেলেবুড়ো মেয়েমরদ ভেঙে পড়েছে মেলায়। দোকানে দোকানে ভিড়। নাগরদোলা ঘুরছে বনবনিয়ে।

বিত্মা গা দুলিয়ে দুলিয়ে মুড়ি চিবোয়।—কুমি লো!

বিত্মা খুশির চোটে কথা বলতে পারে না।

কুমি তাকায়।

বিত্মা কলরবে আলোয় মানুষের ভেতরে ডগোমগো। অলো অ কুমি। আমার নি নাচ আইছে।

নাচ! কুমি জিলিপীখানা এক কামড়ে শেষ করে ধমক দিয়ে বলে—অখন নাচন কিয়ের?

—আমার নাইচ্যা নাইচ্যা ঘুরতে ইচ্ছা করে।

দফা সেরেছে। খেপী যদি এখন নেচে নেচে গলার আওয়াজ তোলে, ভিড় হয়ে যাবে। এখন কুমির এসব ভাল লাগছে না। এখন নাচন গাওন কিসের। সময়ে সব হবে। আসার পর থেকেই লক্ষ্য করছে কুমি। খেপী যেন আনমনা। ভেতরের কি একটা জোয়ারে বুলবুলিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। রসে ভেজা টসটসে চোখ আর গা দোলানী। দেখলেই বুঝতে পারে কুমি। খেপীর ভেতরে রস যেন গুবগুবিয়ে ওঠে।

—অখন নাচন কিয়ের ? রাইত পোয়াইক। কাইল বিয়ানে নাচিস।

কাল বিয়ানের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ? তা কখনো হয় ?

বিদ্যা তুলে পাক দিয়ে উঠতে যায়। কুমি ওর হাত চেপে ধরে।—অই খেপী রইস।

বিদ্যা আবার বসে পড়ে কুমির হাতের চাপে। কুমির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।—কি কস ?

কুমি শেষ জিলিপীখানা শেষ করে বলে—জল খামু।

বিদ্যা বলে,—আমিও খামু।

কুমি পোঁটলা থেকে কলাই করা বাটি বার করে আপন মনেই বলে—কাছাকাছি ঘাটলা আছে নি ?

—চল, আউগাইয়া দেহি।

ওরা ওঠে। কুমি বলে,—পোটলা লইয়া চল।

—ক্যান ?

—চুরি হইব্যার পারে।

বিদ্যা তাকায় চারপাশে। হ্যাঁ ঠিক দেখেছে, সেই মুকুন্দ দাঁড়িয়ে রয়েছে একটু তফাতে কুলগাছের ওধারে একটা মনসাকাঁটা ঝোপের পাশে। নজর তার বিদ্যার দিকে।

—শুইন্যা যান।

বিদ্যা অক্লেশে ডাকল মুকুন্দকে। মুকুন্দর হাতে একটা কঞ্চির ছড়ি। দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এল। চোখেমুখে বেশ আনচান ভাবখানা।

—এয়ানে নি ঘাটলা আ-- ?

মুকুন্দ দেখিয়ে দিল—উই সোজা দক্ষিণে ঢিবির ওপারে। একটা পুকুরঘাট আছে।

—আমরা গ্যালাম। আমাগো জি: :স থাকল এয়ানে।

বলে কুমির হাত ধরে টানল বিদ্যাধরী। এগিয়ে চলল ঢিবির দিকে। কুমির হাসি দেখে কে ? মুকুন্দকে পাহারাদার ঠিক করেছে খেপী। ওর ভাবসাবই আলাদা। কি কাণ্ডই করে খেপী ! চোরকে বলে বস্তু আগলাতে ! কুমির হাসি আর থামে না। বিদ্যাও হাসে। —ভালই হইল। মনে অ পুলক পাইল।

—দুর ছাইডা, তর কাণ্ড দেইখ্যা মরি।

ঢিবির কাছে এগিয়ে এল। নিচে সত্যিই পুকুর। মস্ত পুকুর। কোণাকুণি ঘাটে নামল ওরা। কিন্তু আঘাটায় কে উবু হয়ে বসে চোখেমুখে জল ছিটোচ্ছে ? কে ওটা ?

হঠাৎ বিদ্যা চিৎকার করে উঠল,—অবে মারে সাপ !

কুমিও তাকাল। সামনে একটা হাত দেড়েক লম্বা সাপ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। দৌড়োবে কি দাঁড়াবে ওরা বোঝবার আগেই যে মানুষটা আঘাটায় উবু হয়ে মুখ ধুচ্ছিল, নিমেষে ছুটে এসে একটা মস্ত শক্ত মাটির ঢেলা মারল সাপটার দিকে ছুড়ে। সাপটার গায়ে লাগল কি না কে জানে। বেঁকে সড় সড় করে চলে গেল সাপটা ঢিপির ওপর দিয়ে।

কুমি তখন থরথর করে কাঁপছিল। বিন্ধ্যার একখানা হাত ধরেছিল। বিন্ধ্যা হাঁপাচ্ছিল। মস্ত চোখ দুটো মেলে দেখছিল ঢিবিটার দিকে।

—তোমরা এয়ানে কি কামে?

তাকাল বিন্ধ্যা। কুমিও।

ওমা এ যে সেই মানুষটা। কালো ধিনকেষ্ট গদাধর সেই ছেলেটা যে খালের জলে আছাড় খেয়েছিল।

—ভাগ্যি তুমি আইছিলা!

মানুষটা তাকাল বিন্ধ্যার দিকে। টানা টানা চোখ দুটো শান্ত, উত্তেজিত নয়। স্বভাবশান্ত চাউনী। শুধু একটু যা বোকা-বোকা।

—জোছনা পক্ষ তাই রক্ষা। অন্ধকারে ওয়ার পিঠে পাড়া দিলে ফোঁস কইর‍্যা উঠত।

কুমি এতক্ষণে বলে,—তুমিই বাচাইল্যা আমাগো।

মানুষটা হাসল।—আমি বাঁচাই নাই, তোমাগো বাচাইছে চান্দ।

আহা কি কথা রে! বিন্ধ্যা চোখ স্থির করল ওর দিকে। কথার মত কথা। আসমানে চাঁদ যদি না উঠত, জ্যোৎস্নার আলো যদি না পড়ত তবে সত্যিই তো ওরা কেউ গিয়ে সাপটার ওপর পা দিত আর সঙ্গে সঙ্গে ফণা তুলে দংশন। আমি বাঁচাই নি। বাঁচিয়েছে আকাশের চাঁদ আর জোছনা।

প্রাণভরা কথা। বহুদিন পরে এমন রসের কথা শুনল বিন্ধ্যা খেপী। জীয়ন মিত্যুর সময়ে এমন কথা সবাই বলতে পারে না।

—কি কামে আইছিলা?

—জল খাইতে।

—দ্যাও, বাটিখান, দ্যাও, জল আইন্যা দেই।

কুমির হাতের কলাই করা বাটিটা লক্ষ্য করে বললে মানুষটা। বুঝতে পেরেছিল ওরা ভয়ে আর ঘাটে নামতে পারবে না। তখনো দুজন দুজনের হাত চেপে ধরে আছে।

শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। ফিকে জ্যোৎস্নার আলোয় ঘাটের ঘাস
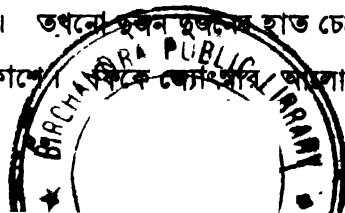
কাদা মাটি চিকচিক করছে। অনেকটা নিচে ঘাট। ফাল্গুনে বোধ হয় জল শুকিয়ে মজে গেছে অনেকটা।

এখানে হ্যাজাক বাতির তীব্র শাদা আলোর চোখ ধাঁধানি নেই। ঢিবি থেকে বেশ খানিকটা নিচে সে আলো এসে পৌঁছোয় নি। দূরের কলরব ভেসে আসছে বাতাসে। ঢিবির এক ধারে সারি সারি কতকগুলো গাছ দুলছে বাতাসে। কি গাছ চেনা যায় না। বোধ হয় মাদারগাছ।

কুমি বাটি এগিয়ে দেয়। এক বাটি জল এনে দেয় মানুষটা।

বাটির জল হাতে দিয়ে হেসে বলে—এইডার নাম সায়র। নিতাইচান্দের সায়র। এই নামেই সায়রের মেলার নাম।

কথার মত কথা। এই পুকুরের নাম সায়র। তাই সায়রের মেলা।

—নিতাইচান্দ নি প্রেমের ভাণ্ডারী। এই সায়রের জলে প্রেমের মাখামাখি।

একটু থেমে বলে কালো মানুষ,—দেইখ অনে কাইল বিয়ানে। সগ্গলে চান কইরব সায়রের জলে। সায়রের জল পান চানের মম্ম নি জানো ?

বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ। কথায় কোন জড়তা নেই, বেশ ভদ্দর ভদ্দর কথা। যেন গ্রন্থ পাঠ শোনাচ্ছে। না রায়মঙ্গল, মনসামঙ্গলের গান শোনাচ্ছে। কথার মত কথা বলতে পারে।

বিদ্যা খেপীর চোখের পলক পড়ে না। সায়রের জলে চান করবার, জল পান করবার মর্মকথাও জানে !

—হ, এ জল চানে পানে প্যামের উদয় হয়। নিতাইচান্দ প্যাম বিলায়।

হায় রে কথা ! এ জল স্নানে পানে প্রেমের উদয় হয়। এ সব মর্মকথা সকলে জানে না। সকলের জানবার কথা নয় ! যে মর্ম বোঝে সেই সে মাত্র জানে।

কুমি এতক্ষণে সহজ হতে পেরেছে। হেসে উঠল কুমি। রাত্তিরে কুমির চোখের চাউনি ত্যারছা হয়। ঢং ঢাং উথলে ওঠে। কুমি ত্যারছা চোখা দৃষ্টি হেনে বললে,—চললো খেপী রাইত বিরাইতে, প্যামের কথা শুননের কাম নাই।

বিদ্যা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল,—তোমার নামডা কি ?

—আমাক চিন না ? কিষ্টযাত্রার মদন। কাইল আমাগো গান শুইনো।

কুমি বিদ্যাকে ধরে টানল। ঢিবি পার হয়ে চলল ওরা।

কুমি বিদ্যার দিকে একবার তাকাল। বিদ্যার মস্ত চোখ দুটো আনমনা। তা আর হবে না কেন ? মানুষটা সাই জোয়ান। ঘাড় পর্যন্ত কুচকুচে কালো চুল। টানা-টানা চোখ, চোখা নাক। হাত দুখানা যেন কলাগাছের থোড়। ভালই লাগে দেখতে। দেখলেই কেমন মন টনটন করে। চোখের দৃষ্টি ত্যারছা হয়।

দয়াল কবিরাজ, খলিকা দাস, শেখ পরমানন্দ হালুইকর—না, এ কারো মত নয়। এ যেন এক অন্ত মানুষ। নরম-সরস কথা, ভারী গম্ভীর গলা অথচ ঠাণ্ডা স্বর। ভারী সুন্দর মানুষ। বয়েস আর কত হবে কুড়ি কি বাইশ, তার বেশি নয়। কুমির চেয়ে কিছু ছোট হতে পারে। খেপীর সমান সমান বয়েস হবে হয়তো বা।

কুমির দেহখানা চনচন করে।

বিদ্যাধরী দুলে দুলে চলেছে এগিয়ে। কিষ্টযাত্রার মদন ওর মন ছেয়ে রয়েছে। ও বুঝতে পারছে না, কেন মনের হাওয়া উজান ধরেছে। টেনে রেখেছে ওর পিঞ্জরার পরাণখানা।

মদন কথা কইতে জানে। রসের খপর রাখে, এমন মানুষ কই তার চোখে আর কবে পড়েছে। ওই এঁটেল মাটি রঙের চিকচিকে মুখখানা। টানা টানা চোখ দুটো ওর ভেতরটা টেনে রেখে দিয়েছে। কি টনটনে টান! খেপী থম্ মেরে গেছে। মানুষে মানুষ চিনে, তবে কি চেনাচেনা লাগে। বিদ্যাধরীর ভাব লাগল কেন?

দুলে দুলে এগোচ্ছে বিদ্যাধরী।

—অ কুমি?

—কি কস্।

—রাও করস না ক্যান?

—কি কমু?

—ভাবস কি?

এবারে একটুখানি হাসল, বাঁকা হাসি, মুখ বেঁকিয়ে বলল,—অই বোগদাটার কথা ভাবত্যাছি।

—বোগদা কেডা? কালা মদন।

ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে কুমির মনখানা।—না বোগ্দা মদন।

কুমির বোকা মদন, খেপীর কালা মদন। কুমির দেহে ঘূর্ণির উত্তাপ। খেপীর মনে উজান বাও। কুমির চোখে নেশা ধরেছে। খেপীর মনে রঙ ধরেছে। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল এবার।

তিন

জমজমিয়ে উঠেছে সায়রের মেলা।

রাত ভোর নাম কীর্তন চলেছে। করতালের ঝমঝমানি খোলের তাকুটি তাকুটি। নাটমন্দিরের একপাশে শুয়ে বসে রাত পুইয়েছে কুমি আর বিদ্যা। এই জায়গাই পছন্দসই হোল কুমির। ফাঁকা জায়গার চেয়ে লোকজন যেখানে জেগে রয়েছে ভররাত, সেখানেই নিশ্চিন্দি। কুমির ভয় বেশি। তাতে, ভাল করে ঘুম হয়নি ওর। রাতভর তাকুটি তাকুটি—আর করতালের ঝমঝম।

সাত সকালে উঠে পড়েছে সবাই। দোকান-পসার গোছান-গাছান হচ্ছে। ছোট ছোট ছাপরার সামনে থেকে চটের পর্দার দরজার ঝাঁপ খুলে যাচ্ছে। গোটা পাঁচ-সাত মালী গোটা মাঠটা ঝাঁট দিতে লেগে গেছে। মন্দিরে মঙ্গলারাতির ঘণ্টা বাজছে।

শিরশির করছে গা। বাতাস বইছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভোর থেকে। সূর্য ওঠে নি, পূবের আকাশটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে সবে।

ভোরের দিকে কুমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে পড়ে দেখে খেপী পাশে নেই। সাত-সকালে উঠে গেল কোথায়?

কুমি উঠল, চোখ কচলাল। গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উবু হয়ে বসল। গা-গতর ব্যথা হয়েছে। শেষ রাত থেকে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল।

বিদ্যা উঠেছে রাত থাকতে। বরাবরই তাই ওঠে। উঠে কিছু দমের কাজ করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ। এখানে আর সেটা হোল না। ভোরের শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাসে গা জারিয়ে উঠছিল। উঠে পড়ল। কুমির দিকে একবার তাকাল। ও জানে বরাবরই কুমি ওঠে বেলায়। সারা রাতের যন্ত্রণা জুড়োতে সময় নেয়। ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক।

বিদ্যাধরি উঠে গামছাখানা নিয়ে সোজা চলে গেল সেই ঘাটে, সায়রের ঘাটে। ওখানে চান-টান সেরে ভিজে কাপড়ে ফিরে এল নাটমন্দিরে। কাঠের ছোট চিরুণী-আয়না। কাপড়, রাঙা মাটিতে ছোপা সেমিজের মত আলখাল্লা, সব নিয়ে সোজা চলে গেল কুলতলায়। একটু তফাতে নির্জনে। কুমি তখনো ঘুমোচ্ছে।

গাছের নীচে কাপড় ছেড়ে বসে চুল বাঁধল, খোঁপাটা চাঁদির ওপর চড়ার মত। আয়না দিয়ে দেখল। হাসল একবার এমনিই।

মুকুইন্দ্যা রে-এ-এ-এ—

বাতাসের সঙ্গে একটা ডাক ভেসে ভেসে এল কানে। মুকুন্দ দোকানীকে বোধ হয় ডাকছে কেউ।

মুখটা একটু ফেরাতেই চোখে পড়ল মুকুন্দ ওর পিছনে একটু তফাতে উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি টানছে। হেসে ফেলল বিদ্যাধরী। ওকে ডাকল কাছে।

—তোমাক্ ডাকে কেডা ?

—ডাহুক গা। আমার ভাই ডাকে।

—গ্যালা না ?

—নাঃ।

বিড়িটা মুঠো করে ধরে টানে মুকুন্দ, গালে দুটো ছোট ছোট গর্ত হয়ে যায় টানের চোটে।

মায়া লাগে বিদ্যার, মানুষটাকে কাল সন্ধ্যাবেলা পোটলা আগলাতে বসিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ। এসে ওরা দেখেছিল, পোঁটলা আগলে বসেই ছিল মুকুন্দ। বিরক্ত হয় নি, হেসে বলেছিল,— আইবার নি পারলা ?

কুমি ওর দিকে তাকিয়ে ত্যারছা হেসে বলেছিল,—হ, অখন দোকান সামলাও গা।

—রাইত পোয়াইবা কোয়ানে ?

—হে খপরে তোমার কাম কি ?

হেসে বলেছিল কুমি। রাত্তিরে কুমির বুলবুলানি বেড়েছিল। তাই বাড়ে। দিনের বেলাকে কুমি ভয় করে। যত বুলবুলানি আঁকা-বাঁকা দৃষ্টিভঙ্গি সব ওর রাত্তিরে। কুমিটা ঘর সামলাতেই দিন কাটাল। ঘরের নটা দুয়ারের আনাগোনা দেখেই সুখ চাইল। অথচ ঘর যে পচে আসবে, ভেঙে পড়বে, সে খপর কুমি রাখে না।

গুণগুণিয়ে উঠল বিদ্যা।—অ বৈরাগী ভাঙা ঘরে মন টিকে না করি কি ?

ভোরের ফুরফুরে বাতাসে আলতো আওয়াজ তোলে খেপী। মুকুন্দ কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে আর একটা বিড়ি ধরাল। ওর সামনে এসে উবু হয়ে বসল।

অ বৈরাগী ভাঙা ঘরে মন টিকে না করি কি।

দুব্বা বাইয়া কেউছা ওঠে, বাতা ভরা টিকটিকি।

অ বৈরাগী ভাঙা ঘরে মন টিকে না করি কি ?

—বাইর‍্যা গলা তোমার।

গুটিসুটি মেরে আর একটু এগোয় মুকুন্দ।

বিদ্যা ফিক ফিক হাসে। মস্ত একখানা হাস দিয়া বলে,—ক্যান রূপ রুম কিসে ?

—হ-হুরীর নাগাল—।

—তয় ?

ডগমগিয়ে ওঠে বিদ্যাধরী। মুকুন্দ আরও একটু ঘনিষ্ট হবার সুযোগ নেয়।
—বিয়া নি হইছে ?

অক্লেশে বলে বিদ্যা।—হ, কোন জন্মে।

মুকুন্দ একটু টাল খায়।—কত্তা কোয়ানে ?

বুকটায় আঙ্গুল ঠেকিয়ে। বিদ্যাধরী বলে—এয়ানে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে বিদ্যাধরী। মুকুন্দ বোকা বোকা চোখে তাকায়। কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। জিভ দিয়ে শুকনো মোটা ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে ট্যাঁক থেকে দুটো টাকা বার করে।

—অলো খেপী লো—ও—ও—ও—

কুমির গলার আওয়াজ শুনতে পায় বিদ্যাধরী। নড়েচড়ে ওঠে।

মুকুন্দ গলাটা কেশে সাফ করে নিয়ে বলে,—ট্যাহা দুইডা অহনি লইবা, না রাইতে।

হেসে বিদ্যা তাকায় নাটমন্দিরের দিকে। কুমি এদিকে আসছে। কুমির দিকে আঙুল দেখিয়ে বিদ্যাধরী বলে,—ওয়াকে ট্যাহা দেওগা! উই যে আসত্যাছে।

বলে উঠে পড়ে। এগিয়ে যায় কুমির দিকে। কুমি চোখ মুখ শুকনো করে এগিয়ে আসছে। বিদ্যাকে না দেখে ভয় পেয়ে গেছে। বিদ্যার হাসি পায়। সকাল হলেই কুমির ভয় শুরু হয়। সূয্যিদেবের সঙ্গে বড় আড়াআড়ি।

কুমি এগিয়ে এসে ওর দিকে তাকিয়ে অবাক, বিরক্ত। ভোর বিয়ানে চান সেরে সেজে-গুজে আয়না মহল হয়ে বসে আছে। কুমিকে একবার ডাকতেও কি পারত না ?

মুকুন্দ কুমির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কুমি বাসী মুখে বিরক্ত! ঘুম থেকে উঠে বাসী মুখে একটা পান-দোক্তা খাওয়া পর্যন্ত হয় নি। এদিকে নাটমন্দিরের তাকুটি তাকুটি। আর বিদ্যা হাওয়ায় নিখোঁজ। কেন যে মরতে মেলায় এসেছি কুমি ? যেতে পারলে বাঁচে। যে কটা রাত এখানে কাটবে সে কটা রাতই যন্ত্রণার রাত। কবিরাজ মশাই নেই। পরমা হালুইকর নেই। সন্ধ্যের পর এক এক করে নিরিবিলি মানুষের সঙ্গে হাসন নেই। ভঙ্গী নেই। গুজগুজ করে কথার জাল বোনা নেই। হৈ-হল্লা লেগেই রয়েছে।

নাটমন্দিরে গিয়ে বিদ্যা বলল,—ল' চান সাইর‍্যা আয়।

হাই তুলল কুমি।—হ যাই।

পোটলা-পুঁটলি খুলে ডুরে শাড়িখানা বার করল কুমি। বিদ্যা সাজতে পারে আর ও সাজতে পারে না? গামছা কাঁধে ফেলে চলে গেল কুমি। সেই ঘাটেই যাবে। আর কোন ঘাট চেনে না।

বিদ্যা একতারাটা হাতে নিল। কাঁধে ঝোলাল গুবগুবি।

পূব আকাশটায় চড়া রঙ ধরেছে। দূরে সড়কের ওপারে ঘন গাছ-গাছালীর মাথায় লাল আভা ঠিকরে পড়ছে। ভোরের ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাসটা গরম হয়ে উঠছে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোও সব আস্তে আস্তে তেতে উঠছে। ঠিক দুপুরে রোদের তাতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলো সব টং হয়ে উঠবে। সব যেন দড়ায় দড়ায় বাঁধা একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই।

দড়ায় দড়ায় বাঁধা। প্রিকিতির পৈঠের সঙ্গে মানুষের ভেতরের পৈঠে। যার যেমন পৈঠে সে তেমন চোখে প্রিকিতি দেখে। কোন পৈঠেতে বাস করছে সে, তাই যদি জানতে পারত, তবে তো এই সংসারে গোলমালের বাজার বসত না। সবাই সেয়ানা হোত। ত্রিবেণীর ঘাটে নেমে ভিয়েন চড়াত। রসের ভিয়েন জাল দিয়ে দিয়ে ঘন করে তুলত।

খপর জানে না। হাওয়ার খপর জানে না, পৈঠের খপর জানে না।

মুকুন্দ দোকানী জানে না, ও আসলে কুমিকেই চায়, বিদ্যাকে চায় না। বিদ্যার অন্য পৈটেয় বাস। সেখানকার বাসিন্দা কারো সন্ধান বুঝি পেল। মনে হয় যেন পেল।

পোঁটলা-পুঁটলি কাঁধে তুলল বিদ্যাধরী। নাটমন্দির ছেড়ে একতারা নিয়ে এগোল অধিকারীবাবুদের বাড়ির লাগোয়া এক সারি কতকগুলো ঘরের পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় দুটো অর্জুনগাছ লক্ষ্য করে।

মস্ত দুটো অর্জুনগাছ পাশাপাশি, এখানে ওখানে কচুবন। আর আগাছা দোপাটি। মাঝে মাঝে শিয়ালকাঁটার ঝোপ। বাঁ পাশে তাকাও ঘর, সামনে তাকাও লাল টকটকে আকাশখানার সীমানা। দূরে একটা কাঠের পুল খালের ওপর। বড় সুন্দর স্থানটুকু। এদিক-ওদিক রসভরা চোখে তাকাল। মনে উঠল গুনগুনানি।

ভিজে শাড়িখানা নিয়ে মেলে দিল ছোট ছোট কচুগাছের ওপর।

একতারাটা নিয়ে বসল এসে অর্জুনগাছের তলায়।

আওয়াজ না তুলে আর উপায় আছে? হাওয়া যে ঠেলে উঠেছে কণ্ঠ পর্যন্ত।

এ ভবে সাঁইয়ের লীলা চমৎকার।

চক্ষু মেইলা দ্যাখরে মন আমার।

বাতাসে সুরে মাখামাখি। উদারার আওয়াজ তারায় ওঠে। কাছাকাছি

মানুষের কানের ভেতরে তীরের মত বিঁধে চমক লাগায়। চোখ ফেরায়। শুধু চোখ ফেরান কেন, দেখতে দেখতে আশপাশে দুটোচারটে কুঁচো-কাঁচা জমায়েত হয়, জিলিপীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যারা জিলিপী খাচ্ছিল এগিয়ে আসে তারা। কাঁধে গামছা নিয়ে মাথায় গায়ে খাবলা তেল মেখে চানে যাবার পথে দাঁড়িয়ে পড়ে দু-চারজনা। জামগাছের আড়ালে ঘোমটা টেনে দাঁড়ায় গুটিকতক মেয়ে বউ। ওদের বাস কাছাকাছি। সকালে জল আনতে যাচ্ছিল।

আসমানে জমীনের রঙ্গে
মনের রঙ্গে একাকার।
ও তুই, চক্ষু বুইজ্যা অন্ধ রলি,
রঙ্গ ছ্যাখস অন্ধকার।
চক্ষু মেইল্যা ছ্যাখ রে মন আমার।

বিদ্যাধরীর দেহখানা দুলছে, দুলতে দুলতে দুটো পাক ঘুরল, যেন হাওয়ায় অক্লেশে পাক খেল। দেহখানা হাওয়ার গুণে শোলার মত হাল্কা লাগে। মুখ ঘুরিয়ে মস্ত চোখদুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকায়। তাকায় বাইরে। না, ও সামনের কাউকে দেখবার কোন চেষ্টাই করে না। গ্রাহ্যের ভেতর আনে না। লোক না পোক! মনের তাগিদে সুর তোলে। বুকের হাওয়ার ঠ্যালায় আওয়াজ তোলে, কে শুনল আর কে শুনল না, কি আসে যায় তাতে।

আসল কথা নিজেকেই নিজে শোনায়। বার বার শোনায়, একই কথা বার বার বলে। আওয়াজ দিয়ে বলে, তবু যদি মন বশে আসে। মনটা বড় পাজী ছ্যাচোর, এই বুঝল তো এই বেঁকে বসল। আবার পিঠে হাত বোলাও। শোন। কথা শোন। অন্ধ হয়ে থাকলে চলবে ক্যান? তাকা ছ্যাখ চোখ মেলে তাকিয়ে।

বিদ্যা খেপী কয় ওরে মন,
মানুষ আইছে ঘাটের ধার।
দেইখ্যা শুইন্যা ল'রে চিন্যা
হবি যদি পারাপার।
চক্ষু মেইল্যা ছ্যাখ '' মন আমার।
এ ভবে সাঁইয়ের লীলা চমৎকার,
চক্ষু মেইল্যা ছ্যাখরে মন আমার।

ডান হাতে একতারাটা উঁচু করে ধরে তিন-চারটে পাক খেল বিদ্যাধরী।

অমন লম্বা ভারী দেহ যেন পাট-কাঠির মত হাল্কা। পাঁচ বছরের মেয়ের মত বাতাসে ঘুরপাক খেল। ফিঙের মত হাল্কা হয়ে। কেউ বা চার পয়সা জিলিপী এনে

দিল, কেউ দুটো পয়সা, কেউ দু' কুন্‌কে মুড়ি, গানে সবাই খুশি। বাউলী বোষ্টমীর গান এমনি এমনি শুনতে নেই, কিছু দিতে হয়। সবাই একটু অবাক। একে মেলায় এর আগে কখনো দেখা যায় নি। কোথায় ঘর, কোন গাঁয়ে? কোথা থেকে এল। বলিহারী গলাখানা। সাত সকালে মেলার মেজাজ এনে দিয়েছে।

কিবা গলা কিবা নাচন!

আশ্চয্য! আপনা-আপনি ফিস-ফিসিয়ে উঠল মদন ভুঁইয়া। কিষ্টযাত্রার মদন!

সারি সারি ঘরগুলোর দুখানা ঘরে অধিকারীরা থাকতে দিয়েছে ওদের। যাত্রাগান গাইবে। ওদের থাকবার ব্যবস্থা করতেই হবে। খাওয়া দিতে হবে। জলখাবার দিতে হবে, তাছাড়া টাকা দিতে হবে। ওদের কদর আলাদা। ওরা পথের বাউল বোষ্টম নয়।

এদের ভেতর মদন ভুঁইয়ার মর্যাদা বেশি। কিষ্টর গান ও গায়, যে কোন পালাগানে মূল গায়েন মদন। বিশ-পঞ্চাশ গাঁয়ে ওর গলার সুখ্যাত করে সবাই। ভাবভঙ্গিতে একটু মর্যাদা নিয়ে থাকে মদন। সকালে একটা প্যাটরার ওপর বসে মদন মুড়ি গুড় খেয়ে সবে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছে, কানে এল কানের পর্দা কাঁপান সুরেলা আওয়াজ।

ভোর বিয়ানে কেডা সুরু ধরল?

ও বেরিয়ে এল। সঙ্গে সখি সাজে যারা সেই ছ্যামড়া গোটা ছয়েক। মদন মর্যাদার ভানটা বজায় রেখে বেশ ভারী গম্ভীর চালে এসে একটা অর্জুনগাছের পাশে দাঁড়াল। দেখল সেই মেয়েটা। এটা বাউলী বুঝতেই পারে নি মদন। ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাথায় খোঁপাটা বেঁধেছে চূড়োর মত, গায়ে ঢোলা সেমিজের মত পরনে। একতারার লাউয়ের ডোলটা বেশ বড়! ভারী মিঠে আওয়াজ উঠছে।

আর একটা সিগ্রেট বার করল মদন। মেলায়-টেলায় এলে ও সিগ্রেট কেনে, কাঁচি মার্কা সিগ্রেট, এটাও মর্যাদারই একটা অঙ্গ। মদন ভুঁইয়া একটা ফ্যালনা মানুষ নয়। তার একটা মর্যাদা আছে। পরনের ধুতিটা আর পিরানটা সোডায় কাচা। নিজে কাচে না। সখি দলের ম্যাগাকে দিয়ে কাচায়। হয়তো একটা পয়সা দেয় ওকে বাতাসা খেতে।

দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেছে মদন।

আচ্চয্য! মুখ দিয়ে ওর আপনা-আপনি বেরোল। বাউলের গান ও অনেক শুনেছে, কিন্তু এ গানটা শোনা গানের মত নয়। আবার গানের শেষে পদকর্তার নাম বলল, বিচ্ছা খেপী। ব্যাপারখানা কি! বিচ্ছা খেপী কি ওর গুরুদেবী? থাকে কোথায়, কোন গাঁয়ে?

লোকজন পাতলা হয়ে এল। একটা চট পেতে বসল বিদ্যা। কোঁচড়ের মুড়ি রাখল একটা ত্যানায় বেঁধে! একতারা পাশে রেখে তখনো গুনগুন করছিল। এ ভবে সাঁইয়ের লীলা চমৎকার।

মদন সেধে কাউকে কিছু বলতে পারে না। বিশেষত গানের ব্যাপারে। ওর একটা মর্যাদা আছে। বিদ্যাধরী কিন্তু তাকাল না একবারও ওর দিকে। এতটা সময় গেল। এত জনা এল, ওকে দেখে মনে হোল ও যেন কারো দিকেই ত্যামন করে তাকায় নি। যাকে বলে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিটা ওর চোখে ছিল না। চোখের তারা দুটো বোধ হয় কি একটা হাওয়ায় আচ্ছন্ন ছিল।

মদন সিগ্রেটটা মুঠো করে জোরালো টেনে অর্জুনগাছের পাশ থেকে একটু সরে এসে কাশল। বেশ জোরে কাশল। সখি ছ্যামড়া ম্যাগা ওরা চলে গেছে ঘরে। মদন যায় নি।

কাশির শব্দে কোন কাজ হোল না। এ ক্যামনা মাইয়ামানুষ। আচ্চয্য!

পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বার করে এগোল মদন। ও তো জানে বাউল-বাউলীরা গাঁজা তামুক খায়, সিগ্রেট পেলে ভালই লাগবে। তাছাড়া সিগ্রেট-খাওয়াইয়া মানুষটার মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে।

এগিয়ে এসে বিদ্যার দিকে সিগ্রেটটা বাড়িয়ে ধরে বলল,—ধরো ছিক্রেট খাও।

বিদ্যাধরী তাকাল। সামনে মদন। ওর সামনে হাত বাড়িয়ে একটা সিগ্রেট ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হেসে উঠল বিদ্যাধরী খিল খিল করে। কালা মদন এসে দাঁড়িয়েছে। চেহারাটা ওর আঠার মত চোখে লেগে রইল। যেন একখানা ছবি।

—এডা কি?

—ছিক্রেট।

আবার হাসল বিদ্যাধরী। দুলে দুলে হাসল,—থ্যাও, রাইখ্যা দেই।

কালা মদনের এ দানটা ও প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। সিগ্রেট কাকে বলে জানে না। হাতে নিয়ে দেখল, কাগজে মোড়া তামুক।

মদন গম্ভীরস্বরে বলল,—গলাখানা বেশ সাফ তোমার।

বিদ্যার চোখদুটো ভিজে ভিজে, বলল,– তুমি শুইনছ?

একটু তাচ্ছিল্য স্বরেই বলল মদন।—হ, ব্যাড়াইবার বাইর অইছিলাম। কন্নে আওজ আইল।

মুচকি হাসল বিদ্যাধরী.—কন্ন সাথক অইছে?

ওর গান শুনে কর্ণ সার্থক করবে মদন! মদনকে ভাবল কি বাউলী! বাহারের

গান ও অনেক শুনেছে, এ গান তার কাছে অতি তুচ্ছ। তবু মুখের ওপর বলে একটা ঝগড়া পাকাবার দরকার নেই।

সিগ্রেটে টান দিয়ে মদন বলল,—পদকর্ত্তা কেডা?

বিদ্যা হাসে।—তা দিয়া কাম কি?

বিদ্যা ত্যানায় বাঁধা মুড়ি বার করে, খান চারেক জিলিপী,—খাইবা?

মদন সিগ্রেটে লম্বা একটা টান দিয়ে সিগ্রেটটা ফেলে দেয় ছুঁড়ে। সিগ্রেটটা কচুবনের পাশে গিয়ে পড়ে। ধোঁয়া উঠতে থাকে। টানা ধোঁয়া দক্ষিণের বাতাসে বেঁকে বেঁকে ওপরে ওঠে।

দু'খানা জিলিপী নিয়ে বিদ্যা বলে,—বইয়, খাও।

মদন ভুঁইয়ার মর্যাদায় একটু বাধো বাধো ঠেকে। তবু উবু হয়ে বসে, হাত পেতে বলে,—দাও। তেমুন খিদা নাই। মুড়ি খাইয়া আইছি। মুড়ি কৈল খামু না।

—মুড়ি দিমু না। জিলাপী খাও। উপুরে মচমইচা, মধ্যে রস।

ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী। মাঝে মাঝে অকারণে ফিক ফিক করে হাসা ওর স্বভাব। ভেতরটায় ডগমগিয়ে ওঠে খুশি। এমনি এমনি। কোন কারণ নেই, তবু খুশি, তবু রসে টইটম্বুর।

মদন জিলিপীতে কামড় দিয়ে বলে,—কাইল রাইতে ছিলা কনে?

—নাটমন্দিরে।

—আর একজন কনে?

কুমির কথা বলছে মদন। কাল সন্ধ্যায় ওদের দুজনকেই দেখেছিল কালা মদন। আর একজনকে দেখে প্রশ্ন। ফিক ফিক করে হাসে বিদ্যা। পা দু'খানা ছড়িয়ে বসে মুড়ি চিবোয়। বসার ভঙ্গী আলগা, কথা আলগা, হাসি আলগা, আঁট-সাঁট বাধন নেই। কেমন ছাড়া-ছাড়া আলগা ভাব।

—আর একজন যে আছিল, তেনারে দেখি না ক্যান?

কুমির কথা আবার জিজ্ঞেস করে মদন। হাসি পায় বিদ্যার। খুব হাসি পায়। মুড়ি চিবোতে চিবোতে হাতে মুখ ঢেকে মুখ নিচু করে হাসে।

—অত হাসনের কি অইল?

—তোমার রকম-সকম দেইখ্যা হাস আইল।

মদন বেশ গম্ভীর হোল। বাউলীটা ফাজিল। এরা এমনি ফাজিল হয়। কথায় কথায় ফাজলামী করা এদের স্বভাব। আস্কারা এদের দিতে নেই। তার ওপর হাজার হোক মদনের মর্যাদা বলে একটা কথা আছে! জিলিপীটা শেষ করে হাত দুটো ঝাড়ে মদন। তাকায় বিদ্যার দিকে।

একবার ভাবে উঠবে, কিন্তু উঠতে পারে না। বাউলীটার গানের আওয়াজ তখনো রিণরিণ করে বাজছে ভেতরে। দেখতেও মিষ্টিমিষ্টি। একটা মিঠে টান ওকে বসিয়ে রাখছে, উঠতে দিচ্ছে না। বিষ্ণার মুখখানা বেশ গোলগাল। নাকটা চাপা, চোখদুটো মস্ত, রসে খুশিতে ভেজা ভেজা, হাসি তো লেগেই রয়েছে। গালে দুটো খুশির মত টোল। যেন আস্ত একখানা জলজ্যান্ত হাসিখুশি।

একটা জীবন্ত আনন্দ।

ওই একতাল খুশির কাছে দু' দণ্ড বসতে কার না ইচ্ছে হয়। বেশ ভাল লাগে। ভেতরে তোমার যতই ধোঁয়া জমুক না। খেপীর হাসির হাওয়ায় সব সাফ। একেবারে পয়পরিষ্কার প্রাণখানা নিজে যেন দেখতে পাবে। ওর নাচন হাসনের বাতাস লেগে সব যেন ফস্ খোলসা করে দেবে। জঞ্জাল ধুলো ময়লা কিছু যদি জমে থাকে, হাওয়ার ঝাপটায় সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

উঠতে পারছে না মদন। অর্জুনগাছের নীচে বসে বিয়ানের ভুরভুরে বাতাসের মত মিঠে মিঠে লাগছে। অনেকগুলো ভাবনা জমে ছিল ওর মনে। যাত্রাদলের বিরুদ্ধে অনেক বাঁকা-ত্যাড়া ভাবনা চিন্তা কিছুদিন থেকেই ওকে বিব্রত করছিল। আজ এই মাত্র সে সব ভাবনাগুলো মুছে গেছে।

আশ্চর্য, বাউলীটার কাছে বসে কথা বলতে তার কিন্তু বেশ ভালই লাগছে। তবু মর্যাদা বলে একটা কথা আছে।

মদন বেশ ভদ্দর ভদ্দর কথা বলে,—নিবাস কোয়ানে?

ফিক করে হাসে বিষ্ণা।—সবখানে।

মদন হাসে এবার। কথাটা বলেছে মন্দ নয়।—কইব নে ঘর কনে?

—দোয়াইল।

মদন চেনে।—অ দোয়াইল। গত সনে কানাকান্দিতে আমাগো গাওনা হইছিল। নিচ্চয় শুনছিলা?

—না। শুনি নাই।

—নামডা কি তোমার?

—বিষ্ণাদরি।

রা রা করে একটা চিৎকার আসে,—আলো অ খেপী!

কুমির গলার আওয়াজ। কুমি দেহখানা মেজে ধুয়ে চান করে ধীরে সুস্থে নাটমন্দিরের কাছে এসে দেখে সব ফক্কা। খেপীও নেই। পোঁটলা-পুঁটলিও নেই। সব্বনাশ। গেল কোথায়? কুমির বুক ধড়ধড় করে। এমন সঙ্গী নিয়ে মেলায় এসে পদে পদে বিপদ। না আছে আক্কেল, না আছে বুদ্ধি! খেপী যেন চর্কিবাজীর মত

হাওয়ায় হাওয়ায় ঘোরে। কখন কোথায় যায়। কিছু পাত্তা রেখে যায় না। রয়ে সয়ে আরামে হাই তুলে জিরোতে সাতাতে জানে না। কি ভয়ঙ্কর মাইয়া!

—অলো, অ খেপী!

বিদ্যা মুখখানা উঁচিয়ে বলে ওঠে,—আয় লো, আয়—

মদন হাসে। মন্দ লাগছে না ওর। বলে,—তোমার নাম খেপী?

—মানুষে কয়।

কুমি এগিয়ে এল তেড়ে। বেশি দূর কিছু নয়, একটু এগিয়েই অর্জুন-গাছের তলা।

এসেই ফেটে পড়ে।—তর আক্কেলখানা কেমুন ধলো? বলন নাই, কওন নয় চড়ুইয়ের নাগাল ফুরুত ফুরুত উড়ছে দ্যাখ! গোক্ষুরি করছি তর নগে আইসা! অম্মা, ই কেডা?

মদনের দিকে চোখ পড়তে নিজেকে সামলায় কুমি।

বিদ্যা ফিক করে হেসে বলে,—কালা মদন।

—আই—আই—জিভ কাটে কুমি। মুখ ফিরিয়ে হাসে। খেপীটার কোন কাণ্ডজ্ঞান দেই, ভদ্দর-ভদ্দর মানুষটাকে মুখের ওপর বলে বসল, কালা মদন। আই—আই—। ছিক্ক্যা!

মদন যেন শুনতেই পায় নি। উঠে পড়ে। উঠে একটা হাই তোলে। আর তাকায় না ওদের দিকে। ওর একটা মর্যাদা বলে কথা আছে। মুখের ওপর কালা মাণিক সম্বোধনটি ওর মর্যাদার পক্ষে হানিকর। কি আর করা যাবে, বাউল বাউলীরা ওমনি ধরণের।

কুমি লেপটে বসে অর্জুনগাছেব তলায়। হঠাৎ বিদ্যাকে জড়িয়ে ধরে পুলকের হাসি হাসতে থাকে।

চার

সায়রের মেলা জমজমাট। সন্ধ্যায় সেদিন ভিড় আরও বেড়েছে। চব্বিশ প্রহর নামকীর্তন শেষ হয়েছে। কীর্তন শেষে মালসা ভোগ, মচ্ছব। দুপুরে মচ্ছবের খাওয়া শেষ হয়েছে। পিলপিল করছে মানুষ। চাষা-ভুষো! জোলা, খলিফা, কেউ আর বাকী নেই। সার দিয়ে বসে গেছে মাঠের ওপর। কলা-পাতার ওপর পেসাদী খিচুড়ি আর ঘ্যাঁট তরকারি। খেতে কিন্তু অমৃতের মত। ঠা ঠা রোদ্দুরে মাথায় গামছা অথবা ঘোমটা মর্দা-মাইয়া বসে গেছে সার দিয়ে।

বিদ্যা-কুমির চক্ষুস্থির। হাসি কলরবের তুফান। পরাণের তুফান।

মচ্ছবের প্রসাদ পেয়ে ফিরে এসে বসতে বসতে রোদ চলে গেছে অর্জুনগাছের ডগায়। সূর্য নেমে গেছেন অনেকটা সড়ক আব আকাশের সীমানার পাবে। ফাল্গুনের চড়চড়ে রোদের পব একটু যেন ঠাণ্ডা। বাতাসটা বইছে দমকে দমকে কিন্তু আগে হাল্‌কা এখন একটু যেন শীতল।

চটেব ওপর কাৎ হোল কুমি।—ওরে মা-লো-মা। প্যাট ফাটো ফাটো। খিচুড়ি খাইছি অনেকগুলান!

—ঘুমাইস না কইল।

বিদ্যা তাকাল বসে বসে। চোখ বন্ধ ও করবে না। চোখ বন্ধ করতে ও এখানে আসে নি। এসেছে ও দেখতে। চোখ মেলে দেখতে যা কিছু চোখে পড়ে। কখন যে কি চোখে পড়ে মনে রঙ ধরাবে কে জানে! কুমিটা চোখ বুজল। কালচে ঠোঁট দুটো ফাঁক হোল একটু। কালো মিশমিশে হাতখানার ওপর মাথা। হাতের ওপর লালা গড়িয়ে না পড়ে!

ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মর্দা সকলের মুখেই বেশ তৃপ্তি, হাসি-হাসি ভাব। এত মানুষ, এত আনন্দ! এ মেলায় যে পারে আনন্দ কুড়োয়, যে না পারে ফাঁকে পড়ে।

মস্ত মস্ত ঝাঁটা নিয়ে গোটা দশ-বারো মালী মাঠ সাফ করতে লেগে গেছে। মাঠ সাফ হবে, বিরাট চট পাতা হবে, তার ওপর সতরঞ্চি। ফাঁকা আকাশের তলায় যাত্রাগান হবে আজ সন্ধ্যা থেকে রাত ভর। আজকের পালা নিমাই সন্ন্যাস। নিতাই চাঁদেব মেলা নিমাই চাঁদের গান দিয়ে শুরু; তোড়জোড় চলেছে চতুর্দিকে। দেখতে দেখতে বেলা ঢলে পড়ল। অন্ধকার হয়ে এল অর্জুনগাছতলাটা। খেপী বসে আছে তো বসেই আছে। দেখছে তো দেখছেই।

সতরঞ্চির ওপর কিছু কিছু মানুষ জমায়েত হতে শুরু করেছে। একপাশে অধিকারী বাবুদের জন্যে খানকতক চেয়ার। সেই চেয়ারের পাশ দিয়ে বাঁশ দিয়ে একটু বেড়ার মত করা হয়েছে। মেয়েদের বসার জায়গা। এ ছাড়াও মেয়েদের বসবার আরও স্থান আছে নাটমন্দিরে। দেখছে আর ফিক ফিক করে হাসছে বিন্ধ্যা। এ যেন বেড়া নয়, বন্ধন। এ তফাৎ নয়, আরও আঁট হয়ে কাছাকাছি আসবার টান। মর্দা-মানুষদের ছোঁয়ার ভয়, দৃষ্টির ভয়, এ যেন এক শক্ত রশির টানকে আরও জোরালো করা। আলাদা থেকে এক হবার টান বাড়িয়ে তোলা।

ফিক ফিক করে হাসছে বিন্ধ্যা। ঘরের মানুষের ঠিকানা নেই, ঘর বাঁচাবার ছটফটানি। পিঞ্জিরা নিয়ে টানাটানি, পাখীর উদ্দেশ নাই। পক্ষী যদি উড়াল দেয় চক্ষুর ইসারায়, পিঞ্জিরা দেইখ্যা খপর পাইত কে? কেই বা বোঝে, কেই বা জানে! বিন্ধ্যা খেপী কারখানা দেখে অবাক হয়।

কুমি তখনো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। কালঘুমে পেয়েছে ওকে। সন্ধ্যা উৎরে গেল। অনেক হ্যাজাক বাতির সাদা দুধের মত আলো জ্বলে উঠল। আলোর ছাঁট এসে পড়েছে অর্জুনগাছের তলায়।

মানুষ জনে ভরে এল সতরঞ্চি। কুমির ঘুম আর ভাঙে না।

বিন্ধ্যা কুমিকে একটা ঠেলা দিল। অলো অ—কুমি। ওঠ।

কুমি গড়িয়ে ওপাশ ফিরল।

বাজনদাররা বাজনা শুরু করেছে।

—ধুম্বুলি পইড়্যা গেছে। কুমি লো, ওঠ—।

বাজনার জমজমে আওয়াজে এতক্ষণে চোখ মেলল কুমি। চোখ দুটো ডলে হাই তুলল। কালো মুখখানা চকচক করছে আলোয়। চোখের কোল দুটো ফুলো ফুলো।

যাত্রাগানের আগে সবাইকে জানান দেবার জন্যে তিনদফা বাজনা বাজান হয়। একদফা বাজনা শেষ হোল। লণ্ঠন হাতে দলে দলে মানুষ আসছে। বিন্ধ্যা বসে বসে দেখছে।

কুমি উঠল। আঁচলে মুখখানা যত্ন করে মুছল। চট করে পোঁটলা থেকে চিরুণীখানা বার করে চুলের সামনের দিকটা আঁচড়ে নিল। একটা পান বার করে মুখে পুরল। শাড়িখানা আঁট-সাট করে পরে নিয়ে উঠে বলল—চল।

কুমি এসে বাঁশের সীমানার ওপাশে বসতে গেল, খেপী রাজী নয়।

—না, ওয়ানে বসুম না।

বাঁশের বেড়ার ঠিক উল্টো দিকে নজর পড়তেই কুমিও আর আপত্তি করল

না। ওকে টেনে নিয়ে ওর নজরের জায়গাটাতেই চলল। এগিয়ে এসে পেছনে একটা কোণে বসে পড়ল ওরা। বসে কুমি পেছন ফিরে আর একবার তাকাল। হ্যাঁ, মুকুন্দ দোকানী ঠিক ওদের পিছনে বসেছে। কুমিকে তাকাতে দেখে হাসল। হাসি দেখে কুমি চোখ ঘোরাল।

দুটো ছোট জাতের মেয়ে এসে পেছনে বসেছে। তাতে কার কি আসে যায়। বছর অন্তে একবার মাত্র যাত্রা গান হয়। সবাই গান শোনায় ব্যতিব্যস্ত। পালাগান জবর, নিমাই সন্ন্যাস। নিমাই সাজব কেডা ? মদইন্যা।

যাত্রাগান জমে উঠেছে। মদইন্যা--হ্যাঁ মদন ভুঁইয়ার গান কানে মিঠ্যা রস ঢালে।

ঘরের আগুন বিষ্ণুপ্রিয়া, দিয়্যা যাই
মা জ্বালাইয়া
সেই আগুনে জ্বইলব্যা দিবানিশি গো
—ও—ও—ও।

ঘাড় পর্যন্ত চুল, হলুদে রঙের সিল্কের কাপড় চাদর। মদনের কি শোভা হয়েছে। অত কালো আর দেখায় না। বেশ ফরসা ফরসা দেখাচ্ছে। চোখ দু'খানা যেন কান ছোঁয়া। বলিহারী সুর আর আওয়াজ। নিখুঁত নিষ্কম্প গলা। সুরটা বেশ ভদ্দর ভদ্দর—যেমন মিঠা তেমনি চড়া। এক মাঠ মানুষ সবাই শুনতে পাচ্ছে।

বিদ্যাধরীর নয়নে পলক নাই। কি গান গায়রে কালা মদন! ঠ্যামন গাওনা ত্যামন বাজনা।

নিমাই আর ঘরে থাকবে না। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমুচ্ছে, নিমাইচাঁদ ঘর ছেড়ে যাবার সময়—মুখখানা ফিরিয়ে বারবার দেখছে বিষ্ণুপ্রিয়াকে। নিমাইয়ের চোখ উদাস—মন উদাস। নিমাই বাউল হবে বুঝি।

বুকটা কাঁপছে বিদ্যার। মস্ত চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠছে। এতবড় মাঠখানা নিস্তব্ধ-নিশ্চুপ।

নিমাই চলে গেল। অকস্মাৎ ঘুম ভাঙল বিষ্ণুপ্রিয়ার। নাকের নাকছাবি কই তার ? নাকছাবি খুঁজে পাচ্ছে না। তবে কি হারাল, নাকছাবি হারাল। তার কি সর্বস্ব হারাল।

খইসা পড়ল নাকের সোনা,
অমঙ্গলের চিহ্ন যায় গ জানা।

গান ধরেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। চিকণ গলায় সুন্দর লাগছে বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তার নিমাই বুঝি নেই!

বিন্তার বুকটা যেন আখ মোচড়ানর মত মোচড়ায়। তার কালা মদন নেই, কালা মদন চলে গেছে। আবার কখন আসয়ে আসবে কালা মদন?

—অ কুমি, বুকখান আমার কেমুন করে লো!

ফিসফিসিয়ে পাশে তাকিয়ে বিন্তা দেখে কুমি নেই। কুমি গেল কোথায়? কুমি নেই। তার কালা মদন নেই।

খেপীর হাঁপ ধরে যায়। আশে-পাশে তাকায়। কুমি নেই।

কুমি তখন মুকুন্দ দোকানীর ছাপরায় হাসতে হাসতে মুকুন্দর মোষের মত গলাখানা জড়িয়ে ধরেছে। মুকুন্দ হাসছে খুক খুক করে। বরাবরই ও এই রকম। দোকান সাজাবে, পসার সাজাবে, বিক্রি বাটা সবই হবে। কিন্তু নজরটা ওর সেই একমুখো। মেলায় গঞ্জে খুপরি পেতে যারা বসে, তাদের কাছে যায় না মুকুন্দ। পয়সা দিয়ে সওদা করবে। বাসিদ্রব্য নেবে না। দু-পাঁচ-দশ যাই লাগুক না কেন! এ ওর একটা নেশা।

যাত্রাগান শুরু হবার আগে বিন্তা আর কুমি যখন বসতে গেল, ওপাশ থেকে ইসারা করল ও কুমিকে। ইসারায় জবাব দিয়ে কুমি এসে বসল ওর পাশে। গানটা যেমন জমেছে, কুমির পিঠে ঠ্যালা দিয়ে ইসারায় তাকে সঙ্গে আসতে বলল। কুমিও দু-তিন দিনে হাঁপিয়ে উঠেছিল। রাত্তির ক'টা কাটল যেন শুধু শুধু কেমন ফাঁকা ফাঁকা। কুমিও চলে এল। একেবারে মুকুন্দর দোকানের ছাপরায়।

যাত্রাগানের আসর চলেছে পুরোদমে। নিমাই ঘর ছেড়ে গেল। ধুমুলির বাজনা শুরু হোল। এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম। বিন্তাধরী তাকাল পাশে। একটা কেন্নো যাচ্ছিল ওর পাশ দিয়ে। ওটাকে ধরতেই গোল পাকিয়ে গেল। ছুঁড়ে ফেলে দিল। কুমিটা গেল কোথায়? ভাবল দু-চারবার। তারপরই ভুলল। যেখানে খুশি যাক না। সব মানুষই মজা চায়, সুখ চায়। সুখের খোঁজে ছুটে বেড়ায়, গতাগতি করে। ভাববার আর আছে কি!

গান শুরু হয়েছে আবার।

না। মদন ভুঁইয়া আর তেমন জমাতে পারছে না। বরং বিষ্ণুপ্রিয়ার গানগুলো যেন সবার মনে আর্তনাদ তুলছে। করুণ সুরে বেহালার ছড়ির টান। খুব ভাল বাজিয়ে। আসর ভিজিয়ে দিয়েছে। তেমনি শচীমাতা, তেমনি নিতাই, নিতাই শচীমায়ের কাছে এসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

মাগো তুমি ভয় কইরো না,
ভয় কইরো না।

নিমাই হইল কিষণ চৈতন্য
তুমি মাগো হইলা ধন্য।
কইয়ো না মানা।

বেশ গাইছে নিতাই। নামটা কি এর। মনসাচরণ। তোফা গাইছে মনসাচরণ। মদন ভুঁইয়ার গলায় কি ঘুণ ধরল না কি? গলা তেমন উঠছে না, তেমন সুরের বোল-বোলানি হচ্ছে না। হোল কি মদনের? নেশা-ভাঙ করে নাকি? তা নিশ্চয় করে, যাত্রাগান করে আর নেশা করে না। জন্ম বেড়াল হয়ে আর কৈতর খায় না?

মাঝ রাত্তিরে গান ভাঙল। ভোর হবার তখনো দেরি আছে।

বিন্দা তাকাল আবার পিছন দিকে। ও মা, ওই তো কুমি। অবিশ্যি যেখানে বসেছিল আগে, সেখান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে বসেছে। পাশে ওটা কে? মুকুন্দ। কুমির সঙ্গে কি ফিসফিস করছিল। বিন্দা তাকাতেই থেমে গেল মুকুন্দ। কুমিও মুখখানা ঘুরিয়ে নিল। বিন্দা হাসল। বেদম হাসি পেল। ইসারায় ডাকল কুমিকে। ভিড় পাতলা হচ্ছে ক্রমে। মুকুন্দ ভিড়ের ভেতর মিলিয়ে গেল। কুমি উঠে এল।

আসতেই বিন্দা বলল,—কোয়ানে গেছিলি?

—আ মরণ, যামু আবার কোয়ানে! রইয়া আছিলাম বাইরে। গরমে কাঁপড় ঠেকত্যাছিল।

বিন্দা আর কিছু বলল না। হাই তুলল একটা। ভিড় পাতলা হবার পর এক পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

আবার ভোর। আবা দুপুর। আবার বিকেল।

আজও গান আছে। মাথুর পালা। আবার সন্ধ্যা নেমে এল। আবার হ্যাজাক জ্বলল সারি সারি।

ধুম্বুলির বাজনা বাজল। ওরা বসল কালকের জায়গায়। পাশে ঠিক এসে দাঁড়াল মুকুন্দ।

কুমি উসখুস করে উঠল। বিন্দা দেখেও দেখল না। যাত্রাদলের কিষ্ট কালা মদন। কিষ্টর গানেই কালামাণিক পরিচিতি। সুখ্যাত করে সবাই। কালা মদন আজ কিষ্ট সাজবে। বিন্দার মন আনচান। কতক্ষণে কালা মদন নামবে আসরে। শুধু ও নয়, আশে-পাশে অনেকেই উসখুস করছিল।

কৃষ্ণ এল আসরে। কিন্তু এ কি! এতো কালা মদন নয়! চারদিকে গুঞ্জন। অস্ফুট গুঞ্জন। মদন ভুঁইয়া গেল কোথায়? অসুখ করল নাকি? না-কি রাগারাগি করে দল ছেড়ে চলে গেল? কি হোল মদন ভুঁইয়ার?

বিত্থার গলাটা তেতো লাগছিল। গান শুনছিল, কিন্তু মন, নেই। কেমন বিস্বাদ লাগছে যাত্রাগান।

কৃষ্ণ সেজেছে কালকের নিতাই—মানে মনসাচরণ। গলাখানা ভাল, তবু মদন ভুঁইয়্যার মত নয়।

যাই হোক, জমিয়েছে মনসাচরণ। বয়েস কিছু কম। উঠতি গাওনাদার।

বিত্থাধরীর চোখ দুটো একটু যেন মেঘলা মেঘলা। আনমনা দৃষ্টি। উসখুস করে গা চুলকোতে চুলকোতে পাশ ফিরল বিত্থা। সত্যি বড় গরম লাগছে এই ভিড়ে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আজও দেখল কুমি নেই। কুমি যে কখন উঠে চলে গেছে টেরও পায় নি বিত্থা।

গরমে ফাঁপড় লাগছিল কুমির। তা হবে। ওর নিজেরও ফাঁপড় লাগছে আজ। গলা ঘেমেছে, পিঠ ঘেমেছে।

উঠে পড়ল বিত্থাধরী। আস্তে আস্তে বাইরে চলে এল। মানুষের ভিড় বাঁ পাশে রেখে একটা চক্কর দিয়ে মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দমকে দমকে হাওয়া দিচ্ছে। ফাল্গুনের প্রথম রাত একটু বাড়লেই হাওয়া দেয়। কেমন একটু শীত শীত করে। ঠাণ্ডা হাওয়া, গায়ে লেগে বেশ আরাম দেয়, কিন্তু জ্বর-জারির পক্ষে ভাল নয়।

গায়ে শাড়ির আঁচলখানা ভাল করে মুড়ে তাকাল বিত্থাধরী। তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে। মাত্র দু'দিন আগে পূর্ণিমা গেছে। হ্যাজাকের আলোয় লম্বা লম্বা মানুষের ছায়া পড়েছে মাঠে। গোটা মাঠখানা নিস্তব্ধ। কানে আসছে গাওনা-বাজনার শব্দ। তাকাল ডানদিকে। সামনে সড়ক আর খালের পুলটা চাঁদের আলোয় ছায়া ছায়া মনে হচ্ছে। পুলের পাশে নিবিড় অন্ধকার। লম্বা লম্বা বাঁশের ডগা দেখা যায়—বোধ হয় মস্ত একটা বাঁশঝাড় আছে ওখানে। বাঁশঝাড়ের শন শন শব্দ বাতাসের আওয়াজটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কানের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে হুহু করে হাওয়া বইছে।

ভাল লাগছে না বিত্থাধরীর। মনের তলাটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় যেন কি একটা পেল বলে মনে হয়। কি পেল? পাবার আশায় আর সন্ধানে বহুকাল কেটেছে; মনের মধ্যে যে আজব মানুষ। সেই মানুষকে পাবার কথা শৈশব থেকে শুনেছে ও বাবার কাছে। বাবা ওর বুকে টোকা দিয়ে বলত ছোটবেলায়। এইড্যার মধ্যে যে মানুষ রইছে, তাক্ যদি জাইনতে পারস, তয় তইর‍্যা গেলি ছেমড়ি।

তখন তো ছাই এত কথা বোঝা যেত না। কতকাল কাটাল। ও সেই মানুষের সন্ধান করছে। বাবা ওকে দমের কাজ শেখাল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া। তারও পরে বয়েস যখন হোল, বাবা এক ভোর বিয়ানে বলেছিল ওকে, তর মধ্যেই

পুরুষ পিকিতি তর মধ্যেই রজবীজ। অদর মানুষ নাইম্যা আইসে ঘাটে। নজর রাখলে ট্যার পাবি। সেই মানুষরে যদি ফান্দে ফ্যালাইবার পারস তক লইয়া উইঠ্যা আইব এয়ানে।

ওর কণ্ঠে আঙুল দিয়ে দেখাল বাবা।—এ বড় জোর সাদন ছেমড়ি। মানুষ পাইলে রসের ছোতে ভাইস্যা যাবি। সুখ কারে কয়। বুইঝব্যার পারবি। সগ্গল সুখ মনে। মনখ্যান টালমাটাল না হয় কইল।

এমনি করে কত কথা বলেছে তাকে বাবা। কত কথা বুঝিয়েছে।

বললেই কি ছাই বোঝা যায়! বুঝতে হয় মনে মনে। মনের মর্ম মনে বুঝতে হয়।

সব কিছু তুচ্ছ করে একতারা খঞ্জনী আর গানকেই ও আশ্রয় করে আছে এতকাল। এক-একটা গান গাইতে গাইতে দমের কাজ হয় আপনা-আপনি। থির হয়ে যায় মন-বাতাস। গানের মর্মকথা আলোর মত পরিষ্কার দেখতে পায়। বোঝাতে হয় না কাউকে। নিজেই বোঝা যায়। গানের প্রতিটি অক্ষর চেতন হয়ে জ্বলজ্বল করে। সব রহস্য স্পষ্ট হয়। কিছু আর আবোঝা থাকে না।

বিদ্যাধরী বাবার কথা ধ্রুব করে নিয়ে সেই মুখোই তার নাও বেয়ে চলেছে। বাইরের সুখ সুখ না, সগ্গল সুখ মনে। যে রঙে মন রাঙাও, সেই রঙে রাঙবে। তাই তো গানে গানে মনকে বলে। সামাল সামাল। টালমাটাল হোয় না।

কিছুকাল হোল একটা কথা বার বার সে বুঝতে পারছে। রসিক মানুষ ধরতে হলে তাকে দেখতে হবে বাইরের কোন মানুষের মধ্যে। না হলে কিছুই যেন পূর্ণ হয়ে ওঠে না। একটা আশ্রয় চাই। বস্তু একটি চাই। মানুষ একটি চাই। যাকে ধরে সে মনের সেই অধর মানুষের নাগাল পাবে, তাকে ফান্দে ফেলতে পারবে।

বার বার সে পালায়। সে মাছ জালে পড়ে না। ঘাটে বসে বসে অনেক কাল কাটল। তাকে ধরা গেল না।

সময় বুঝে বাঁধ না দিলে আর উপায় নেই।

কিন্তু কই সে মানুষ? ত্যামন মানুষ কই। যার ওপর সে মন ফেলে রসের ভিয়ান চড়াবে। যে তাকে উথাল করবে রসের স্রোতে। যার সঙ্গে তার দেহের সম্বন্ধ থাকবে না। যাকে সে বসাবে ও মনের পৈঠেয়। আস্বাদন করবে তার শুদ্ধ রস। সেই মানুষ হবে তার একমাত্র মানুষ। তার তরে মন-প্রাণ সব ঢেলে দিয়ে তাকে ধরে সেই চরম পুলকে নেচে গেয়ে বেড়াবে? কই সে মানুষ?

পীরিত কেমুন জানলাম না।
মন দরদী খুইজ্যা পাইলাম না।

তারই সন্ধানে সে অনেক দিন রাত কাটিয়েছে। এ মেলায় বুঝি তার সাক্ষাৎ মেলে !

কে সেই মানুষ ? কালা মদন ? মনটা টনটনিয়ে ওঠে।

আজ যাত্রাগানে কালা মদন নেই কেন ? কি হোল ওর ? তবে কি চলে গেল কোথাও ? না কি অসুখ হোল।

কানের পাশ দিয়ে হু হু করে বাতাস বইছে। বিদ্যাধরীর প্রাণ আনচান করে। ভাল লাগে না যাত্রা শুনতে। ভাল লাগছে না আর মানুষের ভিড়। একজনকে সে খুঁজতে চাইছে।

আস্তে আস্তে এগোয় বিদ্যাধরী। ওদের থাকবার যে ঘরগুলো আছে সারবাঁধা সেখানে গিয়ে খোঁজ নিলে কেমন হয় ! ধীরে ধীরে সেই দিকেই এগোচ্ছে বিদ্যাধরী। হাওয়ার শনশনানি তেমনি রয়েছে। একটু যেন শীত শীত করছে।

এগিয়ে ঘরগুলোর কাছাকাছি গিয়ে নজর করে। ঘর যে সব অন্ধকার। ঘরের লম্বা ছায়া পড়েছে চাঁদের আলোয়। ঘরের সামনে ঘুর ঘুর করে বিদ্যাধরী। এ-পাশ ও-পাশ করে। না, কালা মদন নেই। কোথায় গেল কে জানে।

গুনগুনিয়ে ওঠে বিদ্যাধরী। বুকের ভেতরে হাঁসফাস করে। কেন সে সময় বুঝে কালা মদনকে ধরল না।

সময় বুইঝ্যা বাঁধাল বাধল্যা না।
জল শুকাইব, মীন পলাইব,
পস্তাবি রে মন কানা।
সময় বুইঝ্যা বাঁধাল বাধল্যা না।

গুনগুনিয়ে আওয়াজ তোলে বিদ্যাধরী।

কুমিটাই বা গেল কোথায় ? সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। কিছুই ঠিক ভাল হোল না। মেলায় আসা-যাওয়া সার হোল। হট্টগোলে রতন হারিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে অর্জুনগাছ দুটোর দিকে এগিয়ে আসে বিদ্যাধরী। ওখানেই বসা যাক, শোয়া যাক। আকাশের দিকে তাকিয়ে গুনগুনিয়ে রাত কাটান যাক।

মস্ত দুটো অর্জুনগাছের তলায় পাতার ফাঁক গলে চাঁদের আলো পড়েছে ঘাসে মাটিতে। এগিয়ে এসে দু-পা পিছিয়ে গেল বিদ্যাধরী। কে একটা উবু হয়ে বসে আছে ওখানে। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে, সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা কিছু বড় গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে, অথবা উবু হয়ে।

ভয় পাবার মেয়ে বিদ্যাধরী নয়। আরো একটু এগোল ও।

—ওয়ানে কেডা ?

আরও এগোল।

—তুমি কেডা ?

চমক লাগল বিদ্যাধরীর। কালা মদনের গলার আওয়াজ। এখানে কি করছে কালা মদন! যাত্রাগানের আসর ছেড়ে, নিজেদের শোবার থাকবার ঘর ছেড়ে অর্জুন-গাছের তলায় ? এখানে বিদ্যা আর কুমি দিনের বেলাটা রোজ কাটায়, এখানেই বিদ্যা গান ধরে আওয়াজ তোলে সকালে বা দুপুরে। এ জায়গাটা তাদের বাছা জায়গা। এখানে ও কেন ?

এগিয়ে এল বিদ্যাধরী।—কেডা, কালা মদন ?

মদন তেমনি বসে রইল বড় গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, তাকাল বিদ্যাধরীর দিকে।

—গান শুনল্যা না ?

বিদ্যা বলল,—ভাল লাগল না।

—ক্যান ?

বিদ্যাধরী এ কথার জবাব না দিয়ে একটু তফাতে বসল। গায়ে ভাল করে শাড়ির আঁচল মুড়ি-সুড়ি দিয়ে পা ভাঁজ করে বসল। ভাল করে তাকাবার চেষ্টা করল মদনের দিকে। মদন মুখটা নিচু করে ঘাস ছিঁড়ছে একটা একটা করে।

বসবার ভঙ্গিটা ক্লান্ত। কাঁধ পর্যন্ত চুল আজ পরিপাটি করে আঁচড়ান নেই, এলোমেলো।

বিদ্যাধরী হাসল।

হাসা ওর স্বভাব, তাই হাসল।

বাতাসে যাত্রাগানের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। বিদ্যাধরীর চোখের সামনে দূরে সেই সড়ক আর কাঠের পুলটার ছায়া। বিদ্যাধরী একটা নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণের অস্বস্তির বদ্ধ বাতাসটা যেন নিশ্বাসে বেরিয়ে গেল।

—তুমি আজ গাইলা না ?

একটা বড় নিশ্বাসের শব্দ কানে এল বিদ্যার। মদন মুখটা সামান্য তুলে বলল—না।

—মানষে তোমার কথা কইতিয়াছিল।

—কি কইল ?

—কইল, মদনের ব্যামো হইল নি ? কিষ্ট হইল মনসাচরণ!

মদন মুখটা তুলল। তাকাল বিদ্যার দিকে। চাঁদের আবছা আলোয় বালুচরের মত মনে হোল ওর মুখখানা। টান টান হয়ে বসল বিদ্যাধরী। মনে টান লাগছে।

—কি অইল তোমার ?

—অয় নাই কিছু।

—তয় গান গাইলা না ক্যান ?

আর একটা নিশ্বাস ফেলল মদন, শব্দ করে—কত্তার ইচ্ছায় কম্ম। বুঝলা না ?

বুঝল না বিদ্যাধরী। বলল,—কত্তা কেডা ?

—দলের কত্তা। পতিতপাবন সাউঁ।

—সে তোমাক কি কইছে ?

—আলায় কইব আর কি। আমারে আইজ খাইবার দিল না। কয় বলে, তর গান মানষে শুনবার চায় না। গাইয়া তর কাম নাই। এয়ার পরে তরে দিমু ছেকেন পাট। মনসা ফাচ্ পাট। আলা গাওনার বোঝে কি, খামখা খ্যাচর ম্যাচর করে।

বিদ্যাধরী বুঝল এবার। দলের কর্তা পতিতপাবন ওকে আজ বসিয়ে দিয়েছে। গাইতে দেয় নি। কারণ অবিশ্যি একটা ছিল। বিদ্যা নিজে কানেও কাল শুনেছে। অনেক লোকই কাল বলছিল। মদনের গলায় মরচে ধরেছে। ত্যামন গলা নেই। প্রাণে লাগে না গানের সুর। বিদ্যার নিজের কিন্তু ভালই লেগেছিল। হতে পারে—হয়তো মদনের গলা আরও ভাল ছিল। এ সব গানের জাত বেজাত ভাল বোঝে না বিদ্যা। ওর কাছে গান মানে মনের খুশিতে আওয়াজ তোলা। রসের ঢেউ যদি আসে তোমার মনে, সে ঢেউ এসে লাগবে মানুষের মনে। তারা রসে জারবে। সুখ পাবে। গান যেন খুশি খেয়ালের রসের স্রোত। তাতে নিয়মমাফিক কোন বাঁধন নেই।

মদনের মুখখানা থমথমে। আষাঢ়ের আকাশের মত।

একটা দুর্বা ঘাস চিবোতে চিবোতে বলে উঠল মদন,—ধুর আলায়, দলে আর থাকুম না। গান আর গামু না।

বিদ্যাধরীর গলাটা মমতায় ভেজা-ভেজা। বললে,—তোমার দ্যাশ কোয়ানে ?

—বেতুল গঞ্জের কাছে মুড়িখাল, গাওয়ের নাম।

—দল ছাইড়্যা কি দ্যাশে যাইবা ?

—কি করুম, তাই ভাবত্যাছি।

—দল ছাড়নের কাম কি। কত্তারে বুঝাইয়া কও গা।

—কথা আরও আছে। কত্তা এ দল তুইল্যা দিব। আলায় ঘাটুর দল বানাইব। কয় বলে, ঘাটুর দলে ছ্যামড়া গো জন্যে খরচপাতি কম। মানুষে ভাইঙা পড়ে ঘাটুর গান শুনতে।

ঘাটুর দল বানাবে! সুন্দর সুন্দর ছ্যামড়া নিয়ে গানের নামে অসভ্যতা করবে। ও সব গান কি ভদ্দর লোকে শোনে! ব্যাটা পতিতপাবন আর ভদ্দর লোকদের গান

শোনাতে চায় না। তারা পয়সা দিতে জানে না। ঘাটুর দলের বাহারের গান শুনলে আসরেই টাকা পড়বে, পয়সা পড়বে। শেখ আলী জোলা চাষী ভেঙে পড়বে আসরে।

মদন স্থির করেছে, দলে ও আর থাকবে না।

বিদ্যাধরী আস্তে জিজ্ঞেস করে—ত্যাশে তোমার আছে কেডা ?

—ভাইগনা ভাগনিরা আছে, আর কেউ নাই।

বিদ্যাধরী আরট টান টান হয়ে বসল। ফস করে বলে বসল,—তয় লও যাই আমার সাথে। মনের সুখে গান গামু, খামু-দামু-বেড়ামু। লও যাই, কাইলই চলো।

মদন সোজা হয়ে বসল। বিদ্যার দিকে ভাল করে তাকাল। ওর চাকার মত মুখখানায় মস্ত চোখ দুটো চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। মুখখানায় হাসি যেন মাখা। রসে খুশিতে ভরপুর এই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালই লাগছিল। নইলে আর এত সব প্রাণের কথা ও ফস ফস করে বলে ফেলল কি করে ? যে কথা ওকে আজ বলল, এ কথা কাউকেই বলা হয় নি। মনের কথা মনেই চেপে ছিল। একে বলল কেন তার দুঃখের কথা। আর শুনেই বা এ ফস করে বলে বসল কি করে চলো যাই আমার সঙ্গে। ভারি অদ্ভুত লাগছে।

আজ বড় অপমানিত হয়েছিল মদন। দল থেকে তাকে বাদ দেয়া মানে তার মর্যাদাকে ধুলিসাৎ করা। তার গানের জন্যে যে সুখ্যাত যে মান, তাকে একটা ঘায়ে চুরমার করে দিয়েছে পতিতপাবন। এ যে তার কত বড় অপমান কেউ বুঝবে না। একা একা অর্জুনগাছের তলায় বসে সে জ্বলছিল আর ভাবছিল, কি করবে ? এর পরে অপমানে মুখ নিচু করে কি করে সে দলে থাকবে। না থাকলে যাবেই বা কোথায় ? এতকাল ধরে দলের সবাই ওকে খাতির করত, তার কথার ওপর কেউ কথা বলত না। কর্তা পতিতপাবনও তাকে বেশ মান্য দিত, আর এখন ? কাল সকাল থেকে কেউ কেউ তাকে করুণা করবে, ম্যাগারা মুচকী হাসবে আড়ালে, মনসাচরণ আর কিছুকাল পরে তার সামনেই বিড়ি ধরাবে পা নাচাতে নাচাতে। অথচ এই মনসাচরণকে সে কত গান আড়ালে ভাল করে শিখিয়েছে, কে আর জানবে সে কথা।

এ দলে আর এক মুহূর্তও তার থাকা চলে না। একমাত্র পারে সে অন্য দলে যেতে। সিরাজগঞ্জে গিয়ে অথবা টাঙ্গাইলে গিয়ে কোন দলের কর্তাকে ধরলে তাকে নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তাতে খুব সুবিধে হবে না। তিরিশের কোঠায় বয়েস হোল। এখন আর মুখখানা তার তেমন কচি-কচি নয় যে কৃষ্ণ অথবা নিমাইয়ের গান অন্য কোথাও তাকে সমাদরে গাইতে বলবে।

তাছাড়া ভালও আর লাগে না। দুপুরে বেলা পড়বার মুখে খাওয়া আর রাত্তিরে ভোরের দিকে খাওয়া। বর্ষাকাল বাদে সারাটা বছর ঘূর্ণির মত ঘোরা। ইস্টিমারে, কোথাও নৌকায়, কোথাও গরুর গাড়িতে, কোথাও বা দু-তিন ক্রোশ হেঁটে আসর পাতা, রাতভোর চিৎকার করা। নাঃ! আর ভাল লাগে না।

এগারো বছরে সখি সেজে ঢুকেছিল, আর একটানা প্রায় বিশ বছর রাতের পর রাত এমনি করেই কাটিয়েছে। বর্ষায় দিদির কাছে গিয়ে ক'মাস কাটিয়ে কিছু টাকা দিদির হাতে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এখন ভাগনেরা বড় হয়ে উঠেছে। পনেরো বিঘে জমি চায়, বাড়িতে গরু, বাগানে তরকারি, পুকুরে মাছ, অনটন নেই কিছু। দিদিও আর নেই। দু'সন আগে মারা গেছে। ভাগনেদের কাছে যেতে হয়, তারা মামার মর্যাদা বোঝে। যত্নআত্তি করে, হাজার হোক এ চত্বরের একমাত্র কিষ্ট তাদের মামা, তার মর্যাদাই আলাদা!

এখন তারাও যদি শোনে মামা কিষ্ট থেকে বলাইয়ে নেমেছে, তবে তারা কি আর সেই মর্যাদা দেবে?

কোথাও পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচত মদন।

এমনি ভাবনার মুখে বাউলী বলে বসল, লও যাই। আমার সাথে।

কথাটা ফেলে দেবার তো নয়ই বরং অবাক হয়েছিল মদন। এমন একটা প্রস্তাব ঠিক সময়মত তার কানে শোনাল, এ কার দয়া। একি ভগবানের দয়া?

তাকাল মদন বিদ্যাধরীর দিকে। বড় বড় চোখদুটোর পাতা নামিয়েছে বিদ্যাধরী। মুখখানা চাঁদের আলোয় মাজা মনে হয় যেন। মাথার চাঁদির ওপর খোঁপাটি আলগা করে দিল বিদ্যাধরী। হাত দু'খানা তুলে খোঁপাটা খুলল, ভঙ্গীটি যেন চোখে লেগে রইল মদনের। কি পরিপাটি অথচ আলগা আলগা নড়াচড়া ভাবভঙ্গী। যেন স্রোতের মুখে ভেসে রয়েছে। মনে মচ্ছব লেগেই রয়েছে। খেয়াল-খুশিতে ডগমগ।

ভারি অদ্ভুত এই মেয়েমানুষটি।

মুখটা নামাল একটু বিদ্যাধরী।

অর্জুনগাছের পাতার ছায়া সরতে সরতে ওর কপাল আর ঠোঁটের ওপর পড়েছে।

চোখের পাতা নামাল। আস্তে আস্তে বলল,—তোমারে নি ভাল লাগল, মনে ধরলো, গতিকেই আমার কথাখান মনে ঠেইলো না। তুমি মানুষডা ভাল। তাই কথাখান কইল্যাম।

মদন মুখটা এগিয়ে এনে বলল,—মানুষ আমি ভাল, কইল কেডা?

—আমার ভাল মনে লয়। কইব আর কেডা!

মুখটা একবার তুলে তাকাল বিদ্যাধরী। চোখ দুখানা যেন দীঘির নিথর জল।

মদন হাসল।—নতুন কথা শুনাইলা। এককু দিনে মানুষ চিন?

—এক নজরে চিনব্যার পারি।

হাসল বিদ্যাধরী। সেই আলো চমকানি হাসি।

—তোমার ঘর-বাড়ি আছে নি?

—একখানা ঘর আছে। দোয়াইল গাও। আর আছে ভিক্যার ঝুলি। তোমার কান্দে দিমু আর একটা ঝুলি, গান গামু, জুরি আওয়াজ তুইল্যা তুফানে ভাসাইয়া দিমু পঞ্চগাওয়ের মান্‌ষেরে। কেমুন মজা ভাইব্যা ছাখ৴

মজা বটে। ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে গান গাও, নাচ হাসো, যা জুটল খাও আর মনের বশে নিজেকে ভাসাও।

কিন্তু ভিক্ষে! মদনের মন ওঠে না। মর্যাদা বলে একটা কথা আছে। এ চত্বরে কে না চেনে তাকে! একডাকে মানুষ চেনে। যাত্রাদলের কেষ্ট মদন ভুঁইয়া। শেষকালে ভিক্ষে করতে হবে এর সঙ্গে নেচে গেয়ে!

একটু থমকে ভাবে মদন।—আমি যদি কাম করি?

—কিয়ের কাম? কাম আমাগো একখান। তুমি সারিঙ্গা লইও, আমি লমু খঞ্জুনী। আওয়াজ তুইল্যা ঘুইরা বেড়ামু। আবার কামডা কিয়ের?

মদন হেলান দেয় গাছের গুঁড়িতে। থম মেরে বসে থাকে কিছু সময়। হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারে না।

বিদ্যাধরী হাসে।—লও যাই। কাইল বিয়ানে চইল্যা যামু। তোমার কাথা-মাথা লইয়া আইস। ভাবনের আর কাম নাই।

মদন আস্তে আস্তে ব৺ঃ,—তোমার ঘরে কেউ নাই?

—না।

—বিয়া করো নাই?

মস্ত চোখদুটো তুলে তাকায়। চোখে কৌতুক আর হাসির চাপা ঢেউ ওঠে।
—ঘরে ঘরে বিয়া নাই আমাগো। বিয়ার মানুষ খুইজ্যা লইতে অয়। মানুষ পাইলে সব পাইল্যাম, বিয়া নিকা যাই মন লয় কর না ক্যান। মানুষ নইলে কিছুই অইব না।

মদন মনে মনে হাসল। বিয়ের সাধ আছে ষোল আনা। জামাই জোটে নি। তেমন মানুষ পায় নি যাকে ও বিয়ে করতে পারে। কথাখানার মানেটা যেমন করে নিল মদন, বিদ্যা তেমন করে বলে নি হয়তো। যে যেমন বোঝে।

মদন খুব একটা খুশি হয়ে উঠতে পারল না। কেমন যেন বাধছে। শেষকালে

এই মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে! তাকে বিয়ে করবার জন্যেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে কি না কে জানে! ভিক্ষে করে খায়। তাকে বিয়ে করে কি সুখ পাবে মদন। মদনের বরাতে সুখ বুঝি আর নেই।

তবু মেয়েটাকে লাগে ভাল। কেমন মনের খুশিতে গা এলিয়ে বসে আছে। বসলে কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। ভাবনা-চিন্তাগুলোর বাঁধন আলগা হয়ে যায়। কেমন গা এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ওর মত। বড় মজায় আছে মেয়েটা। মান-মর্যাদা নেই। চাল-চুলো না থাকার মত। গান গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। মন্দ কি! কেমন একটা টান ধরে মনে। কেমন একটা খ্যাপা খ্যাপা ভাব।

—নামডা তোমার খেপী ক্যান শুনলাম সেদিন?

—মানষে ডাকে খেপী।

অল্প অল্প হাসে মদন,—তুমি তোমার খ্যাপা খুইজ্যা পাইলা না?

—পামু। সময় না হইলে ফল পক্ক অয় না।

—তোমাব সাদনডা কি খেপী?

সাধনের কথা জিজ্ঞেস করল মদন। যাবাব আগে খোঁজ-খবর জেনে নেয়া ভাল। ও শুনেছে ওদের ভেতরে অনেক অদ্ভুত সাধনক্রিয়া আছে। সে সব বড় গুহ্য গোপন। কাউকে বলে না ওরা। কে জানে তেমন কোন সাধনক্রিয়ার খপ্পরে সে পড়বে নাকি? আগে-ভাগে সাবধান হতে দোষ কি?

বিন্ধার চোখ টলমল করে।—সাঁইয়েব নামে বাদান তুইল্যা ভাইস্যা বেড়াও। এই না সাদন।

—আর কিছু না?

—না। আর যা সব অন্দরে, বাইর বইল্যা কিছু নাই।

মদন তাকায় আর মিটিমিটি হাসে,—আমাক সাদন শিখাইব্যা?

—কেডা কারে শিখায়। নিজের শিখন নিজের কাছে। নিজের মানুষডারে চিন। তার কাছে শিখ।

বিন্ধাধরী কারো কাছে শেখে নি। আকাশের দিকে তাকায়।

—চান্দরে কেডা শিখাইছে ওয়ানে বইস্যা জোছনায় ডুবাইয়া দিতে। কেডা শিখাইছে এই গাছডারে ছাওয়া দিতে। তোমাকে কে শিখাইছিল এই ছমছমা রাইতে এয়ানে আইয়া বইতে। আমাকে কে শিখাইছিল তোমার কাছে আইতে, দুইডা সুখ-দুঃখের মিঠা কথা কইতে? কেউ নি কারে শিখাইবার পারে। সাঁই গুরু বাইরে নাই, আছে এয়ানে, এই বক্ষের মধ্যে। সগ্‌গলের বক্ষের মধ্যে।

কথাগুলো যেন হাওয়ায় পাতা নড়ার মত ফুসফাস করে বলে বিন্ধা।

—এ হগল কথা কওনের না, বলনের না। এ বিত্তান্ত-যদি শুনবার চাও, তিবেনীর ঘাটে ডুব দেও। রতন আছে গভীরে। এ হগল বড় অকথ্য বিত্তান্ত।

মজা লাগে মদনের। ভারি মজার কথা। বড় রহস্য কথা। এ খেপী সহজ মানুষ নয়। ও টলমল চোখ দুটোর আড়ালে অপার রহস্য। অর্জুনগাছের পাতার ফাঁকের আলোয় আলোয় সে রহস্য যেন আরও ঘন হয়ে এল। খেপীর চোখের দৃষ্টি যেন মিছরির সুতোর মত তার মনটাকে ধরে টানছে।

মদন ভুঁইয়া একটা আশ্চর্য মজা পেয়ে গেছে। ওই খোলা মাঠের হুহু হাওয়ার মত বুকটা একটানে বড় করে দিয়েছে। অনেক বড়। মস্ত আকাশটা তার বুকে সেঁদোল কি করে? মদনের বুকটার কোথায় কোন এক ফোঁটা জঙ্গল বাদাড়ের মত পড়ে রয়েছে পতিতপাবনের গ্লানি, আর কিষ্টযাত্রার মর্যাদা। সব যেন ভুলিয়ে দিয়েছে খেপী।

খেপীর চুল খুলে পড়েছে পিঠ বেয়ে। টান টান হয়ে বসে নির্নিমেষে তাকিয়ে রয়েছে মদনের দিকে। মস্ত চোখ দুটোয় পলক পড়ে না। দীঘির মত নিথর চোখ দুটোয় কি একটা ইসারা—এক রহস্যের হাতছানি।

মদন ভুঁইয়ার বুকের বাতাস থমকে গেছে। নিশ্বাস পড়ে কি পড়ে না।

—আমি যামু তোমার সঙ্গে।

মদন নিশ্বাস ফেলতে পারল এতক্ষণে,—কথা কইয়া আরাম পাইলাম বড়।

বিন্থার চোখ দুটি তেমনি ভিজে ভিজে মেঘলা রহস্যে ভরা,—পথম দিনই চিনছিলাম তোমারে। তুমি আমার কালা মদন। তুমি চেন নাই।

হয়তো তাই। কে[illegible] গা শিরশিরে ফিসফিস কথা। মদনের বুকের বাতাস কাঁপছে। তাকিয়ে রইল খেপীর দিকে। ভাব-ভাবনা কিছুই আর নেই। খেপীর স্রোতে গা ভাসান আলগা ভাবখানা ত[illegible]কও যেন পেয়ে বসছে ধীরে ধীরে। মন্দ কি। জানা নেই, শুনো নেই, সামনের অজানা স্রোতে গাঁ ভাসিয়ে দিতে পারলে মন্দ কি! আর কিছু না থাক। মজা আছে। জানা পথে আর মজা কোথায়। যত মজা অচেনা পথে।

মদন ভুঁইয়া গা ভাসাল।

পাঁচ

না, জানা পথে ফিরবে না খেপী। মদনও রাজী। কুমি একটু কিন্তু কিন্তু করে। ভয়-ডর লাগে।

বিত্তাধরী হেসে খুন। হাসির ছোঁয়াতে হাসি লাগে।

ভোর বিয়ানে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ধুলো জমেছে। রুক্ষ চুল উড়ছে বাতাসে। আঁচল যেন নাওয়ের পালের মত ফুলে উঠছে মাঝে মাঝে।

চলছে তো চলছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছে।

যাবার পথে সঙ্গী ছিল। ফেরার পথে দলবল নেই। সঙ্গী-সাথী নেই!

ওরা তিনজন। মেলায় গিয়েছিল দুজন, সঙ্গে ছিল দলবল। ফিরছে তিনজন দলবল নেই। সায়রের মেলায় গিয়ে সওদা করে ফিরছে বিত্তাধরী। নিজের পরাণডা বেচে কিনে এনেছে আর একখানা পরাণ।

বিত্তাধরী দুলতে দুলতে চলেছে। ভিতরটা ওর উথাল-পাথাল।

—পথ নি চিনস ?

না পথ চেনে না বিত্তাধরী। মানুষ চেনে। পথ চেনবার দরকারটা কি। চলতে চলতে এক সময় না এক সময় পৌঁছবেই নিশানায়। পথের ভাবনায় পথের মজাটা খোয়াতে চায় না বিত্তাধরী।

সোজা সড়কের পথ ধরে চলেছে ওরা। ধুলোয় ভরা উঁচুনিচু পথ গরুর গাড়িব চাকার দাগে খানিকটা সমান সমান হয়েছে। গরুর গাড়ির চাকার দাগ সোজা সড়ক ধরে চলে গেছে যতদূর চোখ যায়। দু' পাশে ক্ষেত আর মাঠ। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট জলা। জলের চেয়ে কাদা বেশি। কাদার ওপর টুকটুক করে আলতো লম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বক চুনো মাছের সন্ধানে।

ওরা চলছে তো চলছেই। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

পুব আকাশটায় রঙ ধরেছে। কাঁসার ঝকঝকে থালার মত সূর্য উঠবে এখুনি, তারই আভাস। বাঁ পাশে মটর-কলাই ক্ষেত। মটর-লতার কচি ডগাগুলো চিকচিক করছে ভোরের আলোয়। বাতাসে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। চিকচিকে সবুজ কলাই ডগার দিকে তাকিয়ে চোখ ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে। বেশ ডাগর ডাগর মটর শুঁটি। বাতাসে দুলছে মায়ের কোলে কচি বাচ্চার মত। ডানদিকে মাঠ পেরিয়ে বসত। কিছু গাছ-গাছালি ঘেরা ছোট একখানা গাঁও। দশ-বিশ ঘর মানুষের বাস। দুটো ন্যাংটো

বাচ্চা ছুটতে ছুটতে কলাই ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। টকাটক মটরশুঁটি ছিঁড়ে ছোট ছোট মুঠোর দুটো মুঠোয় যে কটা পারে ভরে নিয়ে আবার ছুট।

ওদের ভয় দেখাবার জন্য একটু তাড়া করল মদন। পাঁই পাঁই করে দুটো পাখীর মত হাওয়ার আগে যেন উড়ে গেল বাচ্চা দুটো। সেই ছায়া ছায়া গাছ-গাছালি ঘেরা গাঁওয়ের ভেতরে। হেসে উঠল মদন। ভোরের বাতাসে মদনের ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল উড়ছে—পড়ছে মুখের ওপর। বাঁ হাতে মুখ থেকে চুল সরিয়ে দিল মদন। ডান হাতে ধরে আছে মাথার ওপর ছোট একটা স্যুটকেশ—তার ওপর দুটো পুঁটলী। টিনের স্যুটকেশ। গোলাপ ফুল আঁকা ওপরের ডালায়। বছর ছয়েক আগে পলমাইটার হাট থেকে কেনা। দু-চার জায়গায় গাঢ় খয়েরী রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে রোদে-জলে। তবু এমন একটি সম্পদ খুব বেশি মানুষের নেই। এটা মদনের মর্যাদা বাড়ায়।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস। পায়ের নিচে ধুলো ঠাণ্ডা। সামান্য ভেজা ভজা। মদন চলেছে। এমন চলা ও বহুকাল চলে নি। কোন ভাব-ভাবনা নেই, কাল-পরশুর চিন্তা নেই। সামনের আকাশ মাঠের মত ফসখোলসা বুকখানায় শুধু ভরা-ভরন্ত খুশি। এমন নির্ভাবনা ভোরের স্বাদ কখনো পায় নি মদন।

চলছে তো চলছেই। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

কোথায় যাবে কে অত ঠিকানা করে। কোথায় পৌছবে, কে অত খোঁজ রাখে। চলতে হবে, তাই চলছে।

অনেক পথ পড়ে রইল পেছনে। সূর্যটা উঠলেন এতক্ষণে। ওনার ঘুম ভাঙল।

বিদ্যাধরীর কাঁধে ঝোলান ডুবকি, একতারা। কুমির পেট কোমরের আঁচলে বাঁধা সাতখানা টাকা। মুকুন্দর থলে থেকে এসেছে ওর আঁচলে। কুমি বিদ্যার হাতখানা চেপে ধরে চলেছে।

বিদ্যাধরী গুনগুনিয়ে উঠল। হাওয়া উঠল কণ্ঠে। আওয়াজ উঠল বাইরের বাতাসে।

গুরু গো সুজন নাইয়া।
ভবপারে লও আমারে বাইয়া।
আমি ত' জানি না সাতাব।
অগো আম... মাইরো না চুবাইয়া।

মদন আগে আগে চলে। ওর কানের পাশ দিয়ে শনশনে বাতাসের বেগে সুরটা অনেক নরম ক্ষীণ হয়ে কানে লাগে। মনটা কেমন টনটন করে, ওর বুকের হাওয়ায় ঢেউ লাগে। বিদ্যার গানের সঙ্গে সঙ্গে ও সুর দেয়। অ গুরু গো—ও-ও—

ডান দিকে খুব উঁচু ভিটের ওপর মস্ত টিনের ঘর। ছোট টিনের বাড়ি দু'খানা।

ঝকঝকে তকতকে। সামনে কুয়োয় জল তুলছে দুটো সেপাই। সেপাই দুটো বদনা ফেলে ওদের দিকে তাকায়। ইসারায় কাছে ডাকে। এটা একটা থানা। থানার সিপাই ডাকে কেন? কুমি বিন্তার হাত ধরে টানে। সিপাই দেখলে বড় ভয় লাগে। চৌকিদারকে ও যমের মত ভয় করে। দেবতার মত খাতির করে। এরা চৌকিদারের ওপরে, জলজ্যান্ত সিপাই।

বিন্তা কুমির হাতটা ধরে টানতে টানতে এগোয়।

একজন সিপাইয়ের মুখে চাপ দাড়ি। বলে,—বঁয় এয়ানে। আর একখানা গান শুনা।

সিপাইয়ের হুকুম। কুয়োর ধার ঘেঁসে বসে পড়ে ওরা। মদন মাথা থেকে বোঝা নামায়। পা-দুখানা একটু জিরোল এতক্ষণে। এত হাঁটা অভ্যাস নেই মদনের। তবু হাঁটতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল না।

একতারার বং বং আওয়াজ ওঠে।

অ মন চোরা তুই তল্পী সামাল রাখলি নি।
অ তর চারিধারে ছয়ডা চোরে করে রে বুলবুলানি।

বলিহারী। সিপাই বাবাজীর মুখে রসের হাসির ছোঁয়া লাগে। বাইর‍্যা আওয়াজ তুলছে খেপী। কুমির চোখ দুটো জল জল করে ওঠে। মদন পোঁ ধরে। সুরদেয়—অ মন চোরা তুই তল্পী সামাল রাখলি নি। অ চোরা মনরে আমার।

বঙা বং বঙা বং—তারের আওয়াজ তাল ঠোকে।

অ তুই চোরে চাইপ্যা ধর, ঘরের বাইর কর।
থানায় আইন্যা ধরাইয়া দে', ভয় সে বুঝি ক্যাদ্‌রানী।
অ মন চোরা তুই তল্পী সামাল রাখলি নি

কালা মদন জুড়ি ধরে—ও চোরা মনরে আমার—বঙা বং—বঙা বং—বঙা বং—

বিন্তা খেপী কয়, কথা মিথ্যা নয়।
ভাবের চুরি বন্দ হইলে রসেরি উদয়।
ও তুই রসিক পুলিশ পাহারা রাইখ্যা, খাবি রসের জলপানি।
অ মন চোরা তুই তল্পী সামাল রাখলি নি।

অ চোরা মনরে আমার—বঙা বং—বঙা বং—

বাহারের গান গাইল খেপী। মদন জুড়ি ধরে আরও যেন মিঠে করে তুলেছে হাওয়া। সিপাই দুজন দুলতে দুলতে শুনছে। ভোরের হাওয়া জমজমাট ঢেউয়ের বাহার তুলেছে।

—তরা যাবি কোয়ানে?

মদন জবাব করে,—দোয়াইল—কালাকান্দির কাছে। কোন পথে যাওন ভাল হইব বাবু?

দাড়িওলা সিপাই বলে,—অই যে ত্যাখস বটগাছ, হ ওয়ানে গিয়া ডাইন মুরা চইল্যা যা। নদীর পাড় দিয়া যাইতে যাইতে কালাকান্দির সড়ক পৌঁছাবি।

বিদ্যাধরী একমুখ হাসি নিয়ে বলে,—তোমাগো কুয়ায় হাত মুখ ধুইয়া লমু নাকি কও বাবু?

সিপাইরা সম্মতি দেয়।—হ, হ, রইস জল তুইল্যা দেই।

দড়ি-বালতি নামিয়ে জল তুলে দিল সিপাই, ওরা হাত-মুখ-চোখ ধুয়ে নিল। কুমির মুখ ধুতে দু'দণ্ড দেরি হয়। ও বেশ ঘসে-মেজে মুখ ধোয়। কুলকুচো করে। দাঁত ঘসে মাটি দিয়ে। হাতের কনুই পর্যন্ত, পায়ের হাঁটু পর্যন্ত পরিষ্কার করে ধোয়। খানিকটা জল ঢক ঢক করে খেয়ে নেয়।

বড় আরামী আয়েসী শরীর কুমির।

আবার পেঁটরা বোঁচকা মাথায় তোলে মদন।

পথে নেমে মদন খুক খুক করে হাসে। খেপীর খুশির ছোঁয়া লেগেছে ওর বুকে। দড়িদড়ায় বাঁধন নেই, আলগা খুশির ছোঁয়া।

—গানখান বড় জবর গাইছ! পদ বানাইছ তুমি?

বিদ্যার হাসন লেগেই আছে।—যা মন নিল। আওয়াজে ভুরভুরাইয়া দিল্যাম।

মনে যা এসেছে, শব্দে সুরে তাই বার করে দিয়েছে! তাজ্জব কারখানা! এখুনি বানিয়ে ফেলেছে গানখানা! মদন তাকায় বিদ্যার দিকে। সত্যি বিদ্যার পরিচয় যত পাচ্ছে, ততই যেন বিদ্যার টানে ও নরম হয়ে যাচ্ছে! বড় গুণীন মাইয়া! গুণের সীমা নাই। হাসির খুশির সীমা নাই। প্রাণটা নিয়ে মুঠোয় মুঠোয় বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মদনের চোখে অবাক হাসি।

কুমি তাকায় মদনের দিকে। কালো ঘন জোড়া ভুরু কুঁচকে ওঠে। মদনের অবাক মিঠে দৃষ্টিটা তখনো বিদ্যাধরীর মুখের ওপব। মাথার বোঝাটা বুঝি বা পড়ে যায়। কুমি হাত বাড়ায় বোঝার দিকে।

—বুচকিগুলান পইড়্যা যাইব।

বলে হেসে বলে,—আমাগো হইব কলা। তোমার সোন্দর বাক্সখান ভাইঙ্গা খানখান অইব।

মদন মাথার টাল সামলায়। কোন কথা বলে না।

ঠাণ্ডা জলে চোখ-মুখ ধুয়ে বেশ আরাম লাগে। বাতাস তেমনি বইছে হু-হু করে,

কিন্তু তেমন ঠাণ্ডা। সূর্যি উঠেছেন এক মানুষ সমান ওপরে। আকাশের রঙ মুছে শাদা করে তুলছেন। তবু রোদটা তখনও নরম। বাতাসে রোদে মিলে-মিশে লাগে ভাল। সূর্যি যত গরম হবেন, তত গরম হবেন পবন দেবতা। বাতাসে আগুনের হল্কা ছুটবে। পিকিতির মিল, হতেই হবে। কেউ কাউকে শিখায় না, যে যার মত পিকিতির নিয়মে কর্ম করে—বলেছিল খেপী। কাল বলেছিল, অর্জুনগাছের তলায় নিঝুম রাত্তিরে।

মদন আর কথা বলে না। ভেতরে কেমন একটা আনন্দ ওকে ভরে তোলে। চলছে ওরা।

চলছে তো চলছেই। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

বটগাছের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। থামল মদন। বিদ্যা কুমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

—কোন মুড়া যাইবার কইল, ডাইন না বাও ?

সিপাইটা বলে দিয়েছিল বটগাছের কাছে গিয়ে পথ পাবে। সেই পথে নদীর ধারে চলে যেতে হবে। পাড় ধরে চলে যেতে যেতে কালাকান্দির ঘাট। তারপর আর কি ? কালাকান্দি আর দোয়ালী। এ ঘর আর ও ঘর।

—কোন মুড়া যাইবার কইল ?

কুমি আর বিদ্যা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

মদন হাসে। থেমে পড়ে।—কও দেহি কোন মুড়া যামু ?

সড়কটা চলে গেছে সোজা নাক বরাবর। কোথায় কে জানে। এই বটগাছের সীমানার দু'পাশে সড়ক থেকে নেমে গেছে দুটো হাঁটা রাস্তা। একটা পূবে, একটা পশ্চিমে।

কুমি ভয়ে ভয়ে তাকায় মদনের দিকে।—তুমিও ভুইল্যা গ্যালা ?

মদন মিটি মিটি হাসে।—পথ চিন না, আইল্যা কি কইর‍্যা ?

—মানুষের সাথে আইছিলাম।

—অখন যাওনের পথে একলা।

বিদ্যাধরী ফিক ফিক করে হাসে।—একলা কোন দুঃখে, তুমি রইছ।

বিদ্যাধরীর কথায় মদন ভারি খুশি। বিদ্যাধরী নির্ভর করতে জানে, কুমি জানে না। কুমি ভয় পায়। ভয় দেখায়।

—আমি যদি ভুলাইয়া লইয়া যাই ?

—ভুইল্যা ভুইল্যা যামু তোমার সাথে।

খাসা কথা বলে বিদ্যাধরী। মদন মনের সুখে এদিক-ওদিক তাকায়। বটগাছের

আগা থেকে এক দঙ্গল কাক কা কা করে উড়ে ঘুরপাক খেয়ে আবার এসে বটগাছের ওপরেই বসে। দুটো কুকুর ঝিমুচ্ছে বটগাছের মোটা শেকড়ের ওপর। চারদিকে ছড়ান ছেঁড়া কাঁথা, মাদুর চাটাই।

—এ জানি শ্মশান-মশান মনে লয়।

কুমি বিন্থার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। মদন সূর্য যেদিকে উঠেছে, সেদিকে একটু সময় তাকিয়ে একটু ভেবে বলে,—পুলিশ কইল ডাইনে যাওনের কথা, আমিও ভাইব্যা দেখলাম। নদী পচ্চিমে না, পূবে। পূবদিষ্টে চলো।

ডান দিকের রাস্তায় নেমে পড়ল ওরা। সরু পায়ে হাঁটা পথ। দু'পাশে আগাছার জঙ্গল। চোখের সামনে সূর্য। তাকান যায় না। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মুখের ওপরে রোদটা ক্রমেই চড়ছে। বেশ জ্বালা ধরছে। মদনের মাথায় বাক্স। কুমি মাথার ওপর ঘোমটা টেনেছে। বিন্থাধরীর মাথার ওপর গোঁপা।

—উঃ! গেছিরে, খাড়াও।

কুমির কথায় দাঁড়াল ওরা। বসে পড়েছে কুমি। পায়ের তলায় একটা কাঁটা ফুটেছে। পায়ের আঙুলের মত লম্বা। টেনে বার করল কুমি। রক্ত বেরোল একটু। তার ওপর খানিকটা ধুলো চাপড়া করে মাখিয়ে দিল। ব্যস। ওই ধুলোই ওষুধ। ধুলোমাটির বড় ওষুধ নেই। ধুলোমাটির অনেক গুণ। জলমাটির দেহখানা জলমাটিতেই থাকে ভাল। পেকে যদি ওঠে, লাগাবে গ্যাঁদা পাতার রস। ঘা সেরে যাবে দু'দিনে।

বিন্থা হাসে।—দুধে-মাখমের শরীল আমাগো কুমির।

মদনও হাসে কুমির মুখের দিকে তাকিয়ে। সত্যি কুমির মুখখানা এরি মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে। মুখের কালো চামড়া চিক চিক করছে ঘামে। চোখদুটোর দুটো কোণে লাল আভা।

খোঁচাটা সইতেই হয় কুমিকে। খোঁচাটা ও গর্বের কথা বলে মনে করে। দেহখানা ওর ভদ্দর-ভদ্দর। ঠাণ্ডা তাপে কষ্ট হয়। দেহের পরিপাটি তরুজুত না করলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মত নরম-সরম শরীর।

আবার হাঁটতে শুরু করে। দু'দিকে পাটের ক্ষেত। কাটা পাটের গোড়াগুলো শক্ত হয়ে রয়েছে রোদ মাটিতে। এখানে ধান রোয়া হয় নি কেন কে জানে। ওরা অত খপর রাখে না। নিজেদের জমি-জিরাত নেই। দিন আনা দিন খাওয়া। অত খপরে কি কাজ।

এদিকটার চাষ আবাদ ভাল নয়। কেন কে জানে! বোধ হয় নদীর জল উপচে এসে পড়ে এখানে? কে জানে!

দু'ধারে জঙ্গল আর আগাছা। জন-বসতি নেই বললেই চলে।

হাঁটছে তো হাঁটছে। পথ আর ফুরোয় না।

একটা ঘন জঙ্গলের পাশে এসে থমকে দাঁড়ায় ওরা। সামনে পড়েছে একটা নালা। তিরতির করে জল বইছে। বোধ হয় নদীর সঙ্গে যোগ আছে এ নালার। কত জল কে জানে! যদি ডুব জল হয়, তবে উপায় কি!

চারধারে তাকায়। না, কোথাও কোন নৌকো ডোঙা নেই যে লগি ঠেলে পার হয়ে যাবে। ভাল বিপদে পড়া গেল যা হোক। কি করা যায়? এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কি করবে, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। সামনে এমন একটা আঘাটা পড়বে কে জানত! ব্যাটা সেপাই তো কিছু বললও না।

বেলা বেড়েছে। রোদ চড়চড় করছে মাথার ওপর। এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কোন লাভ নেই।

বিদ্যাধরীর হাসি নেভে না।—ভালই হইল। সাতরাইয়া পার হমু।

কুমির মুখে বিরক্তি।—তর খ্যাপামী রাখ অখন। কাপড় নি ভিজ্যা যাইব।

—ভালই অইব। চান হইয়া যাইব।

—তুই থামলি নি। রঙ্গ-রসের আর সময় পাইলিন্যা?

মদন মিটিমিটি হাসে। বিদ্যা আর কুমিকে যতই দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে ও। দু'জনের ভেতরে আশমান জমিন তফাৎ, অথচ দু'জন দু'জনের কত কাছে। কেউ কাউকে না হলে থাকতে পারে না, অথচ কেউ কারো কথা মেনে নিতে পারে না। একজন আনন্দে ভরপুর, খুশি খেয়ালে চলে। আর একজন প্রতিটি পা ফেলে সতর্ক চোখে, ভীষণ সাবধানে।

খেপী খেপেই রয়েছে, কুমি খ্যাপামীর ভয়ে তটস্থ।

মদন মধ্যস্থ হয়।—তোমরা খাড়াও এয়ানে। আমি আগে নামি।

কাপড়টা হাঁটুর ওপরে তুলে নিল মদন। আস্তে আস্তে নামল স্রোতের জলে।

বিদ্যা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কুমির কাঁকালে একটা ঠ্যালা দিয়ে বলল,—আবার নি আছাড় খায়!

মেলায় যাবার সময় অন্যপথের এক খাল পার হতে গিয়ে পিছলে জলে পড়েছিল মদন। সেদিনও খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল বিদ্যা। ওর পা টিপে টিপে জলে নামা দেখে মনে পড়ে গেল কথাটা।

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে মদন। না, ডুব জল নয়। হাঁটুর সামান্য ওপরে জল উঠল মাঝ বরাবর। মদন ওপারে চলে গেল। ফিরে দাঁড়াল। বিদ্যা আর কুমি নামুক এবার।

বিন্তা নামল জলে, কুমি পেছন পেছন। এমন নালা খাল পার হওয়া ওদের অভ্যেস আছে। পা ফেলে ফেলে পার হয়ে এল বিন্তা। মাঝখানটায় গিয়ে কুমি ঘুপ করে পড়ল একটা গর্তে। একেবারে কোমর ছাড়িয়ে জল উঠল বুকের কাছাকাছি।

—ধরো, টাইন্যা ধরো আমারে।

মদন আবার নামল। কিছুটা এগিয়ে কুমির দিকে লম্বা হাতখানা বাড়াল। মদনের হাত ধরে ওপরে উঠে এল কুমি। শাড়িখানা পুরোপুরি ভিজে। মাথাটা ছাড়া গা হাত পা সব ভিজে।

বিন্তা হেসে কুটোকুটি। কুমি শাড়ির আঁচল নিংড়োতে নিংড়োতে রেগে তাকাল খেপীর দিকে।

—কি কুক্ষণে যে তর সাথে আইছিলাম!

মদন হাসতে লাগল। ভারি মজা লাগছে দু'জনকে নিয়ে। যেন জটিলা কুটিলা। খ্যাংরাকাঠির মত টুকটাক লেগেই রয়েছে দু'জনে। ঝগড়া হাসি, গান, গল্প, বেশ কাটছে সময়টা। যাত্রাদলে থাকতে ওর ঘুম ভাঙত এই এত বেলায়, তার পর মুড়ি চা খেয়ে সখীর নাচের মহড়া চলত ঘণ্টাখানেক। কে কত ভাল গেয়েছে, তাই নিয়ে চলত মন কষাকষি। খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে যেত। তার পর ঘুম। ঘুম থেকে উঠত রাত আটটা ন'টায়। আবার মুড়ি চা, কোথাও বা লেড়ো বিস্কুট। দশটা এগারোটায় গান শুরু হোত, ভাঙত শেষ রাত্তিরে। এসে শেষ রাতে হল্লা করে খেতে বসত। তারপর ঘুম। ঘুম থেকে উঠত আবার এই এত বেলায়। খাওয়ার টাইম বিকেল আর শেষ রাত। শোবার টাইম সন্ধ্যে আর সকাল। কি অদ্ভুত দিন কাটিয়েছে মদন ভুঁইয়া। আজ সব যেন অন্য রকম। সন্ধ্যের পর গানের তাড়া নেই। হিংসে-হিংসি বাদাবাদি নেই। কে ক'টাকা পুরস্কার পাবে, তাই নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। বুক ভরে শ্বাস নাও। মন খুলে হাস।

এরা দু'জনও তাই। বিন্তাধরী যে মুহূর্তটিতে বেঁচে আছে, সেই মুহূর্তে প্রাণভরে হাসে। কুমি হাসায়, ঝগড়া করে. ভয় পায়। কুমি পাশে না থাকলে খেপীকে বোধ হয় এমন করে চোখে পড়ত না। এমন অদ্ভুত মনে হোত না।

কুমি কি করে? জানে না মদন। নিশ্চয় কোন গয়লা বা পরামাণিকের মেয়ে। খায় দায় গাবিয়ে বেড়ায়। বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, বিধবা হয়েছে হয়তো। আবার একটা বিয়ে করলেই হলো। হয়তো তেমন পাত্তর জোটে না। কি দরকার মদনের অত খপরে? চলছ, চলো। চোখ মেলে দেখো চারিদিকে।

ওই তো উই দেখা যায় শাদা ধবধবে চাদরের মত নদীর জল আকাশ ছুঁয়ে

পড়ে আছে। রোদের ঝলসানিতে শাদা দেখাচ্ছে নদীখানা। যেন মস্ত একখানা দুধের সর।

—নদী আইয়া গেল।

—কই, কোনদিষ্টে ?

—অই—চাইয়া ছাখ, জিক্যাগাছের ডালের মধ্য দিয়া চাও। হ,' ওই।—

মস্ত একটা জিকাগাছ সামনে। আশে পাশে বুনো শ্যাওড়ার ঝোপ। জিকাগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে তাকাও সামনে। নাক বরাবর। বালি আর বালি। শাদা চিনির দানার মত বালি। বালির চড়া নেমে গেছে জলে। হু-হু করে জলছোঁয়া বাতাস এসে ঝাপটে পড়ছে নাকে-মুখে।

বিদ্যাধরী মস্ত চোখদুখানা মেলে তাকিয়েছে। হায়রে হায়, পরাণটা যেন কেমন কেমন করে ওঠে। আকাশছোঁয়া নদী, চোখের দৃষ্টি উধাও। চোখ মেলে তাকাও। চোখখানা ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। কোথাও থামবে না।

নদীর পাড়ে এসে চোখ আর ফেরে না। নদীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলো। কোথায় কে জানে। যাচ্ছে তো যাচ্ছে। চলছে তো চলছে। এমনি করে চলতে চলতে যদি পড়ো গিয়ে সাগরে-সমুদ্দুরে। তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি ? সব একাকার। বিদ্যাধরী তাকায় আর ফিক ফিক হাসে।

—উঃ! মইল্যাম!

ককিয়ে উঠল কুমি। কি হোল কুমির ? তাকাল ওর দিকে মদন।

—পায়ের তলা জ্বইল্যা গ্যাল। বালুর মধ্যে চুলার আগুন ধরেছে।

তা বটে। কথা মিথ্যে নয়। বাতাস জলে ছোঁয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, কিন্তু পায়ের তলার বালি যেন উনুনের আগুনের মত। বড় বড় চিনির দানার মত বালি যেন আগুনের ফুলকি।

—গ্যালামরে মইল্যাম।

বিদ্যাধরী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

—হাসন দেইখ্যা গাও জ্বলে। তর পায়ে ত' চাম নাই, খড়মের নাগাল ঠক্কর ঠক্কর কইর‍্যা চলস !

কুমির রাগ দেখে মদন হেসে ফেলে।

মিষ্টি করে বলে,—এটু সইয়া লও। অই ঘাটলা ছাখা যায়। ওয়ানে বইয়া জিরামু।

সামনে বেশ খানিকটা দূরে বিরাট পাঁচ-ছটা বটগাছ পাকুড়গাছ। ওখানে ছায়ায় ছায়ায় বালির পাড়টা ঢালু হয়ে জলে নেমেছে। কিছু মানুষ ছেলে-পিলে দেখা

যাচ্ছে। চান করছে। ঝাঁপাচ্ছে। উঁচু পাড় দিয়ে চলতে চলতে দূর থেকে খুব ছোট দেখাচ্ছে ঘাটের মানুষগুলো। বাচ্চাগুলো মনে হচ্ছে যেন ছোট ছোট শুশুক। ডুব দিয়ে ভেসে উঠছে। কিছুক্ষণ বা সাঁতরাচ্ছে। কতক্ষণ এমন ঝাঁপাঝাঁপি করবে ওরা? যতক্ষণ না ওদের দিদি কিম্বা মা এসে ওঠবার জন্যে হাঁক পাড়বে। এই চনচনে রোদে জল থেকে আর উঠতে চায় কে? ওরা যখন উঠবে, পেটে তখন আগুন, কোনমতে গা-মাথা মুছে মাটির দাওয়ায় বসে যাবে খেতে। লাল মোটা চালের ভাত, ডাল আর কুমড়ো বটি। তখন যেন স্বর্গের সুধা।

মদনেরও এমন দিন গেছে। ওদের দেশের পাশ দিয়ে ছোট নদী বয়ে গেছে। অনেকে বলে নদী নয়। নদী থেকে বেরিয়েছে একটা মস্ত নালা। তা হোক তবু ওই সোনাশালী নদীতে যখন খাবলা খাবলা তেল মেখে ঝাঁপাত ওরা তখন যে কি সুখ পেত, সে সুখের স্বাদ জীবনে আর একবারও পেল না। তারপর ঘরে গিয়ে গপাগপ পুরো এক থালা ভাত খেয়ে আবার বেরোত একটি নড়ি নিয়ে কামরাঙা অথবা কাঁচা আমের খোঁজে। ট্যাঁকে থাকত একটা শিশি ভর্তি ঝাঁজ কাসুন্দী। কাসুন্দী দিয়ে গোটা আট-দশ কাঁচা আম খাওয়া হয়ে যেত বিকেলের ভেতর। নয়তো শ খানেক জাম।

মদন তাকায় দূরে ওই ছেলেগুলোর দিকে। গোটা দশ-বারো ছেলে কিলবিল করছে জলে। যেন ওরা জলেরই পোকা। নদীর পাড়ে যাদের ঘর তাদের ঘরের পোলাপানদের জলের সঙ্গে জন্ম থেকে সম্পর্ক। তবে ভয় একটা আছে যদি ভাঙন ধরে। ওরা পাড় দিয়ে চলেছিল। জলের ওপর খাড়া দু' মানুষ উঁচু পাড়। এক-একটা জায়গায় স্পষ্ট দেখা যায় ভাঙনের রেখা। অনেকটা পাড় জুড়ে ধনুকের মত চিড় খেয়েছে, তলায় দু'মানুষ নিচে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ, তলা থেকে মাটি খসিয়ে নিচ্ছে, ধুয়ে দিচ্ছে। পাড়ের তলায় অনেকটা খেয়ে গেলে ঝপাং করে পড়বে পাড়ের একটা ধ্বস। জলে ধীরে ধীরে যাবে বালিমাটির মস্ত চাঁই। আবার ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ, আবার তলা থেকে খেতে খেতে এগোবে। কত গাছ-গাছালি ঘর বাড়ি যে নদীর গর্ভে যায়।

ওরা ঘাটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। সূর্যি উঠেছেন মাথার চাঁদির ওপরে। মাথার টিনের স্যুটকেশটা যেন কামার বাড়ির লোহার মত তেতে উঠেছে। হনহন করে এগোচ্ছে ওরা। কুমি সব সময়ই কিছুটা পেছনে পড়ছে। পড়ুক। পথ কিছু ঘোরাল আঁকাবাঁকা নয়, যত পিছেই পড়ুক, ঠিক আসবে।

ঘাটে এসে পৌছল মদন আর বিদ্যাধরী!

এদিক-ওদিক দেখে বটগাছের সবচেয়ে মোটা শেকড়টার ওপর বসল—মাথার বোঝা নামিয়ে। বিদ্যাধরী একতারা নামাল, আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল।

এখানে পাড় উঁচু নয়। পাড় কেটে মাঝখানে মাটি ঢালু করে দেয়া হয়েছে জল অব্দি। জল থেকে ওঠা-নামায় ঘাটটা কাদায় পিছল। একটা ছেলে উঠতে গিয়ে দু'বার আছাড় খেল। গোটা তিনেক ন্যাংটো বাচ্চা এসে ঘিরে দাঁড়াল ওদের। বৌ দুটি চান করে গায়ে গামছা জড়িয়ে উঠছিল। মদনকে দেখে ঘোমটা টেনে দিল।

ঘোমটার ভেতর থেকে আড়চোখে দেখল বিদ্যাধরীকে। ওর মাথার ওপর খোঁপা আর একতারাটা পরিচয় দিচ্ছে।

বৌ-দুটি বাঁ হাতে ঘোমটা ফাঁক করে দুজন ফিস ফিস করে কথা বলল। তারপর বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটা দিল। কি বলল কে জানে! এমন তো কত মানুষই কত কথা বলে। ও সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না বিদ্যাধরী।

কুমি প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে পাশে বসল—গেছি রে, মরছি রে, আর আমি হাটবার পারুম না।

মদন হাসল। বিদ্যা মদনের দিকে তাকিয়ে বলল,—এই ঘাটলায় চান করা নি যায়?

—যাইব না ক্যান? করো।

বিদ্যাধরী বোঁচকার কাছে গেল। টিনের স্যুটকেশের ওপর থেকে বোঁচকা নামাল, খুলল। ধীরে-সুস্থে বসে আস্তে আস্তে কাপড় নামাল। চিরুণী ও ছোট আয়না।

কুমির মুখটা উজ্জ্বল হোল। যাক্ এখানে তবে একটু জিরিয়ে সাতিয়ে নেয়া যাবে। খেপীর ভাবসাবে মনে হচ্ছে, এখান থেকে এখুনি উঠবে না। বাঁচা গেল।

এই ঘাটেই আপাতত নোঙর করল ওরা।

॥ ছয় ॥

আপন-পর তো মনগড়া ফারাক। নইলে কে-ই বা আপন, কে-ই বা পর। এ শুধু কথার কথা নয়। বিদ্যাধরী জানে। তাই মানুষ দেখে। আর ফিক ফিক করে হাসে। ওর হাসন দেখে কুমি বিরক্ত হয়। খেপী যেন বানের জল। যেখানে সেঁদোয় একেবারে মিশে যায়। ঘাটে এসে বসেছে আর ক' দণ্ড? এরই ভেতরে খেপীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে পোলাপানের দঙ্গল। পেছনে গুটিচারেক অল্পবয়েসী বৌ। সেই বৌ দু'টিও ফিরে এসেছে। পাছাপাড় তাঁতের খাট শাড়ি পরণে। একটা বৌয়ের কোলে একটা বাচ্চা।

খেপীর দিকে এগিয়ে এল বৌটি। মদনকে দেখে লজ্জা। মদন একটা হাই তুলে পেছন ফিরে বসল। ট্যাঁক থেকে বার করল দেশলাই। দেশলাইয়ের ভেতর থেকে একটা আধখানা পোড়া সিগারেট। সিগা[illegible] ধরিয়ে মুঠোয় নিয়ে আরাম করে টানতে লাগল। বিদ্যাধরীর কাছে বেশ ভিড় [illegible]

বৌটি এগিয়ে এল কোলের ছেলে[illegible] ছেলেটা ইঁদুরের বাচ্চার মত ছোট। লালচে চামড়ার নিচে শুধু হাড় ক'খানা। মাথাটা বড় আর চোখ দুটো।

—এট্টু ঝাড়ফুক কইব্যা গ্যাও গুণিন বিবি।

বিদ্যাধরী নিশ্চয় গুণিন। ঝাড়ফুক জানে। জলপড়া, তেলপড়া জানে। বাউল-বাউলীরা ফকির দরবেশরা এ সব মন্তর তন্তর না জেনে কি পারে? ধরেছে বৌটি খেপীকে। আঁতুড় থেকে ছেলেটাকে কিসে যেন পেয়েছে।

বিদ্যাধরী ফিক ফিক করে হাসে।

পাশের আব একটি বৌ বলে,—তহনি কইল্যাম আবেদের বৌবে। যাইস না ভর সন্ধ্যাকালে চালতাতলায়!

এরা মসুলমান গেবস্ত। চাষী তাতে সন্দেহ নেই। দেখেই বুঝতে পেরেছে কুমি। বিদ্যাধরী হাসে।

—হাওয়া বাতাস লাগছে।

সেই বয়স্কা বৌটি ছোট বৌটির মস্ত মস্ত ভীতু চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে,—ভয় নাই লো। গুণিন বিবি একখান ফু দিলে ভাল হইয়া যাইব।

বিদ্যাধরী যে কিছু জানে না তা নয়। ওরা ধরেছে ঠিক। এ সব ঝাড়ফুঁক ওদের জানতে হয়। পাঁচ দুয়ারে .ন গেয়ে বেড়াতে বেড়াতে কার ছেলেকে পেত্নী পেল। কার মেয়েটার জ্বর আর ছাড়ে না। কার বৌয়ের পাঁচটা পেটে এসে পাঁচটাই নষ্ট হয়ে গেল। এ সবের একটু-আধটু বিহিত ওদের করতে হয়। বাঁজা বৌয়েব ছেলে হয়। পেটরোগা মেয়েটা ধীরে ধীরে ভাল হয়ে ওঠে। এমন হামেশাই হয়। বিদ্যাধরী নিজেও জানে না কি করে হয়। বাবার কাছ থেকে দুটি মাত্র মন্তর শিখেছিল। সেইটেই স্থানে-অস্থানে আওড়ায়। কোথাও বা লাগে, কোথাও লাগে না।

—একবাটি ত্যাল লইয়া আইস

বড় বৌটি দুড়দুড় করে চলে যায়। অদৃশ্য হয়ে যায় বাঁশঝাড়ের ওপারে। কিছুক্ষণ পরে নিয়ে আসে একবাটি তেল। সরষের তেল। বিদ্যাধরীর সামনে তেলের বাটিটা রেখে ছোট বৌকে ধমক দেয়—ল, বইয়া পড়। বিবির সুমকে বইয়া পড়।

ছোট বৌটা যেন বোবা। বড় বড় ভীতু দুটো চোখ। মুখখানি ময়লা তেলে চকচকে। বিদ্যার সামনে মাটিতে ছেলে কোলে নিয়ে বসে পড়ে। ঠিক দুপুরে বট:

গাছতলায় মজলিস বসে গেছে। বেশ ভিড় জমেছে। আরও পাঁচ ঘরের বৌ মেয়ে কাচ্চা-বাচ্চা [illegible] হাজির। দুটো বুড়ি এসেও হাজির। পীরের দোয়াই, ছেলেটা যদি ভাল হয়। আবেদ আলীর এই প্রথম [illegible]। প্রথমটা মইল্লা হলে এরপর ওর কোল মইল্লা হয়ে যাবে। একটাও বাঁচবে [illegible] কোলে। হাওয়াটা লেগেছে কোলে। তেনার নজর রয়েছে বৌয়ের কোলের [illegible] চালতেতলায় ভর সন্ধ্যেবেলা তেনার নজর পড়েছে। তেনারা চালতেগাছ শ্যাওড়াগাছ-টাছেই বাস করেন কি না! ওসব স্থানে বৌ-ঝিদের সাবধানে চলা-ফেরা করতে হয়। বুড়ি একজন আক্ষেপ করছিল। তার কথা তো আজকালকার বৌরা শোনে না। ত্যাখ এখন, বোঝ মজাটা! তবু গুণিন বিবি এয়েছেন, তার দয়ায় যদি তেনাব নজর ঘুরে আবার চালতেগাছের ডগায় উঠে যায়।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোর চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। থমথমে ভয় আব কৌতুকে। গুণিন বিবি কি দেখতে পাচ্ছে ভূতটাকে? নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে। নইলে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হ'সছে কেন?

—অই গ্যাদাবা হইর‍্যা যা।

সরে যা বাচ্চাবা—বুড়ি ধমকে উঠল। কে জানে হাওয়াটা আবার ঘুরে-ফিবে কার ওপর ভর করে।

বিদ্যাধবী বিড় বিড় করছে আর ফুঁ দিচ্ছে। বাচ্চাটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফুঁ দিচ্ছে। বার সাতেক ফুঁ দিয়ে তেলের বাটিটা তুলে নিয়ে আঁচলেব তলায় ঢাকল। আঁচলের তলায় হাত ঘুরিয়ে ঘুবিয়ে আবাব বিড় বিড় করতে লাগল চোখ বুজে অনেকটা সময়।

এতগুলো মানুষেব মুখে রা নেই। মদনও মুখটা একটু ফিরিয়ে অবাক হয়ে দেখছে। সিগারেটটা হাতের আঙুলের ফাঁকে পুড়ে গেল অনেকটা। বাচ্চা ক্যাঁ' ক্যাঁ করে চিৎকার করে উঠল।

এই হয়েছে! তেনাদের নজরে বিষ হেনেছে। এইবার বোধ হয় তেনারা আবেদ আলীর বৌয়েব কোল ছাড়বেন। হাওয়ায় হাওয়ায় চালতেতলার দিকে যাবেন। বুড়িরা এসব জানে। লোল চামড়ার ভেতরে চোখ দুটো জ্বলজ্বলিয়ে উঠল বুড়ি দুটোর। বিদ্যাধরী হাসল এবার। হাসল যখন তখন নিশ্চয় কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

বড় বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বলল বিদ্যা।—এই ত্যাল দিলাম। বিয়ানে বাসিমুখে কাপড় ছাইড়া এই ত্যাল মাখাইবা। ব্যস্ রোজ বিয়ানে একবার। তিনদিনে হাড় জিরজিরা শরীল ত্যালত্যালা অইব। যে ডুক ত্যাল পইড়া থাকব, তারমধ্যে আরও ত্যাল মিশাইয়া লইও। রোজ মাখাইও। লও।

বড় বৌয়ের হাতে তেলের বাটিটা দিয়ে বিদ্যা ছেলেটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল—ভাল অইব। ডর কইরো না। ভাল অইব। সোনার পোলা সোনা অইয়া কোল জুইড়া থাকব। ডর নাই।

আবেদ আলীর বৌয়ের শুকনো [illegible] চোখ দুটোয় ভরসা এল। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব দেখা গেল।

ছেলে-মেয়েগুলো হৈ-হৈ করতে করতে দৌড়োদৌড়ি শুরু করল।

বড় বৌ দীনভাবে বিদ্যার দিকে তাকিয়ে বলল,—কি বা দিমু তোমারে। হুড়ুম আর গুড় দেই। খাইব্যান নি ?

বিদ্যা হাসল। হাসা মানেই সম্মতি।

বৌরা চলে গেল। ঘর থেকে নিয়ে এল প্রায় আধ-ধামা মুড়ি এক খাবলা গুড়! ছোট বৌ নিয়ে এল দু' কুনকে চাল, গোটা পাঁচেক শশা, একটা ছোট লাউ।

কুমি এতক্ষণ ব্যাজার বদনে দেখছিল। খেপীর যত ভুটকোয়ারা। গুণতুক জানে খেপী, তাই বলে পথে-ঘাটে আঘাটে এমন রব তুলবে এটা তার পছন্দ হচ্ছিল না। বিশেষ করে বোগদা মদনটা হাঁ হয়ে গেছে খেপীব ভুটকোয়ারা দেখে। আধ-ধামা মুড়ি আব তার ওপব শক্ত এক খাবলা গুড় দেখে কুমির চোখ দুটো চিকচিকিয়ে উঠল।

—হুড়ুম এয়ানে আন। হ' ঢাল কোঁচড়ে।

কোঁচড় পেতেছে কুমি মুড়ি নেবার জন্যে। খেপীর কাপড়ে অতবড় আঁচল নেই। খাট কাপড়ে ধামড়ধস্তি দেহখানা ঢেকে কূল পায় না। ও কি করে কোঁচড়ে নেবে এত মুড়ি ?

—দ্যাও। ঢাইল্যা দাও।

কুমির কোঁচড়ে মুড়ি ঢেলে দিল। লাউ আর শশা ক'টা রাখল সামনে। কিন্তু চাল ?

—খাড়াও, ত্যানা বাইর কইর‍্যা লই।

বিদ্যার বোঁচকাটা খোলা ছিল। তার ভেতর থেকে বার করল ছেঁড়া কাপড়। চাল ক'টা বেঁধে পুঁটলীতে রাখল আবার। বিদ্যাধরী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। ওর অন্যদিকে কোন খেয়াল ছিল না। এটা করতে হয়। ওর বাবা বলেছিল, যার রোগ ভাল করবার জন্যে ওষুধ দিবি—পরে দু'দণ্ড তার কথাটাই ভাববি। তার ব্যামো ভাল হোক, ব্যামো সেরে গেলে তার চেহারাটা কেমন হবে, মনে মনে ভাববার চেষ্টা করবি। সাবধান, একমনে ভাববি। মনে যেন একটু টালমাটাল হয় না। মনকে যদি ছুঁচের ডগায় এনে ভাবতে পারিস তার নীরোগ দেহ, তবে নীরোগ সে হবেই। এইটেই এ মন্তরের আসল রহস্য।

বিদ্যাধরী চাইছে ছেলেটা ভাল হোক। আহা রে চামচিকের মত জিরজিরে ছেলেটাকে [illegible]য় মায়ের কি জ্বালা! ভাল হোক। ওই জিরজিরে দেহে মাংস হোক। টান টান হোক চামড়া, তেলতেলা হোক [illegible]।

—গুণিন বিবি, ঘর কোয়ানে [illegible]

উত্তর দেয় কুমি।—দোয়াইল [illegible] নি জান, কোন্ পথে যামু?

এক বুড়ি বলে,—ইয়ার পরে যে ঘাট পাইবান, কালাকান্দির ঘাট। ওয়ানে গ্যালে খপর মিলব। ছোটকালে কালাকান্দির হাটে যাইত্যাম—।

বুড়ির ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। তখন কি নদী এখানে ছিল? আরও অনেক তফাতে ছিল। ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে এসেছে। চোখের সামনে কত মাটি ভেঙে জল হয়ে গেল। তখন ওদের বাড়িও এখানে ছিল। বলতে গেলে এখন যেখানে মাঝনদী সেখানে ছিল তাদের ঘর। ওর বাপ আফছা মিঞা মনের মত করে বাহারের ঘর বানিয়েছিল। টিনের চাল, কাঠের পাটাতন, মস্ত মস্ত ঘর। বাগানখানা ছিল আরও সখের। আম জাম লিচু কাঁঠাল কামরাঙা বেতুল কি ছিল না? সে সব দিন যেন স্বপ্ন হয়ে গেছে। তবু যেন মনে হয় এই সেদিনের কথা।

পাঁচটা না ছ'টা পাঁঠা নিয়ে হাটে গিয়েছিল বুড়ি বাবার সঙ্গে। এক-একটা পাঁঠার দাম দশ পয়সা বারো পয়সা। আফছা মিঞা সে হাটে বেচেছিল ষোল পয়সা করে এক-একটা পাঁঠা। কাল কুচকুচে নধর পাঁচটা পাঁঠা। বুড়ি তখন ছ' বছরের মেয়ে। পাছাপাড় তাঁতের শাড়ি পরে বাবার সঙ্গে গিয়েছিল। কারণ ছিল, পাঁঠা ক'টাকে পুষেছিল বুড়ি। কচি থেকে ঘাস আমপাতা কচি কাঁঠালপাতা খাইয়ে খাইয়ে বড় করে তুলেছিল। সেই পাঁঠা হাটে বেচতে নেবার সময় সে হাটে যাবার বায়না ধরেছিল। হাটে তার সেই প্রথম যাওয়া।

সে সব কতকালের কথা! পাঁঠা ক'টা নিয়ে দরদস্তুর যখন হচ্ছিল, তখনো ওর বেশ মজাই লাগছিল। কেনবার পর যখন পাঁঠা ক'টাকে নিয়ে চলে গেল, তখন ওর কান্না দেখে কে! নাকের নোলক ভিজে গেল। মুখ-চোখ ভিজে ফুলে একাকার। আফছা মিঞা অনেক বুঝিয়ে-বাঝিয়ে শেষ পর্যন্ত দুটো গালার চুড়ি কিনে দিতে তবে ওর কান্না থামে। সেই পাঁঠার শোক অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারে নি বুড়ি, আর কালাকান্দির হাটও ভুলতে পারে নি।

বুড়ি কুমিকে বলে, আক্ষেপ করে, সেসব কতকালের কথা।—তহন এক গুণিন বিবি আছিল কালাকান্দির খালের ধারে—হ', উদুরি বাদুরি যক্ষা যে ব্যামোই হউক, জলপড়া খাওয়াইয়া সারাইয়া দিছে। তার বাপ আছিল মের্দা ফকির। সজলের উপ্রে তার থান। অমুন গুণিন আর দেহি নাই।

কুমি শুনল, মদন শুনল, পুরোন কথা, সুখ-দুঃখের কথা।

আস্তে আস্তে চলে গেল ওরা সবাই। প্রাণের ছোঁয়া রেখে গেল ওদের প্রাণে। আপন-পরের ফারাক নাই। সবাই আপন। পরাণটা যদি মেলে ধরো, যেখানে যাও পরাণের ঠাণ্ডা ছোঁয়া পাবে।

সত্যি, এতক্ষণে ওরা যেন ঠাণ্ডা হোল। গুটিকতক প্রাণের খোলামেলা ছোঁয়ায় ওরা এই ভীষণ গরমেও তাজা হয়ে উঠল। কুমি বেশ খুশি খুশি।

স্নান করে নিল মদন আর বিদ্যাধরী। গায়ের কাপড় গায়েই শুকোবে। কতক্ষণই বা। দু'দণ্ড রোদের তাপে খড়মড়িয়ে উঠবে গায়ের কাপড়। ওরা বসল এসে বটতলায় আবার।

মুড়ি গুড় আর কচি শশা। বড় উপাদেয় খাওয়া। মচমচিয়ে খেতে খেতে রোদের তেজটা আরও বেড়ে গেল। তবু যেতে হবে। বেশি দেরি করার উপায় নেই। কালাকান্দির ঘাটে গিয়ে পৌছোতে পারলেই নিশ্চিন্তি।

পেট পুরে নদীর জল খেয়ে নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করল ওরা।

কুমি গামছাখানা জবজবে করে ভিজিয়ে নিয়ে মাথায় দিল। পায়ের তলায় যদি পোড়নি লাগে, ভিজে গামছায় পা মুছে নেবে। তবু যেতে হবে। আরও অনেকটা পথ যেতে হবে।

যত গরমই হোক না কেন বাতাসটা বড় ঠাণ্ডা। হু হু করে বইছে খোলা বাতাস জল ছুঁয়ে ঠাণ্ডা হয়ে।

ভোঁ শব্দে তাকাল ওরা। ইস্টিমার। বিরাট ইস্টিমার এগিয়ে চলেছে। এ ইস্টিমার রোজই যাতায়াত করে। যাবে গোয়ালন্দ ঘাট।

মদন বড় বড় করে তাকাল।—ভাইট্যাল জাহাজ।

যাবার সময় ভাটিয়াল। আবার বিকেলে যে ইস্টিমার যাবে সিরাজগঞ্জের দিকে, সেটা উজান। রোজই আসে উজান ভাটিয়ালের ইস্টিমার। যাত্রী বোঝাই মাল বোঝাই মাঝনদী দিয়ে চলেছে ইস্টিমার। তবু তার জল কাটা ঢেউ মস্ত বড় বড় হয়ে আছড়ে পড়ছে এসে পাড়ে।

—নাওখান বুঝি ডুইব্যা গ্যাল!

কুমি হাসতে হাসতে চোখ বড় বড় করে।

মস্ত ঢেউগুলোর ভেতরে পড়ে একখানা ছোট নাও নাগরদোলার মত উঁচু হয়ে নিচে নামছে, আবার উঁচুতে উঠছে। হাল যদি চেপে না ধরতে পারে নাও উল্টে যাবে। গেল বুঝি ডুবে! না ডুবল না! ডুবি-ডুবি করেও ডোবে না। টাল খেতে খেতে সামলে যায়।

বিদ্যাধরীর মুখখানা শিশুর মত সরল হাসিতে ভরে ওঠে। সামাল মাঝি। হ্যাঁ সামলে গিয়েছে। মাঝি যদি কুশলী হয়, তবে ঢেউ সামলাবেই। মনদরিয়ার ঢেউ সামাল দিতে হয়। বড় বড় জাহাজ মনদরিয়ার ওপর দিয়ে যখন ওপার যায়, তখন তো নাও ডুবু ডুবু। ভাবের জাহাজ ভাবের বেগে চলে মনদরিয়ায়। তার ঢেউ সামলাতে নাভিশ্বাস ওঠে। তবু মাঝি যদি পাকা হয়, তবে পচা নাওকেও হাল ধরে পার করে নিতে পারে। সেই সাঁই মাঝির খপর কেউ জানে না। সে হাল ধরে বসে আছে মনের দরিয়ায়।

বিদ্যাধরী হাসিতে উপছে পড়ে।

ইস্টিমার তো চলে গেছে কতক্ষণ হল। তবু যে ঢেউ তুলে দিয়ে গেল, সে ঢেউয়ের নাচন কমে না। পাকা মাঝি না হলেই নৌকো ডিগবাজী। ভাটিয়ালেরই এ-চোট, উজানের চোট আরও বেশী। উজানের ঢেউ আরও বড় আরও জবর। নাও সামলান দায়।

বিদ্যা মদনের দিকে তাকায়। মস্ত চোখ দুটোয় শিশুর কৌতুক।—ইস্টিমারে নি চড়ছ ?

—ক্যান চড়মু না।

মদন অনেকবার চড়েছে ইস্টিমারে। উজানে ভাটিয়ালে অনেকবার। যাত্রাদলের সঙ্গে বহুবার বহু জায়গায় গেছে। কোথাও নৌকোয়, কোথাও গরুর গাড়িতে, কোথাও ইস্টিমারে। এই তো গেল মাসে গিয়েছিল টাঙ্গাইলের কাছে। ও চত্বরে কাটিয়েছে দু মাসের ওপর। কুড়িটা বড় আসর। আরও গোটা পনেরো ছোট আসর।

তখন তো ইস্টিমারেই গিয়েছিল। সিরাজগঞ্জ ঘাটের আগেই পোড়াবাড়ি ঘাট। পোড়াবাড়ি ঘাটে নেমে যেতে হয় টাঙ্গাইল। নৌকোয় যাওয়াই সুবিধে।

পোড়াবাড়ি ঘাটে থামল যখন ইস্টিমার তখন বিকেল। রাতটা কাটাতে হয়েছিল ঘাটেই।

খেয়েছিল চিঁড়ে দই আর পোড়াবাড়ির বিখ্যাত চমচম। মনে আছে মদনের। বড় মজা লেগেছিল, তবু সে মজার ভেতরে ঢালাও খুশি ছিল না। ভাবনা ছিল বড় আসরগুলোয় তার গান জমবে কিনা। দু-দশ বিশ টাকা পুরস্কার মিলবে কি না। মিলেছিল, টাঙ্গাইলের বাবুদের বাড়ির আসরে পুরো একখানা পাঁচ টাকার নোট মিলেছিল পুরস্কার। পালাটাও ছিল তার সবচেয়ে যে পালা ভাল লাগে, যে পালায় ও সবচেয়ে ভাল গায় সেইটা—নৌকাবিলাস। ও পালা গাইলেই জমে।

এক আনা দিব কড়ি,
পার কইর‍্যা দাও তাড়াতাড়ি।
বিলম্ব আর সহে না—আ—আ—আ

মদন জবাব দিয়েছিল মিষ্টি হেসে। এক আনায় হইব না। একা নায়ে হইব না—

ভাবতে ভাবতে মদনের মন উধাও টাঙ্গাইলের আসরে।

—আমার ইস্টিমারে চইড়ব্যার ইচ্ছা করে।

বিন্দার মস্ত চোখদু'টোয় শিশু-মেয়ের চাউনী।

—চড়ো নাই তুমি ?

—না।

—তোমারে লইয়া যামু ইস্টিমারে।

—কবে যাইবা ?

—যামু যামু—

যেন ছোট মেয়েকে ভোলায় মদন। যাবে সে একবার বিন্দাকে নিয়ে। ইস্টিমারে গোয়ালন্দ অথবা সিরাজগঞ্জ। কেন ? কেন কিছু নেই। এমনি যাবে। ইস্টিমারে চড়তে মজা লাগবে। তাই যাবে। কোন উদ্দেশ্য নয়। যাত্রাগানের উদ্দেশ্যে। বেচা-কেনার উদ্দেশ্যে। কোন উদ্দেশ্যে গেলে তেমন মজা হয় না। এমনিই যাবে। শুধু শুধু যাবে। কবে যাবে। তা কি এখনি বলা যায় ? যখন খুশি হবে, মন চাইবে, তখন যাবে।

বিন্দা তাতেই খুশি। মদন বলেছে, তাকে নিয়ে ইস্টিমারে যাবে। সে আর তার কালা মদন।

কুমি কিছুটা পিছিয়ে ছিল। এগিয়ে এল ওদের কথাবার্তা হচ্ছে আন্দাজ করে।

বিন্দা ততক্ষণে দুলতে দুলতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। বিন্দা হাঁটে বেশ জোরে। মদনের চেয়েও জোরে। মাঝে মাঝেই এগিয়ে পড়ে। নদীর জলে নাও দেখে বা একটা শুশুক দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে কখনো কখনো।

কুমি মদনের নাগাল পায়। মদনের কাছাকাছি এসে বলে,—খেপী কইল্ গুণতুক জানে!

মদন তাকিয়েছিল বাঁ দিকে ধু-ধু বালির চড়ার দিকে। বালির ওপর রোদের ঝিলিক। কোথাও একটু গাছ-গাছালি শেকড়-বাকড় নেই। গনগনে আগুনের মত গরম বালির ওপর রোদ্দুরের চমকানি। চোখ ঝলসে যায়।

কুমি মিটিমিটি হাসে।—তোমারেও নি, গুণ কইরল

আলগা জবাব দেয় মদন।—হইবার পারে।

জবাব কুমির মনের মত তো হয়ই না, কুমি বোঝে যে ও কুমির কথা ভাল করে শুনছেও না। রক্তিম চোখ দু'খানাও তেরছা হয়, বিদ্যা চলেছে আগে আগে হনহনিয়ে। তেরছা চোখে তাকায় তার দিকে।

কথাটা কিন্তু কুমি কিছু বানিয়ে বলে নি। বিশ্বাস করে বলেই বলেছে। খেপী গুণতুক জানে, এটা ওর স্থির বিশ্বাস। নইলে নাটা জুড়ানের মত সাই জোয়ান একটা মরদকে বান মেরে রক্তবমি করিয়ে দিলে! একদিনে শেষ করে দিলে। নাটা জুড়ান কি মদনের চেয়ে কম ছিল কিছু!

মদনকে যে কেমন করে খেপী পাকড়াও করে নিয়ে চলেছে, ভেবে পাচ্ছে না কুমি। যাত্রাদল-টল ছেড়ে এক-কথায় খেপীর সঙ্গে চলেছে। ব্যাপারখানা কি খুব সহজ! দেখে মনে হয় মন্তর পড়া একটা সাপের মত মদন যেন খেপীর টানে পিছন পিছন চলেছে। মদনের সেই সন্ধ্যার মেজাজ আর আজকের মেজাজ আকাশ-পাতাল তফাৎ। খেপীর দিকে তাকায় যেন পোষা একটা কুত্তার মত। বলিহারী খেপীর যাদুবিদ্যা!—

মদন কি বুঝতেও পারছে না যে তাকে মন্তর পড়ে ভেড়া বানিয়ে নিয়ে চলেছে!

কুমি তো পারে না কোন মানুষকে এমন বশে আনতে, যা খুশি তাই করাতে। কই মুকুন্দ কি এল দোকান ফেলে তার পেছন পেছন? এল না, আসবেও না। কেউই আসে না। কেউই এমন খেপে ওঠে না তার জন্যে! খেপী নিশ্চয় মন্তর-তন্তর দিয়ে বশ করে। নইলে কিছুর ভেতর কিছু নয়, ভোরে এসে সে দেখল অর্জুন-গাছের তলায় মদন বাক্স নিয়ে তৈরী, খেপীও তৈরী। ওরা মেলা ছেড়ে চলে যাবে। কুমি তো অবাক! এর ভেতরে কি এমন কারখানা ঘটে গেল যে এত ভোরে মেলা ছেড়ে যেতে হবে। আর মদনই বা যাবে কেন?

বিদ্যা ফিক করে হেসে ওর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলেছিল।—ফান্দে আইজ মানুষ ধরা পইড়ছে। ধইর‍্যা ঘরে লইয়া যামু। কালা মদন যাইব আমাগো সাথে।

কুমি আঁতকে উঠেছিল। অমন জোয়ান জলজ্যান্ত মানুষটাকে ধরে নিয়ে যাবে খেপী! মদনকে দেখেছিল। আনমনা, চুল রুখু, চোখ-মুখ কেমন ফ্যাকাশে। যেন মন্তরের বাঁধনে নুয়ে পড়েছে। অবাক হয়েছিল কুমি। মনে মনে মদনের জন্যে মনটা কেমন লাগছিল। আহা রে, যাত্রাদলে ছিল ভাল। খেপীর কবলে পড়ে এখন চোপর দিন রোদে বৃষ্টিতে একতারায় টুং টাং করবে। আর ঘুরে বেড়াবে আওয়াজ তুলে। জীবন যৌবনে আর যেন কর্ম নেই।

সত্যিই মদন চলল। বিদ্যাধরী যেন ওকে মন্তরের টানে টাননে টানতে নিয়ে

চলল। কিসের টানে চলেছে মদন একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়। সকাল থেকে কোন কথাই জিজ্ঞেস করা হয় নি। খেপীর পাল্লায় পড়ে তার নিজেরই নাজেহাল হবার দশা। মেজাজটা তিরিক্ষি হয়েই ছিল।

এখন পেটে কিছু পড়েছে। রোদ গরমটাও সয়ে আসছে। একবার জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?

চলতে চলতে মদনের আরও কাছে সরে এল। মদনের কালো মিশমিশে মস্ত পিঠখানা বেয়ে ঘাম ঝরছে। এগিয়ে চলেছে। চলেছে তো চলেছেই। খেপীর বাতাস লেগেছে ওর গায়ে।

ওপরে সূর্যির তাত, নিচে বালির তাত, তাবি মধ্যে মিষ্টি করে বলে কুমি—আমাগো সাথে তুমি যাইত্যাছ কনে?

মদন তাকাল। এ আবার কেমন প্রশ্ন এত সময় পরে।

বলে,—তোমাগো গাওঘরে।

—মরণদশা! ওয়ানে কি গাওনার দল বানাইবা?

—জানি না।

—থাকবা কোন চুলায়?

—জানি না।

হাসিও পায়, দুঃখুও হয়। মন্তরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে গেছে মানুষটা। হেসে ফেলে কুমি।—তুমি জান না। জানে কেডা? হাইস্যা মইল্যাম কথা শুইন্যা।

মদন খেপীর দিকে তাকিয়ে বলল,—ও জানে।

—কপাল আমার! অ ৎ.ইডা নিজের খপর নিজে জানে না। নিজের নাই চালচুলা। ও লইব তোমার খপব।

মদন তাকাল।

—অ তোমারে গুণ কইর‍্যা ফালাইছে!

হেসে ফেলে মদন।—হইবার পারে।

বলে সামনের তরমুজ খেতেব দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—তরমুজগুলো অখনি বেশ বড় হইয়া উঠছে। ইরে আলায়। ৺৺ তরমুজ!

সামনে বিরাট বালু ভরা মাঠে মস্ত তবমুজ খেত। বালির ওপর অগুন্তি তরমুজ। তবমুজের লতায় তরমুজে প্রায় ছেয়ে গেছে সামনের মাঠখানা। কি অবাক কারখানা! কিছুক্ষণ ধরে ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছিল ওর। ভাবছিল কোথাও থেমে নদীর পাড় থেকে নেমে খানিকটা জল খেয়ে নেবে। তবু নামাটা খুব সহজ নয় বলে নেমে পড়ে নি। দু' মানুষ উঁচু নদীর পাড়। সেখান থেকে লাফিয়ে নামতে গেলে জলে পড়তে হবে, আর

কে জানে কোথাও ঘূর্ণীটুর্নী আছে কিনা। জলে পড়ে এক বিপদ বাধবে কিনা! এ ছাড়া আরও মুস্কিল উঠে আসা। লাফিয়ে নামা যায়। কিন্তু উঠে আসা সহজ নয়। মাটি আঁকড়ে ধরে উঠে আসা প্রায় অসম্ভব। যেখানে ধরতে যাবে, হাতের বালিমাটি ধসে পড়বে, চাই কি একটু মাটির চাঁইও ধসে পড়তে পারে। তাই বুকের তেষ্টা বুকে নিয়েই পথ চলছিল মদন। এখন চোখের সামনে তরমুজ খেত দেখে ও থেমে পড়ল।

বেশ বড় বড় তরমুজ। তাকাল এধারে ওধারে। হ্যাঁ—সামান্য দূরে বাঁশের খুঁটি দিয়ে উঁচু করে বাঁধা একটা ছোট চালা। ওখানে নিশ্চয় পাহারাদার আছে। কোন শব্দ পেলে সন্দেহ হলেই ফোকর দিয়ে দেখবে। লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। তবু একটা তরমুজ যদি বোঁটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে আসতে পারে তবে মন্দ কি।

মদন কুমির দিকে তাকাল। মিষ্টি-মিষ্টি হাসল,—এট্টা ছিড়া নি আনক যায়?

—ক্যান যাইব না। রইসো। আমি আনুম।

বলে সামনের দিকে তাকিয়ে একটা হাঁক দিল,—অলো অ খেপী!

বিদ্যাধরী হাঁক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু একটা হাঁকেই সর্বনাশ হয়ে গেল।

খেতের একপ্রান্তে সেই উঁচু চালাঘরটার ঝাঁপ নড়ে উঠল। একটা দাড়িওলা মুখ দেখা গেল।

মদন বিরক্ত হোলো।—এককু চিক্খারে স্যাড়ে খড়ে আগুন দিয়্যা দিলা। উই দ্যাখ—

কুমিও দেখল সেই দাড়িওলা মুখ। সতৃষ্ণ নয়নে তরমুজগুলোর দিকে তাকাল। বালির ওপর ঢ্যাপের মত গোল তরমুজগুলো পড়ে রয়েছে, অথচ আর একটাও নেবার উপায় নেই।

মদন শুকনো ঠোঁট চাটল জিভে। এমন ফলারটা মাটি করে দিলে কুমি। আর উপায় কি! এবারে চলো, হাঁটো। কাঠের মত শুকনো গলা নিয়ে এই আগুনে দুপুরে হনহনিয়ে পা চালাও।

সূয্যি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে টাল খেয়েছেন। এইবারে দেখতে দেখতে তরতর করে নামতে থাকবেন পশ্চিমের মাঠের প্রান্তে। উনি নেমে পড়বার আগেই তাদের পৌছতে হবে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে হয়। বেশ জোর কদমে চলছে ওরা। কুমি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। পড়ুক। হারাবার ভয় নেই। চলতে চলতে ঠিকই দেখতে পাবে। নদীর এক একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হলেও, বাঁক ঘুরলেই চোখ পড়বে।

এবারের বাঁকটা ঘুরতেই চোখে পড়ল আর একটা ঘাট। এ ঘাটটা মস্ত। দু-চারখানা বিরাট গয়না নৌকো ছাড়া বিশ-পঁচিশখানা নৌকো রয়েছে ঘাটের এখানে

ওখানে ছড়িয়ে। এ নিশ্চয় কাল্যাকান্দির ঘাট। এতক্ষণে কালাকান্দির ঘাটে এসে পড়েছে ওরা, দোয়ালী আর বেশি দূরে নয়।

কালাকান্দি একটা মাঝারি রকমের গঞ্জ। পাটের ব্যাপারীরা এখানে বেশ জমজমাট হয়ে বসে আছে। বিরাট বিরাট গয়না নৌকোয় পাটের চালান যায় সিরাজগঞ্জে। ওটা আরও বড় গঞ্জ। ব্যাপার ব্যবসার মস্ত ঘাঁটি। সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয় পাট। সোনারূপোর মত ঝকঝকে পাটের বদলে গাদা গাদা সোনা-রূপোর লেনদেন হয়। ধান কলাই কুমড়ো পাঁঠার চালানও যায়। তবে পাটই এখানকার লেনদেনের মধ্যমণি।

ঘাটে এসে পৌছোল ওরা। এখানে ঘাটের পাড়ে তেমন ছায়াঘেরা গাছগাছালী নেই। ঘাটের বালুমাটিও যেন পায়ে পায়ে শক্ত হয়ে গেছে। লোকজনের চলাচল এখানে অনেক বেশি। গয়না নৌকোয় যখন মাল বোঝাই, তখন অনবরত মাল মাথায় করে চলাফেরা করতে হয়। ঘাটের ওপরে বিরাট চালা। টিনের শক্ত মজবুত চালা সব। মাল রাখবার ঘর।

বিন্দ্যা ঘাটের কোলাহল থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে দাঁড়াল।

কিছু পরে এসে পৌছোল মদন আর কুমি। মদন এসে দেখল বিন্দ্যাধরী জায়গাটা বেছেছে ভাল। এখানেই একটু জিরিয়ে নেয়া যাবে। একটা মস্ত পিঠে কুমড়োগাছের তলায় বসল ওরা। মাথার সুটকেশ পোঁটলা নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মদন। মদনের জোয়ান দেহখানাও সারাদিনের ধকলে কিছুটা ঘায়েল হয়েছে। মাথার চাঁদিটা ব্যথা হয়ে গেছে বাক্সের চাপে।

বিন্দ্যাধরীর মুখখানায় রক্ত জমে ঝক-ঝকে কাঁসার থালার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তবু হাসে বিন্দ্যাধরী।—ওর মুখের সব ক্লান্তি কালিমা হাসিতে ধুয়ে দিতে চায়।

—বেশি জিরান-সাতানের কাম নাই। অন্ধকার হওনের আগে ঘরে পৌছাইতে হইব।

তা বললে কি হয়? খেপীর কথা মানতে রাজী নয় কুমি।

—আমি দুই দণ্ড না জিরাইয়া যামু না।

মদন কোন কথা বলল না। একটু সময় পা ছড়িয়ে বসে থেকে ঘাটে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে খানিকটা জল খেয়ে ঠাণ্ডা হোল। কুমি আর উঠতেই চাইল না। বসে রইল অনেক সময়। রক্তবর্ণ চোখদুটো বার বার বুজে বড় বড় শ্বাস ফেলছিল, হালচাষের পর ক্লান্ত গাইয়ের মত।

একটা শশা বার করল বিন্দ্যাধরী আঁচল থেকে। আগের ঘাটে যে শশা ক'টা

দিয়েছিল, তার থেকে একটা বোধহয় ও রেখে দিয়েছিল। অথবা নিজের খাবার শশাটাই রেখে দিয়েছিল।

মদনের শ্রান্ত মুখের দিকে তাকাল বিদ্যাধরী। চোখদুটো ভরা মমতা।

—লও খাও।

খাবার নাম শুনেই পিট-পিট করে তাকাল কুমি। দেখল মদনকে একটা শশা দিল বিদ্যাধরী। আবার চোখ বুজল কুমি। কি একটু ভেবে নিয়ে চোখ তাকাল যখন, তখন শশাখানা মচমচিয়ে খেয়ে নিয়েছে।

—গঞ্জে নি রসগোল্লা পাওয়া যায়?

রসগোল্লার নাম শুনে অবাক হোল মদন। এ সব খাদ্য কালেভদ্রে মেলে ওদের। মিষ্টি বলতে গুড়, বাতাসা, নয়তো কদমা। কুমি রসগোল্লার নাম করছে কেন হঠাৎ।

আঁচলে ছিল ঝনঝনে সাতটা টাকা। একটা টাকা বার করে কুমি মদনের দিকে দিল।—লও, রসগোল্লা আন।

মদনের মুখখানা হাসি হাসি। দিনটা আজ কাটল ভাল। রসগোল্লার জলযোগটাও হবে তাহলে।

কুমি আধবোজা চোখে তাকাল একবার বিদ্যাধরীর দিকে। বাঁকা হাসল।

খেপী হেসে উঠল আনন্দে।—রস যে তর ধরে না লো কুমি।

কুমি কোন জবাব দেয় না। হাসে—হাসিটা বেশ বাঁকা।

মদন উঠে চলে যায় হালুইকরের দোকানের সন্ধানে।

কুমি চোখ বুজে থাকে একটু সময়। তারপর চোখের পাতা অল্প তুলে আস্তে বলে,—মানুষডারে লইয়া আইলি কি কামে?

বিদ্যাধরী হাসে।—সে খপরে তর কাম কি?

কুমি পুরোপুরি তাকায় এবার।—কাম আছে। গাওয়ের মানুষে কইব কি?

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে খেপী।—কইব। খেপী এউগ্‌গা মানুষ ধইর‍্যা আনছে।

—অরে বিয়া করবি?

—কোন দুঃখে। বিয়া করমু কোন দুঃখে!

—তয় মানুষে কইব কি?

—মানুষের কথা মানুষে জানে, আমার ভাবনের ঠ্যাকা কি?

কুমির গলা একটু ভিজে ভিজে হয়ে আসে।—শ্যাষে তুইও নষ্ট হইয়া যাবি খেপী?

বিদ্যাধরী বলে,—এউগ্‌গা ডালে দুইডা ফল থাকে। রোইদে পোড়ে, বিষ্টিতে

ভেজে, বাতাসে দোলে, এয়ার মধ্যে নষ্টা-নষ্টি কি পাইলি ? পাইক্লে পরে ফল দুইডা আপনে আপনেই ঝইরা পইড়া যায়। বুঝলি নি।

না, কুমি অত শত বোঝে না। একটা মর্দামানুষকে নিয়ে থাকবে, অথচ নষ্ট কথা রটবে না—এ কখনো হয় ? নষ্ট হওয়ার অনেক জ্বালা, সে যে কি যন্ত্রণা কুমি ছাড়া কেউ জানে না।

বিদ্যার জন্যে ওর কষ্ট হয়—ভাবটা মনে অনেকবার চেষ্টা করলেও আসলে কুমি বিদ্যাধরীর কাছে মদনের থাকাটা কোন মতেই সহ্য করতে পারছে না। নানা অজুহাতে ওর যে মদনকে নিয়ে ঘর করাটা নেহাৎই খারাপ—এইটেই বোঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কেন ? কুমির কি হিংসে হচ্ছে ? কিসের হিংসে ?

অতশত বোঝে না কুমি। মাঝে মাঝে খেপীর খ্যাপামী তার কাছে অসহ্য হয় বই কি! বিদ্যাধরীর নিটোল নিষ্পাপ দিনগুলোর খুশি ওব মনে একটা জ্বালা ধরায় বই কি ? কিন্তু তবু বিদ্যাধবী ওর একমাত্র সঙ্গিনী। ওর নিজেব সমাজ নেই। মানুষের কাছে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পাবার নেই। তাই কারো সঙ্গেই ও মিশতে চায় না। খেপী কিন্তু এগিয়ে এসে ভালোবাসে ওকে। খেপীরও সমাজ নেই, সংসার থেকেও নেই। মানুষের কাছে বিদ্যেধরী অঢেল ভালবাসা পায়—কুমির সঙ্গে এইটুকুই ওর তফাৎ, আর এইটেই কুমির জ্বালা।

তবু কুমি খেপীকে না ভালবেসে পারে না।

মদন খেপীর ঘরে যাবার পরও কি খেপী আর গাঁয়ের মানুষের ভালবাসা পাবে ?

যদি না পায়। এই ভাবনাটা কুমির অসহ্য লাগে।

বিদ্যাধরীকেও মানুষ ঘৃণা করবে। তাকে যেমন ঘৃণা করে ? ভাবতে সত্যি ভাল লাগে না। ঘৃণার যন্ত্রণা খেপী সহ্য করতে পারবে না। সে বড় অসহ্য। খেপীর নষ্ট হওয়া চলবে না। ও কিছুতেই খেপীকে নষ্ট হতে দেবে না। দরকার হলে মদনকে খেপীর কাছ থেকে সরিয়ে নেবে।

কথাটা খেপী অদ্ভুত বলল। দুটো ফল যদি একটা ডালেই থাকে। তাতে নষ্টা-নষ্টির কি আছে ? কোনমতেই কথাটা বুঝতে পারছে না। খেপীর অনেক কথাই ওর মাথায় ঢোকে না। এক ডালে দুটো ফল থাকা আর এক ঘরে দুটো মানুষ থাকা কি সমান হোল ? হাজার হোক বয়সে তো আর বুড়ি নয় বিদ্যাধরী।

—বাইরের মানুষডারে যদি এয়ানে পৈঠায় বসান যায়। তয় বাইর ভিতর এক হইয়্যা যায়। উয়ারে এয়ানে বসামু। তারপরে ও কোয়ানে গেল আর আইল, তা দিয়া আমার কি কাম।

নিজের বুকখানা দেখিয়ে বলে বিদ্যাধরী। বাইরের মানুষটাকে ওখানে বসাবে।

কি যে পাগলের মত বাজে বকে খেপী, বোঝবার উপায় নেই। কুমি ওর পাগলামীর কোন উত্তর দেয় না। তাকিয়ে থাকে ঘাটের দিকে বড় বড় গয়না নৌকোয় মাল সাজান হচ্ছে। ওদের ঠিক সামনে একটা নৌকোর ছইয়ের ভেতর বসে তামাক খাচ্ছে একটা মাঝি। তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। এ নৌকো নদী পার হব না। যে নদীর ওপার দেখা যায় না, সে নদী পার হওয়া এ নৌকোর কর্ম নয়। এ সব নৌকো ঘাট থেকে যাত্রী ধরে খাল নালা বেয়ে দুরে দুরে গাঁয়ে পৌছে দেয়।

মদন ফিরে এল। ওর হাতে কলাপাতায় মোড়া রসগোল্লা। রস পড়ছে টপটপ করে।

পাতাটা এনে কুমির হাতে দিয়ে হাতের রস জিভে চেটে নিয়ে বসল। ট্যাক থেকে একটা আধুলি বার করে কুমির হাতে দিল।—আষ্ট আনা লইয়া আইছি।

—কয়ডা ?

—দশ গণ্ডা।

—দশ গণ্ডা তো একাই খাওন যায়।

কুমির পছন্দ হয় নি এত কম রসগোল্লা আনা। দশ গণ্ডা না হলেও পাঁচ ছ'গণ্ডা রসগোল্লা সবাই খেতে পারে। সাত বছরের একটা মেয়েও চার গণ্ডা রসগোল্লা অনায়াসে টুপটুপ করে খেয়ে ফেলে।

দশ গণ্ডায় তিনটে বড় বড় মানুষ, ক'টা করে আর খাবে ? না। খাওয়াটা ত্যামন জুতের হোল না।

বড় কলাপাতাখানা বেশ কৌশলে ভাঁজ করে মুড়ে বেঁধে দিয়েছে। পাতাখানা খুলে ছিঁড়ে ভাগ করে নিল কুমি। চার গণ্ডা মদন। ওরা তিন গণ্ডা করে। খাওয়াটা মোটেই জুতের হোল না।

নদীর ঘাটে গিয়ে জল খেয়ে এবার শুরু হবে আবার চলা।

আর পথ বেশি নেই। সুয্যি পশ্চিমের গাছ-গাছালীর তলায় নেমে পড়বার আগেই ওরা পৌছোবে ঘরে। পথ আর বেশি নেই।

॥ সাত ॥

দোয়ালী গাঁওখানা এমন বড় কিছু নয়। মাত্র শ' তিনেক মানুষ গাঁয়ে। বিশ-বাইশ ঘর মুসলমান। পনেরো-বিশ ঘর হিন্দু। সব মিলিয়ে চল্লিশটা ঘর হবে হয়তো। এখানে বাবু যাঁরা, তাঁরা নাকি এক সময় ছিলেন খুব মস্ত জমিদার। অবশ্য এখানকার নয়। তাঁদের আদি বাড়ি কালাকান্দি। কালাকান্দিতে এখনো বাবুদের বিরাট বাড়ি আছে, তবে নদী থেকে সে বাড়ি আর বেশি দূরে নেই। হয়তো বছর পাঁচসাতের ভেতরেই সে বাড়ি নদীর গর্ভে যাবে। এখানে আছে সেই কালাকান্দির বাবুদেরই এক শরিক। বিশ পঁচিশ বছর আগে কালাকান্দি ছেড়ে এখানে এসে বাড়ি করেছিলেন। তখন তাঁদের দাপটে আর দাক্ষিণ্যে আরও বহু মানুষ এসেছিল এখানে। বাবুরা এলেই সঙ্গে আসবে ধোপা, নাপিত, জেলে, জোলা, পাইক, বরকন্দাজ আরও অনেকে। এসেছিলও তাই।

দীর্ঘ পঁচিশ বছরে দু' তিনটে মহামারীতে গাঁওয়ের অনেক মানুষ মরে গেছে। অনেক মানুষ চলে গেছে। এখনো বাবুরা আছেন। বদনচাঁদ সরকার এখন কর্তা। কিন্তু সরকারবাবুদের আগের সেই দাপটও নেই, দাক্ষিণ্যও নেই। নানা শরিকে ভাগ হয়ে এখন তাঁদের নিজেদের সংসারেই অনেক সময় অনটন আর অভাব বেড়ে ওঠে।

বাড়িটা পাকা, কিন্তু পুরোন হয়ে গিয়ে প্রায় জরাজীর্ণ। তাতেও আর কুলোয় না। আশেপাশে বড় বড় টিনের চালাঘরও করতে হয়েছে পাঁচ শরিকের স্থান কুলোনব জন্যে।

যদিও সামর্থ্য তাঁদের কমেছে। কিন্তু দাপট কমে নি। এখনো পাইক বরকন্দাজ আছে। তবে তারা পোষাক পরে থাকে না। শুধু পুণ্যাহের দিন জীর্ণ পুরোন পোষাক বার করে পেতলের চাকতি ছাই দিয়ে মেজে ঝকঝকে করে পরে। এখনো হাটে কোন চোর ধরা পড়লে বা কোন প্রজা কোন অসামাজিক কাজ করলে তাকে ধরে এনে পঁচিশ ঘা বেত অথবা তিরিশ ঘা জুতো মারা হয়। এখনো দুটো পুরোন বন্দুক ঘরে আছে। ছররা নিয়ে মাঝে মাঝে বদনচাঁদ সরকার বিলের ধারে পাখী শিকার করতে যান।

তাই এখনো গাঁয়ের একটা মর্যাদা আছে। পূজোপার্বণে গাঁও জমজমাট হয়ে ওঠে।

বদনচাঁদকে সবাই ভয় করে, শ্রদ্ধা করে।

কথাটা পেড়েছিল সেদিন দাউসা ব্যাপারী।—কি আর কমু কত্তা। জানেন নিচ্চয়। বকুলতলায় এউগ্‌গা খেপী থাকে। ওডা বড় অনাছিষ্টি কইরব্যার লইছে।

বদনচাঁদ বললেন,—কি কইরাছে হারামজাদী ?

—হে কথা বলনের না কত্তা। বাইর থিক্যা মানুষ ধইর‍্যা লইয়া আসে।

বদনচাঁদ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে রসেই বলেন,—আইনব্যার ছাও। তাতে তোমার পরাণ চড় চড় করে ক্যান ?

দাউসা ব্যাপারী লজ্জিত হয়।—আমার কিছু না কত্তা, কথাডা কানে আইল অপনেরে কইল্যাম।

—বুজজি। আমার প্রজা মাইয়ার উপুর ক্যান নজর ছাও। তোমারে কাইট্টা ক্যালামু কৈল।

ধমক খেয়ে দাউসা ব্যাপারী দু' চারটে ঢোক গিলে উঠে যায়।

বদনচাঁদ বুদ্ধিমান। ঠিকই ধরেছিলেন, দাউসা ব্যাপারীর নজর পড়েছে খেপীর ওপর। কালাকান্দির ব্যাপারী তার গাঁওয়ের মেয়ের ওপর নজর দেবে। এটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

হলে হবে কি, কথাটা নিয়ে সর্বত্রই কানাঘুষো চলছিল।

সেদিন হাটখোলায় দাশু শেখের দর্জির দোকানে মনছুর মিয়া কথাটা নিয়ে জোর আলোচনা করছিল।

—আলার নামডা য্যান কি ?

দাশু শেখ জামা সেলাই করতে করতে বলে,—মদন।

মনছুর হলদে দাঁত বার করে হাসে। গোঁপের দুটো চুল ঠোঁটের ওপর থেকে সরিয়ে বলে,—বাইল্লা রে, নামখানের বাহার আছে। এখান থিক্যা ওয়াকে তাড়ানের কাম। আলায় দিমু নাকি ওয়ার প্যাটে কোচ বসাইয়া !

মনছুর সরকার বাড়ির বরকন্দাজের কাজ করে।. কোচ, বর্শা, রামদা কারো পেটে গলায় বসিয়ে দিতে ওর জুড়ি নেই। এ তল্লাটে মনছুরকে ভয় করে সবাই। বদনচাঁদ সরকার কোন দুর্দান্ত প্রজাকে শায়েস্তা করতে হলে মনছুরকে পাঠায়। মদন এখানে এসেছে বলে মনছুরের রাগের কারণটা ঠিক বুঝতে না পারলেও দাশু শেখ জানে মনছুর বড় বদরাগী। চণ্ডালের মত রাগ।

সেলাইয়ের মেশিন থামিয়ে তাকায় মনছুরের দিকে।

তাড়াতাড়ি বলে,—না, না, হুজ্জুত কইর‍্যা কাম নাই। ওয়াকে সজুত করুম আমি। তা মনছুর ভাই, তোমার এত রাগ দেহি কি কানে ?

মনছুর সোজা কথা বলে,—ও আলার জন্তে ব্যাপারী বড় নাস্তানাবুদ অইছে। বাবু ব্যাপারীরে যা মন ল্পায় তাই কইছে। ওয়াকে আমি ছাড়ুম না।

—ব্যাপারী নি তোমারে ট্যাহা দিছে ?

দাগু শেখ চোখ টিপে হাসে।

—না। টাহা পইসার কথা না। ব্যাপারী অখন আমাগো পাঁচ গাঁয়ের মাথা। মানীগুণী মানুষ।

দাগু শেখ বলে,—ব্যাপারীরে কইও। খেপী কৈল গুণতুক জানে। ব্যাপারীরে বাণ মাইর‍্যা দিবার পারে !

—আলায়, রাখেন বাণবুন। ও হগল ভুটকোয়ারা আমাগো শুনাইও না খলিফা।

মনছুর একটা বিড়ি ধরায়।

খলিফা দাগু শেখ বুঝতে পারে। কালাকান্দির ব্যাপারী মনছুরকে নিশ্চয় টাকা পয়সা দিয়েছে আর মদনের বিরুদ্ধে নানা ঘটনা শুধু নয়, দরকার হলে তাকে মেরে ফেলবার ব্যবস্থাও করতে বলেছে। মনছুরকে বিশ্বাস নেই। কোন দিন অন্ধকার রাত্রে বিলের ধারে বিদেশী মানুষটার পেটে কোচ বসিয়ে দিতে পারে। তারপর বিলের পাঁকে পুঁতে ফেললে আর ধরে কে ?

কালাকান্দির ব্যাপারী বিদ্যাধরীকে ছাড়বে না বলেই মনে হচ্ছে। ব্যাপারী এখানে বিশেষ সম্মানী ব্যক্তি। বদনচাঁদ সরকারও তার ওপর খুশি নয়। কেন না পাটের চালানে কারবারে ব্যাপারী এখানে এখন সরকারবাবুদের চেয়েও অর্থবান। অসম্ভব পরিশ্রমী চতুর মানুষ দাউসা ব্যাপারী। গুণী মানী ব্যক্তি। একটু যা দোষ, ওই মেয়েমানুষ। কোন মেয়েমানুষ তার চোখে পড়লে তার আর রক্ষে নেই। যেমন করে হোক, তাকে বার করে আনবে। সরকারবাবুরা ওর এই দোষের কথা জানে। কিন্তু আটকাতে পারে না। বিশেষ কিছু করতে পারে না।

বিদ্যাধরীর সঙ্গে মদন ভুঁইয়া এখানে আসবার পর গাঁয়ে একটা রোল উঠেছে ঠিকই। কিন্তু সবচেয়ে উচাটন হয়েছে দাউসা ব্যাপারী। যেমন করে হোক বিদ্যাধরীকে তার বাগে আনতে হবে।

মনছুর বিড়ি টানতে টানতে বলে,—তুমি ওয়ারে সজুত করব্যা কি কইর‍্যা ?

দাগু শেখ আবার মেশিন চালায়।—করুম। যখন করুম, তখন দেইখো।

ওরা দেখে, পরমানন্দ হালুইকর, মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে হুঁকো হাতে নিয়ে দাগু শেখের ছাপরার দিকে আসছে। সন্ধ্যার পর খলিফার দোকানেই ওদের মজলিস জমে।

হাটখোলার প্রথম সারিতে প্রথমেই পরমানন্দর দোকান, তারপর খলিফার ছাপরা, তারপরে মশলাপাতি, চালডাল। সাবান তেলের গোটা তিনেক দোকান। তারপরে খানিকটা ফাঁকা মাঠ। মাঠ ছাড়িয়ে কিছু দূরে টিপির ওপর কয়েকটা ঘর। সেখানে রাখী মালের গুদাম।

হাটখোলা সন্ধ্যার পর নিঝুম হয়ে যায়। তিনটে চারটে ছাপরায় লণ্ঠন ঝোলে। টিমটিমে আলোয় অন্ধকারের ঘন গাঢ় আস্তরণটা আরও যেন বাড়িয়ে তোলে। কেনাবেচা সন্ধ্যার পরে বেশি কিছু হয় না। কখনো-সখনো বোতল নিয়ে কেউ কেউ কেরোসিন নিতে আসে। কেউ বা দু' চার পয়সা মশলাপাতি, কেউ বা হরিরলুটের জন্যে বাতাসা কদমা। অন্ধকার স্তব্ধ হাটখোলায় এই খলিফার দোকানটি তখন জমজমাট হয়। মাঝে মাঝে তাসের আড্ডা বসে। বেশি রাত্রে ভাঙ, গাঁজা, মদও চলে এখানে। অনেকে বলে, দাশু শেখ লুকিয়ে গাঁজা বিক্রি করে। ওইটেই নাকি ওর আসল ব্যবসা। দাশু শেখের চোখ দুটো সব সময় ঘুম-ঘুম। আধা বোজা। সব কথাতেই ওর হাসা অভ্যেস। কেউ গাঁজা বিক্রির অপবাদ দিচ্ছে ও ঘুম-ঘুম চোখে তাকায়। অল্প হেসে বলে,—নিব্যান নি দুই-চার আনা?

খলিফার দোকানের মজলিস বসে। গাঁয়ের যত রকমের কথা। যত বিত্তান্ত, সব ব্যাখ্যান করা হয় এখানে।

পরমা হালুইকর হুঁকোটা হাতে নিয়ে জমিয়ে বসল।

মিনিট খানেক যেতে না যেতেই পদ্মদিদি এসে ঢুকল, সঙ্গে মদন ভুঁইয়া।

পদ্মদিদি কোমর দোলাতে দোলাতে দোকানে ঢুকেই বলল,—অলো অ খলিফা!

পদ্মভূষণ ঘোষ—সবাই বলে পদ্মদিদি। দশ-বারোটা গাইগরু আছে, দুধ মাখন ঘি বেচাকেনা করে। লম্বা চেহারা, সামনের দাঁত দুটো উঁচু। ধুতিখানা পরে ধুতির কোঁচাটা খুলে মেয়েদের আঁচলের মত গায়ে জড়িয়ে নেয়। কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে চলে। মুখে কাপড় গুঁজে হাসে, চোখের ঠারেঠুরে যে কোন মেয়েকে হার মানায়।

পদ্মদিদি ঢুকল খলিফার দোকানে।—অলো অ খলিফা, আমার জামাখান আর কবে বানাবি, মইলে পরে চিতায় লইয়া জমাখান দিয়া আসিস।

ঘুম-ঘুম চোখে তাকায় দাশু শেখ। পদ্মদিদির কেন অনেক দাদার পিরান তার কাছে কমের পক্ষে ছ'মাস পড়ে থাকে। তাগাদা করতে এলে ওই ঘুম-ঘুম চোখ আর হাসি-হাসি মুখ। রেগে যদি চেঁচাও খলিফার গলার আওয়াজ আরও থেমে যাবে। গালাগাল যদি কর হাসি-হাসি মুখে তাকাবে যেন একটা তামাসার কথা বলা হচ্ছে।

—দিমু দিমু। মঙ্গলবার আইস দিমু অনে।

—রাখলো তর মঙ্গলবার। কত মঙ্গলবার গ্যালআইল। আ রাম রাম, একখান জামা বানাইতে দুই বচ্ছর!

কোমরটা বেঁকিয়ে গালে হাত রাখল পদ্মদিদি।

পরমা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছিল। মদনের দিকে তাকিয়ে পদ্মদিদিকে বলল,—ইনি কেডা?

—রইসো, আগে আমার জামার নিকাশ করি।

ঘুম-ঘুম চোখে তাকাল দাশু শেখ মদনের দিকে। আস্তে বলল,—আইসেন, বইসেন।

মদন ভেতরে ঢুকে বসল।

পরমা হুঁকোটা মুছে এগিয়ে দিল মদনের দিকে।—লন, তামুক খান।

মদন নাকটা টেনে হুঁকোটা নিল।

মনছুর এতক্ষণ মদনের দিকে তাকিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিটা কড়া করে বলল,—আপনেরে য্যান নতুন মনে লয়।

পদ্মদিদি চোখ ঘুরিয়ে গালে হাত রাখে।—অ লো আমার লো, কয়েন কি মনছুর মিয়া। মদনরে চিনেন না? পুরা এউগ্‌গা মাস হইয়া গেল। মদন এয়ানে আইছিল। সে কি আইজের কথা। কবে বান কইব্যান আমারেও চিনেন না। কপাল আমার!

পদ্মদিদি আঁচলের খুঁটটা মুখে গুঁজে খুক খুক করে হাসে।

মনছুর হাসে না। বলে,—কোয়ানে আইছেন?

এবার পদ্মদিদি বললে,—অ লো, খেপীর ঘরে আইছে। কিষ্টযাত্রার কিষ্ট আছিল। বড় সোন্দর গাওনা গায়। গায়েন মদন ভাই। এয়াগো একখান পদ শুনাইয়া ছান।

মদন হুঁকোয় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাসে।

মনছুর একটা বিড়ি ধরায়। বলে,—কথাড়া বুঝবার পারেন নাই পদ্মদি। এনার লগে বাউলীবিবির সম্পক্কডা কি? হেই অইল কথা।

—এডাও নি বুঝল না মিয়াভাই। তোমার লগে আমার সম্পক্ক কি? পরমার লগে খলিফার সম্পক্ক কি? মানুষের লগে মানুষের সম্পক্ক। ওরা আপনেই জন্মায়। ছাও গো মদন ভাই হুকাডা ছাও, দুইডা টান দেই।

পদ্মদিদি মদনের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে কলকের টিকে আঙুল দিয়ে উলটে পালটে ফুঁ দিয়ে হুঁকোয় টান মারে! পরমা মদনের দিকে তাকায়।—বাবুগো বাড়ি গেছিল্যান এয়ার মধ্যে?

—না যাই নাই।

মদন ঠোঁট মোছে। অপরিচিত মনুষদের দিকে তাকায়।

—যাওন উচিত ছিল কি কও শ্যাখ?

দাশু শেখ সেলাই করতে করতেই বলে—হ।

পরমা একটা হাই তোলে। মনছুরের দিকে দেখিয়ে বলে—মিয়াভাই বাবুগো বাড়ির বরকন্দাজ।

মনছুর বিড়িটা টেনে টান টান হয়ে বসে।

খলিফা দাশু শেখ বলে,—আপনের গাওনা শুননের ইচ্ছা আছিল।

মদন অল্প হাসে। আস্তে বলে,—শুনামু।

—কাইল আইসেন।

পদ্মদিদি হুঁকো নামায় মুখ থেকে। —মদনভাই একখান পিরান বানাইব। কাইল আইসা কাপড় কিন্যা দিয়া যাইব। বুঝলা নি খলিফা।

—হ।

—বানাইয়া দিবা কবে তক?

—দশ বারোডা দিন লাগব।

—আহা লো, কি কথা শুনাইলা? পরাণ ঠাণ্ডা অইল। আমার পিরান্ বানাইতে দিছি চাইর মাস হইয়া গ্যাল। অখনো কাপড়খানে কাঞ্চি পর্শ করো নাই। তুমি বানাইবা দশদিনে। মরণ আমার!

দাশু শেখ ঘুম-ঘুম চোখে তাকাল। মুখখানায় অমায়িক হাসি।

হুঁকোটা রেখে উঠল পদ্মদিদি।—লও যাই। কাম আছে।

পদ্মদিদি আর মদন উঠে দোকান থেকে বেরোল।

মদনকে খলিফার দোকান চিনিয়ে দিতে এসেছিল পদ্মদিদি। বিদ্যাধরী পদ্মদিদির সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কাল আবার হাটখোলায় আসবে। কাল হাটবার। জামার কাপড় কিনে খলিফার দোকানে মাপ দিয়ে যাবে। তারপর তাগাদা করতে হবে কিছুদিন। খলিফাদের যে তাগাদা না করলে কাজ হয় না, এটা সবাই জানে।

মদন মাঠে গেলে পদ্মদিদিকে বলল,—আপনের পিরান দিব কবে?

—আই মইলে।

কোমর দুলিয়ে চলতে চলতে রাগে ফেটে পড়ে পদ্মদিদি।—আই, আই, ওয়ার কথা আর কওনের না। তুমি কিন্তু ওয়ার ভরসায় বইস্যা থাইক না। ঘাড়ে পাড়া দিয়া আদায় কইর‍্যা লইও।

মদন হাসে। ভয়ে ভয়ে হাসে। কেন না হাসলে পদ্মদিদির গোঁসা হয়। তার

ধারণা ওকে দেখে সবাই হাসে। অথচ নিজে ও মানতে রাজী নয় যে হাসাবার মত কিছু ও করে। কোমর দুলিয়ে না চলে ও পারে না। আঁচলখানা গায়ে না তুললে কেমন উদলা উদলা মনে হয়। পদ্মদিদির মেয়েলী ভাব-সাব পদ্মদিদির কাছে স্বাভাবিক। সে এতে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পায় না। বরং তার এই ভাব-সাবের জন্যে গাঁয়ের মেয়েমর্দা সকলের কাছে তার অবারিত দ্বার। দই বেচতে গিয়ে বাড়ির ভেতর অধিকারী গিন্নির প্রথম মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ক'খানা শাড়ি দিয়েছে পূজোয় এ খবরও যেমন জানে, তেমনি বটকেষ্ট তার বৌকে ধরে ঠ্যাঙায় বলে তার সঙ্গে ঝগড়া করে আসতেও জানে। মেয়েরাও হাসে। পুরুষরাও হাসে। অথচ পদ্মদিদি যেন এ গ্রামের খবরের কাগজ, যে খবর চাও পদ্মদিদির কাছে পাবে। প্রতিটি পরিবারের নাড়ীনক্ষত্র তার জানা।

বিদ্যাধরীকে পদ্মদিদি বড় ভালবাসে। মেয়েটা বড় সহজ সরল অথচ খাঁটি, ভেজাল নেই। পদ্মদিদি নিজেও যেমন দই দুধ ঘিয়ে ভেজাল দেয় না। মানুষের ভেতর ভেজাল পছন্দ করে না।

কাঁধে বাঁক নিয়ে দুই দুধ বাড়ি বাড়ি বেচে ফেরবার পথে বকুলতলায় ওই ছাপরাটার ধারে গিয়ে মাঝে মাঝেই দাঁড়ায় পদ্মদিদি। বেলা তখন স্বর্গে। দুপুর। হাঁক দেয় পদ্মদিদি,—অলো অ খেপীদিদি, ঘরে আছে নি ?

বিদ্যাধরী তখন হয়তো কাঁঠালের বীচি পুড়িয়ে নিচ্ছিল উনুনে। ছোট পাকঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

—লও, ভাণ্ড লইয়া আইস।

বিদ্যা একটা কলাইয়ের বাটি নিয়ে আসে। পদ্মভূষণ ঘোষ ঘিয়ের চাঁছি, দুধের মাঠা, অথবা হাঁড়ি চাঁছা দই যা থাকে বাটিটায় দেয়। তারপর হাসে বলে—নতুন গান বাধা হইছে নি ? বিকালে আসুম অনে শুনুম।

বিদ্যাধরী নতুন কোন গান বাঁধলে পদ্মদিদিকে শোনাতেই হবে। বিদ্যার আওয়াজ শুনে পদ্মদিদি বড় খুশি হয়। বিদ্যাধরীকে স্নেহ করে ভালবাসে।

আজ বিকেলেও পদ্মদিদি ক্ষীর বেচে ফেরবার সময় বিদ্যাধরীকে খানিকটা ক্ষীর দিয়ে গিয়েছিল। উঠোনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল মদন। কিছু পাট নিয়ে দড়ি পাকাচ্ছিল।

বিদ্যা বললে—শুনছ দিদি, আমাগো ওনার পিরান ছিড়া গ্যাছে গা ?

পদ্মদিদি বলল—কেমুন কইর‍্যা ছিড়ল ?

খিল খিল করে হেসে ওঠে বিদ্যাধরী। সে কথা আর কওনের না। গ্যাছিলেন কাইল কুমির ঘরে। ফিরনের পথে পাউচাগো বলদডা শিং উচাইয়া ঘাই দিব্যার

আইছিল। উনি দৌড়াইব্যার গিয়া পড়লেন কান্দারের কাটায়। কড় কড় কইর‍্যা পিরান ছিড়্যা গ্যাল।

পদ্মদিদি কোঁচার আঁচল মুখে দিয়ে খুক খুক করে হেসে উঠল। —মরণ আমার।

বিদ্যা বললে—উনি খলিফার ঘর চিনেন না।

—কও কি! হাটখোলা চিনে না?

মদন কথাগুলো শুনছিল। মুখখানা গম্ভীর করে বসেছিল। কথাটা সত্যি। কিন্তু ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে কাঁটায় যদি জামা ছিঁড়েই গিয়ে থাকে, তাতে এত হাসির কি আছে? সেই থেকে বিদ্যাধরী মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে।

পদ্মদিদি বলল—আমি যামু খলিফার ঘরে। ওয়ারে আইসা লইয়া যামু অনে।

সেই কথাই রইল। ঠিক সন্ধ্যার মুখেই পদ্মভূষণ ঘোষ এল। তার কথার খেলাপ হয় না। মদনকে নিয়ে হাটখোলার খলিফার দোকানে গেল। কথাবার্তা সব বলে দিয়ে এল। কাল হাট থেকে কাপড় কিনে দিলেই কিন্তু সব কাজ হোল না। দাশু শেখের কাছ থেকে পিরান আদায় করা যার-তার কর্ম নয়। বিশ মাসে তার বছর। সাবধান করে দিল মদনকে—ঘাড়ে পাড়া দিয়া থাইক। তা নইলে ছ' মাসেও জামা বানান হবে না।

মাঠটা কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে বকুলতলার উঁচু পাড়ে উঠল। বিশাল একটা বকুলগাছ পাড়ের ওপর। তলায় পুকুর। পুকুরের একটা কোণে জমেছে হিঞ্চে আর কলমী শাক। খাবার যখন কিছু না থাকে, শুধু ভাত ক'টা রেঁধে বিদ্যাধরী চলে আসে বকুলতলার পুকুরে। কিছু হিঞ্চে আর কলমী তুলে নিয়ে যায়। তাই দিয়ে ভাত খাওয়া হয়।

বকুলগাছের নিচে জমাট অন্ধকার। ওইখানেই দাঁড়াল পদ্মদিদি, মদনের দিকে তাকাল।

হঠাৎ বলল—এউগ্‌গা কথা কমু?

—কয়েন।

—এয়ানে আইছ কি কামে?

—আমি আহি নাই। খেপী লইয়া আইল।

একটা নিশ্বাস ফেলে পদ্মদিদি বলল—তোমারে দিয়া খেপীর কি কাম?

মদন সহজভাবে বলল—আমি জানি না।

পদ্মদিদি গলা নামিয়ে বলল—তুমি জান বান না জান, ঘরে রতন থাকলে তার উপরে সগ্‌গলের কুদিষ্টি পড়ে। কথাখান বুইব্যা লও। সাবধানে চলাফিরা কইরো। এয়ানে মানষের জলুনী-পুড়ুনী বেশি। না আইলেই ভাল কইরতা। যাউক, আইছ যখন, সাবধান থাইক। রতন লইয়া ঘরে থাকলে চোর ডাকাইতের ভয় রাইখো।

মদন কথাগুলো খুব ভাল করে বুঝতে পারল না। এটুকু বোঝা গেল যে দুর্জন তার পেছনে লাগবে। তাই তাকে সাবধান করে দিচ্ছে পদ্মদিদি। রতনটি কে? খেপী? খেপীর জন্যেই কি তাকে সাবধানে থাকতে হবে? কারণটা কি? খেপীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি যে সাবধানে থাকবে। খেপীর মত খেপী থাকে, তার মত সে থাকে। যে কোনদিন সে এখান থেকে চলে যেতে পারে।

খেপী তার ঘরের বৌ নয়। অথবা বাইরের মেয়েমানুষও নয়। বাউল-বাউলী ওরা। সাধন-ভজন করে। গান গায়, ভিক্ষে করে। হাসে, খেলে, খায়-দায় আকাশের পাখীর মত উড়ে বেড়ায়। বিদ্যাধরী খাঁচার পাখী নয়। সে বিদ্যাধরীকে বাঁধবার কোন চেষ্টাই করে নি। সে জানে সে চেষ্টা বৃথা। আকাশে যে পাখী ওড়ে, তাকে কি হাত বাড়িয়ে ধরা যায়?

বিদ্যাধরীর সঙ্গে তাই কোন সম্পর্কই তার গড়ে ওঠে নি এখনো।

তার ঘরে রতন কোথায় দেখল পদ্মদিদি! রতন তার নয়। এ রতন পড়ে আছে মাঠে-ঘাটে। যে খুশি কুড়িয়ে নিক। তার কি আসে যায়। সে ঘরে বন্ধ করে রাখে নি।

—কথাডা আপনে ঠিক কইল্যান না।

পদ্মদিদি বকুলগাছের তলায় আরও ঘন অন্ধকারে মদনের কাছে এল—ক্যান?

সোজাসুজি বলল মদন—রতন আমি ঘরে বঁন্ধ কইর‍্যা রাখি নাই।

—তুমি নি হাসাইল্যা মদনভাই। তুমি রাখ বান না রাখ, খেপীদিদি তোমার কাছে বাঁধা পড়েছে।

—তার আমি কি জানি?

—তোমার জাননের কথা কই না। মানষে জানে। খেপীদিদিরে যারা চাইছিল, তারা দাফাইয়া মরত্যাছে। অগো, কথা আমি ভুল কই না। পরে বুঝব্যা।

পদ্মদিদি ঘুরল।—চললাম। ঘরে কাম আছে।

চলে গেল পদ্মদিদি।

বকুলতলার ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল মদন।

পদ্মভূষণ ঘোষ এখানকার বাসিন্দা। গয়লা৷ ৺ঃল দই দুধ বেচতে তার সব ঘরে যাতায়াত আছে।

ও দেখেছে, মানুষটা সকলের প্রিয়। ছেলে বুড়ো মেয়ে মর্দ সকলের সঙ্গে তার সমান খাতির। তার কথাটা খুব ফ্যালনা বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। একটু ভাবিত হোল মদন ভুঁইয়া।

এক মাস হোল এসেছে সে এখানে। মেলা থেকে খানিকটা ঝোঁকের বশে বিদ্যাধরীর সঙ্গে সে চলে এসেছিল। কিছু জানবার প্রয়োজন মনে করে নি। কোন খবরাখবর নেয়া দরকার মনে করে নি। যাত্রাদলের অধিকারীর কাছে ভীষণ অপমানিত হয়ে সে যখন ভাবছিল, যাত্রাদল তাকে ছেড়ে দিতে হবে। এ-দলে আর থাকা যাবে না। কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে যখন ঠিক করে উঠতে পারছিল না, সেই সময় বিদ্যাধরী তাকে বলে বসল, চলো আমার সঙ্গে।

ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা না পেয়ে সে তখন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাধরীর সঙ্গে চলে আসাটা ঠিক করে ফেলেছিল। শুধু যে একটা আশ্রয়ের জন্যে তাও ঠিক নয়। বিদ্যাধরীর কথায় গানে হাসিতে ও খোলা হাওয়ার মত একটা মুক্ত আমেজ পেয়েছিল। যাত্রাদলের হিংসেহিংসি দলাদলিতে ভেতরটায় যেন অনেক ময়লা অনেক যন্ত্রণা জমেছিল। বিদ্যাধরীর হাসির তোড়ে মাত্র একটু সময়ে সব যেন উড়ে গেল, খোলসা হয়ে গেল।

একটা অন্য স্বাদ পেল। সে স্বাদটা কি ও জানে না। ভাল লেগেছিল। শুধু ভাল লেগেছিল বললেই একমাত্র কিছু বলা যায়। এত কালের হাল চাষের বলদ যেন ছাড়া পেল সবুজ মাঠে আর আকাশে।

ঠিক ভাল করে নিজেও বুঝতে পারে না মদন, কেন ওর ভাল লেগেছিল, কি ওর ভাল লেগেছিল। ও কি বিদ্যাধরীর উদ্ধত যৌবনকে চেয়েছিল? না, এমন কথা কখনো মনে হয় নি। বিদ্যাধরীর সঙ্গে সংসার-ধর্ম করতে চেয়েছিল? মোটেই নয়। বাউল-বাউলীর আবার সংসার। ও কি জানত না যে বিদ্যাধরীকে সংসারের দড়িতে বাঁধা যাবে না। খুব জানত।

তবে কি চেয়েছিল মদন? কি যে চেয়েছিল ও পরিষ্কার বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয়, ভাল লেগেছিল। কি যে ভাল লেগেছিল সেটাও স্পষ্ট করে বোঝা যায়। বিদ্যাধরী কাছে বসে, তার দিকে তাকায়, হাসে, গান গায়, তার ভাল লাগে। আর কিছু সে চায় না। ও বেশ বুঝতে পারে ভাবনা-চিন্তার কতকগুলো দড়িদড়া আছে, যেগুলো জট পাকিয়ে যায়, টানাটানি করতে গেলেই যন্ত্রণা। বিদ্যাধরী যেন যাদু জানে। ওর কাছে বসলে সেই দড়িদড়াগুলো নিমেষে আলগা হয়ে যায়। মনে হয় যেন হাল্কা হয়ে পাখীর মত বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি। মদন ভুঁইয়া এই আশ্চর্য স্বাদটা পায়।

বিদ্যাধরীকে দেখা যেন আকাশ দেখা। বিদ্যাধরীর কথা গান যেন মাঠের খোলা হাওয়ার আওয়াজ। এমনি একটা অনুভূতি ওর মনে আসে। কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। কি চায়?

চাইবার আছে বা কি? চাওয়ার কথা মনেই আসে না। বিদ্যাধরী কিছু চায় না। ওর কাছে বসলে কিছু চাইতে ইচ্ছে হয় না। চাওয়ার কথা ভুল হয়ে যায়। সত্যি সত্যি মনে হয় চাইবার আছে কি? গান গাও নাচ, হাস-খেল, চাওয়া-চাওয়ি আবার কিসের!

না, আজ পর্যন্তও বিদ্যাধরীর কাছে সে কিছু চাইতে পারেনি। বিদ্যাধরীও তার কাছে কিছু চায় নি। এ কথাটা ও পরিষ্কার বুঝেছে। বিদ্যাধরীর চাইবার মত কোন প্রয়োজনই বোধ হয় নেই। কিছু দিতে পারে। কিন্তু মদন তার কাছ থেকে কিছু নেয় নি। আজ আছে কাল নেই। পথে দেখা আবার দু'দিন পরেই হয়তো কোথাও চলে যাবে সে। তাই চাওয়া-নেওয়ার কোন প্রয়োজন মদনও বোধ করে নি।

বিদ্যাধরী তার কেউ নয়। সে-ও বিদ্যাধরীর কেউ নয়। দু-চার দিনের জন্যে একটু বাস করা। আবার এ বসবাস ভাল না লাগলে অনায়াসে অন্য কোথাও চলে যাবে সে। গিয়ে আবার দল বাঁধবে। নিজের একটা যাত্রার দল বাঁধবার ইচ্ছে আছে মদনের। কোথায় কেমন করে একটা দল বাঁধা যায়, সে সব ভাবনা এখনো ভাল করে ভাবে নি। মাঝে মাঝে মনে হয়, এখানে যদি কোন সুবিধে হয়, তবে একটা যাত্রার দল সে গড়ে তুলতে পারে।

ভিক্ষে করতে সে পারবে না। ওইটে তার কেমন যেন ঠিক ভাল মনে হয় না।

মদন ভুঁইয়া বকুলগাছের তলা থেকে একটু এগিয়ে পুকুরপাড়ে বসল। আকাশটা মেঘলা করেছে। বেশ দমকা বাতাস বইছে। পুকুরে ব্যাং ডাকছে। বকুলগাছের তলায় অন্ধকারে অনেক জোনাকীর আনাগোনা। মদন একটা বড় নিশ্বাস ফেলে ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল হাত দিয়ে সমান করল।

ভিক্ষে করতে সে পারবে না।

এখানে আসবার দিন দুই পরে সকালে উঠে ঘরদোর সেরে বিদ্যাধরী পুকুরে যখন স্নান করতে গেল, মদন তখন উঠে সবে বিড়ি ধরিয়েছে একটা। হাত মুখও ধোয়া হয় নি।

বড় চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল ওর। দলে বেলা দশটায় ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়া অভ্যেস। এখানে ঘুম ভাঙতে অবিশ্যি বেলা দশটা হয় নি। তবু তখন মাঠে রোদ নেমেছে। তখনও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। একটু পরেই রোদের তেজটা বেশ বেড়ে উঠবে। গা চিড়চিড়িয়ে উঠবে।

বিদ্যাধরী পুকুর থেকে এসে মদনকে হাঁ করে বসে থাকতে দেখে হেসে বলেছিল —বইয়া রইছ ক্যান? চান কইর‍্যা লও। তোমারে লইয়া বাইর হমু।

—কনে যামু?

আস্তে আস্তে বলে মদন।

বিদ্যাধরী গামছাটার ভেতরে চুলের গোছা নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নেংড়াতে থাকে। বলে—তোমারে গাঁও দ্যাখ্যাইয়া আনুম। মান্‌ষে কালা মদন দেইখ্যা চাউল দুইডা বেশি দিবার পারে।

মদনের মেজাজটা ভাল ছিল না। চা না পেয়ে দেহটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। বিদ্যাধরীর কথা শুনে বিরক্ত হলো।

বলল—আমি ভিক্কায় বাইর হমু না।

খেপীর চোখ দুটো বড় বড় হয়।—ওমা, ভিক্কা করে কেডা? আমিও কাউর কাছে কিছু চাই ন্যা।

—চাউল ডাইল তোমারে এমনি ছ্যায়?

—নাচন গাওন শুইন্যা ছ্যায়।

বিদ্যাধরী টান টান হয়ে দাঁড়ায়। ভেবেছে কি কালা মদন? সে ভিক্ষে করে? ভিক্ষে সে করে না। তার নাচ গান শুনে মানুষ চাল ডাল, কেউবা দুটো বেগুন, কেউ বা আধখানা কুমড়ো, যে যা পারে দেয়। কেউ যদি কিছু না দেয়, খেপী আর জন্যে গলা শুকিয়ে বসে নেই। একমুঠো মুড়ি খেয়ে দিন কাটিয়ে দেবে।

মদন চোখ দুটো ঘোরায় মাঠের দিকে।—আমি যামু না।

হাসির কথা নয়, তবু বিদ্যাধরী ফিক করে হেসে ফেলে। ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা গাল দুটোয় ঘূর্ণীর মত দুটি টোল পড়ে। মদনের চাঁদির ওপর গামছা নিংড়োয়, ওর মাথায় জল পড়ে।

—এত গোসা কি কামে। ভূতুম হইয়া বইয়া রইছ।

মদন আরও বিরক্ত হয়। বাঁ হাতে কপালের চোয়ান জল মোছে।

বিদ্যা কাপড় ছাড়তে ঘরে ঢোকবার আগে বলে—চানডা কইর‍্যা লও। আমি সাইয়ের নাম লইয়া গাওখান ঘুন্না দিয়া আসি। গোঁসা কইর‍্যা পালাইও না।

হাসছিল বিদ্যাধরী। গোঁসা কাকে বলে জানে না ও। হাসন ছাড়া কথা নেই।

মদন বলে—তুমি চা খাও নি?

ফিরে তাকায় খেপী। চোখদুটো টস্‌-টসে, চোখের কোণ দুটো ফুলো ফুলো।

বলে—পাইলে খাই। না পাইলে খাই ন্যা।

গান শুনিয়ে যার ভাত ফোটাতে হয়, সে চা পাবে কোথায়? চা চাই, চিনি বা গুড় চাই, দুধ চাই। কিছুই তো নেই। থাকবার কথাও নয়। মদন কথাটা তখন

অত তলিয়ে ভাবে নি। বাউল-বাউলীর ঘরে ভাণ্ডার থাকে না। কথাটা ওর ভাবা উচিত ছিল। ভাববার মত মেজাজ ছিল না তখন।

খেপী পেঁচিয়ে শাড়ি পরে খঞ্জনী নিয়ে কাঁধে একটা থলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মদন বসেছিল উঠোনটায়। বকুলতলায় পাড় দিয়ে খেপী এগিয়ে চলেছে। মাথায় চূড়োর মতো করে এলো খোঁপা বাঁধা। খাট একখানা শাড়ি পরণে। কিন্তু কি আশ্চর্য দেহখানা খেপীর। নিটোল ভরাযৌবন নিয়ে টান টান হয়ে চলেছে। বিলের ধারে বকের মত হাল্কা পায়ে এগিয়ে চলেছে। চলছে যেন চারপাশে খুশির হাওয়া তুলে চলেছে। ঢেউ তুলে চলেছে।

মদন অবাক হয়ে দেখছিল। বরাবরই ও এমনি দেখে আসছে। খেপীর খুশির জোয়ার যেন অফুরান, ভাটা দেখল না মদন। এত জুরি-জারি ওর কিসে আসে ভেবে পায় না মদন। খেপীকে ভাল না লেগে উপায় আছে?

হ্যাঁ, আওয়াজ তুলছে খেপী। বকুলগাছের পাতার ঝুরঝুর শব্দের সঙ্গে আওয়াজ হাওয়ায় হাওয়ায় এসে কানে লাগে।

গুরু তোমার নিশান রাখা হইল দায়।
মানুষ আইন্যা বসাইলাম পৈঠায়।
অ দয়াল গুরু আমার
গুরু তোমার নিশান রাখা হইল দায়।

আওয়াজটা ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল। বিদ্যাধরী বকুলগাছের ডানদিকের পথ ধরে গাছগাছালির আড়ালে মিলিয়ে গেল।

মেজাজটা যেন আওয়াজের হাওয়ায় ঠাণ্ডা করে দিয়ে চলে গেল খেপী। অবাক হয়েছে মদন। দেখেছে যখনই মনটা অ কুপাঁকু করে ওঠে। মেজাজটা টং হয়ে থাকে কোন না কোন কারণে, খেপীর এক ঝলক হাসি, আর আওয়াজের হাওয়া মনের উঁচুনিচু জমিন সমান করে দেয়। আলগা করে দেয় ভেতরটা। বাইরেটা হালকা করে দেয়। এটা যে কেন হয়। কি করে যে এমনটা হয়, মদন বোঝে না।

একটানা খুশির উজান বজায় রেখেছে খেপী, ভাটি কাকে বলে খেপী জানে না। তাজ্জব কারখানা।

সেদিন স্নানটা সেরে নিয়ে মদন টের পেল বেশ খিদে পেয়েছে। আবার আনচান করে উঠল মনটা। বড় ঝাঁপি জালে পড়া গেল দেখছি। চায়ের সময় চা নেই, খিদে পেলে খাবার নেই। বাউল বাউণ্ডুলের ঘরে এসে শেষে দেহটা ব্যামোয় ধরবে কি না কে জানে।

মদন দোরের ঝাঁপ করল। দড়ি দিয়ে ঝাঁপ বাঁধল। তালা নেই। চাবি নেই।

তালার কাম কিসের? বাউলের ঘরে তালা! পাটের একটা দড়ি দিয়ে ঝাঁপটা বেঁধে রাখলেই যথেষ্ট। গরু বাছুর পাঁঠা কুকুর ভেতরে না ঢোকে। তালা দেবার তাগিদ কিসের? আছে কি যে তালা দেবো। বোঁচকায় কানাকড়ি নেই। ভাণ্ডারে একমুঠো চাল নেই। ঘরে তালার কামটা কি? কিন্তু মদনের যে আছে। ফুল আঁকা টিনের বাক্সটায় গোটা কতক টাকা আছে। কেউ ঘরে ঢুকে বাক্সটি বগলদাবা করে মাঠ পেরিয়ে গেলেই অন্ধকার।

তবে একটা কথা আছে। এ ঘরে কেউ ঢুকবে না। সবাই জানে, থাকবার ভেতর ছেঁড়া কাঁথা, তুখানা কাপড় আর মাটির হাঁড়ি, কলসী, কলাইয়ের তুটো থালা বাটি, আর আছে কি? মদনের টাকার খবর কে জানে! মদন যে এখানে এসেছে, তাই এখনো গাঁয়ের সবাই জানে না।

হরিই ভরসা। মদন ঝাঁপে দড়ি বেঁধে উঠোন পেরিয়ে বকুলতলার উল্টো দিকে এগোল। সরু পথ তু'পাশে আগাছার জঙ্গল। শেয়ালকাঁটা আর ধুতরা গাছের জঙ্গল, মাঝে মাঝে বেতের ঝোপ। বেশ খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরলে চালতেবাগান। অনেক ক'টা চালতে গাছ। তারি তলায় টিনের ছাপরাখানা। ঘরখানি বেশ মজবুত পরিষ্কার।

খেপীর ঘর একখানা। ছনের চালা। বেড়া দরমার। ওখানে যেদিন থেকে মদন শুচ্ছে, সেদিন থেকে খেপী শুচ্ছে পাশে একটা ছোট চালায়। খড় আর ছনের চালা সেটারও। বেড়া, ছেঁচা বাখারির ওপর মাটি লেপা। রান্নার ঘর ওটা। ওখানেই একটা দরমা পেতে তার ওপর কাঁথা পেতে শোয় খেপী। মদনের জন্যে বিছানা করেছে বাখারি দিয়ে তৈরী উঁচু একটা মাচার ওপর। চৌকির বদলে মাচা। মাচার ওপর শুকনো তালপাতা আর খড় তার ওপর দরমা মাতুর, তার ওপর কাঁথা। শুয়ে আরাম হয়। মাচার সামান্য ওপরে বেড়াটা চৌকো করে কেটে জানলার মত করা হয়েছে। বাইরে থেকে ঝাঁপ বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়া যায় আবার খোলাও যায়। রাত্তিরে ঝাঁপটা খুলে রাখে মদন। মাচার ওপর শুয়ে পাশ ফিরে তাকালেই চৌকো আকাশ।

তবু এ ঘর খেপীর ঘরের চেয়ে অনেক মজবুত, অনেক পরিচ্ছন্ন।

ঘরের সামনের মাটির দাওয়াটা ল্যাপাপোঁছা তকতকে। উঠোনটা পরিষ্কার, কিন্তু শুকনো চালতেপাতা ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। ঘরখানার পেছনে আর পাশে বড় বড় চালতেগাছ। পাতা উড়ে উঠোনে পড়বেই।

ঘরের সামনে গিয়ে আর ডাকতে হয় না কাউকে। মদন দেখতে পায় দাওয়ায় বসে কুমি চনো মাছ আর পেঁয়াজ কেটে রাখছে একটা বড় কচুপাতায়। ওরও

ম্লান হয়ে গেছে। তেলে জলে কুচকুচে চুল এলিয়ে রয়েছে পিঠখানার ওপর। মুখখানাও তেলে জলে চকচকে কালো পাথরবাটির মত।

চালতেগাছের ছায়ায় এই ঠাণ্ডাঠাণ্ডা ঘরখানা আর কুমির দাওয়ায় বসে নিশ্চিন্তে মাছ কোটা দেখে মনটা বেশ লাগে মদনের। কাছে এসে হেসে বলে, —পাকের জোগাড় হইত্যাছে।

কুমি মুখ তুলে মদনকে দেখে হাসে—হ। গুড়া মাছের প্যাজ চচ্চড়ি করুম।

—ঝালে ত্যালে খাইতে সরেস অয়।

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিল মদন। কুমিকে দেখলেই যেন বোঝা যায়। কুমি তেলে ঝালে তরুজুত করে রাঁধনে ভাল। কথাটা আপনা-আপনি বোঝা যায়। বলে দিতে হয় না। কেমন জুত কবে বসে মাছ ক'টি কুটে নিচ্ছে। কুঁচো কুঁচো করে পেঁয়াজ কুটছে। চোখে মুখে কেমন একটা যত্ন তৃপ্তির ভাব। পরাণটা এখন মাছে আর পেঁয়াজে, বান্নাব ঝাঁজটা যেন আগে থেকে অনুভব করতে পারছে কুমি।

—বইস। ন্যাটা মাইবা বইস।

দাওয়ার ওপর পায়ের ওপব পা তুলে বসল মদন। মাটির দাওয়া যেন পাথরের মত তকতকে ঠাণ্ডা। চালতেগাছের ছায়ায় ঘেরা ঘরখানি। ভারি সোয়াস্তি লাগে দু' দণ্ড বসে জিরোলে।

—ঘরে নি চা আছে?

—আছে। বইস। কইব্যা দেই।

মাছ আর পেঁয়াজ নিয়ে ঘরের লাগোয়া একটা ছোট খুপরিতে ঢুকল কুমি। ওখানেই বোধ হয় রান্না করে। ঝাঁপটা খোলা। কুমি ঘর থেকে জল এনে মাছ কটা ধুয়ে গিয়ে ছোট একটা পিঁড়িতে বসল। কাঠ জ্বালাল। বোধ হয় চায়ের জল চড়াল। ওখান থেকে দাওয়া দেখা যায়, দাওয়ায় বসে মদনও কুমিকে দেখতে পাচ্ছিল।

—তুমি নি চা খাও?

কুমি ওখান থেকেই জবাব দিল,—আমি ওয়ার ভক্ত না। খলিফা আইলে কইর‍্যা দিতে অয়।

—খলিফা কেডা? কি কামে আসে?

কুমির চোখের চাউনি ত্যারছা হোল। —খলিফা দাশু শ্যাখ আছে এয়ানে।

মদন তখন নতুন। কিছুই জানত না। অবাক হয়ে বলে আবার।—ক্যান আছে?

ত্যারছা চোখে শানান ছুরি হানে কুমি।—তোমার মাথা আর মুণ্ডু।

খুক খুক করে হাসল কুমি। মদন ভাল করে কিছু বুঝলনা। বসে এবার একটা বিড়ি ধরাল।

একটা এনামেলের গেলাসে চা করে নিয়ে বাইরে এল।

পান চিবোতে চিবোতে বললে,—হুরুম খাইবা ?

সাত সকালে পান চিবোচ্ছে কুমি ! মাছ কোটবার সময় বোধ হয় পানটা গালে পোঁটলা করে রেখে ছিল এখন চিবোচ্ছে।

—হুরুম খাইবা ?

তা খেতে পারে মদন। চাট্টি মুড়ি খেলে মন্দ হয় না,—দ্যাও, খাই।

একটা বাটিতে মুড়ি আর খানিকটা গুড় এনে সামনে রাখল কুমি। মদনের দিকে তাকাল। চান করে এসেছে মদন। মস্ত কালো পিঠখানা ঘেমে উঠেছে। হাত দু'খানা খোড়ের মত পুষ্ট। সাঁই জোয়ান মানুষ মদন।

কুমি হাসল। হাসলে ওর দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে দোক্তা খাওয়া কালো দাগ দেখা যায়। মাড়ি বেরিয়ে পড়ে অনেকটা। লাল মাড়ি আর লাল ঠোঁট ! কুচকুচে কালো মুখখানা, চোখ দুটো লালচে।

চাট্টি মুড়ি মুখে ফেলল মদন। বেশ তৃপ্তি লাগছে মদনের। খিদে চায়ের তেষ্টা দুটোই মিটল। কুমির ঘর ঘরের মত। ভাণ্ডার আছে। যত্ন আছে। আরাম আছে। খেপীর ঘর তো ঘর নয়, গাছতলা বললেই হয়।

—খেপী কোয়ানে ?

—বাইর অইছে। ভিক্ষায়।

মদন মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলল, তারপর চায়ে চুমুক দিল।

—তুমি বাইর হও নাই ?

—না। ঝুলিকান্থা লইয়া ঘুন্না দ্যাওয়া ! কি যে কও তুমি !

কুমি খুক খুক করে হাসল।—বিয়ানে খাইছিলা কিছু ?

ওর খাবার রকম-সকম দেখে কুমি বুঝতে পেরেছে।

সকাল থেকে কিছু খায় নি মদন।

মদন বিরক্ত হয়ে বলে—আছে কোন ছাই যে খামু !

কুমির চোখে মুখে মমতা জাগল, খেপীর জন্যে মদনের জন্যেও। মদনের বিরক্তিটা ওর ভাল লাগল, কিন্তু খেপীর জন্যে মনটা কেমন ভাল লাগল না।

আস্তে বলল,—ভিক্ষ্যা কইর‍্যা প্যাট চালায়। ওয়ার দোষ নাই। তুমি বিয়ানে আমার ঘরে আইয়, চা হুরুম খাইয়া যাইও। খেপীর উপুর গোসা কইরো না কৈলাম !

—গোসা করনের কি আছে'!

একবাটি মুড়ি শেষ করে চা শেষ করল মদন। এতক্ষণে প্রাণ-ঠাণ্ডা পেট ঠাণ্ডা। এর পর কোন্ দুপুরে খেপী আসবে, কাঠ খড় এনে দুটি ভাত ফুটোবে, তরকারি কিছু হবে কি না কে জানে!

কুমির কথাটা খাঁটি। খেপী পাবেই বা কোথায়? কেনবার ক্ষমতা নেই। ভিক্ষে করে যা পায়, তাইতে পেট চালায়, খেপীর দোষ নেই। একবার হাটেবাজারে গেলে হয়। দুটিখানি চুনো মাছ কিনে নিয়ে গেলে হয়। মশলা, তেল একটু চা গুঁড়ো। টাকা তো তার কাছে আছে, কিনলে দোষ কি? তারও তো একটা খরচা আছে। কিনেকেটে দিলে খেপী রেঁধেবেড়ে দিতে পারে। কথাটা মন্দ নয়।

—এয়ানে হাটবাজার কোনদিষ্টে?

কুমি হাসল।—ক্যান?

—কাম আছে।

—বকুলতলার মাঠে নাইম্যা পূব দক্কিন সিধ্যা চইল্যা যাও। ওয়ানে হাটখোলা।

মদন উঠে পড়ল।—চললাম।

কুমির রান্নার দেরি হচ্ছিল তাই বসতে আর বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল মদনের দিকে। ত্যারছা তীক্ষ্ম দৃষ্টি। ও দৃষ্টির যেন কি একটা মানে আছে। দাওয়ার ধারে এগিয়ে পানের পিক ফেলল।

—আবার আইস।

– কাইল বিয়ানে আসুম।

বলে চলে গেল মদন। আবার সেই সরু পথ। শিয়ালকাঁটা, ধুতরা আর বেতের জঙ্গল। তবু জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। বকুলতলার পাড়ে চারদিকে খোলা। মাঠের ওপর রোদের তেজ যেন ফেটে পড়ে। তবু পুকুরটা পাশে আছে, তাই মাঝে-মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস বয়। কিন্তু এখনকার মত নয়। এখানে গাছ-আগাছায় ছেয়ে আছে চারদিক।

ঘরের কাছে এসে দেখল তেমনি দড়ি দিয়ে বাঁধা ঝাঁপ। ঘরে ঢুকে টিনের ছোট বাক্স থেকে দু'টো টাকা বার করে জামাটা গায়ে চড়িয়ে বকুলগাছের উঁচু জমি থেকে নিচু মাঠে নেমে পড়ল। কোণাকুণি পাড়ি দিতে মাঠটা। এরি ভেতর রোদে খাঁ খাঁ করছে মাঠটা। কোথাও গাছগাছালির চিহ্ন নেই। ধানের কাটা গোড়াগুলো পায়ের তলায় বিঁধছে কোথাও কোথাও। চাষ করা মাটি ডেলা পাকিয়ে শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে রয়েছে।

ওই দূরে চালাঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। ওইটেই বোধ হয় হাটখোলা। মদন হনহন

করে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। পিঠখানা ভিজে গেছে, পিঠের দিকে জামার কাপড় সপ সপ করছে ভিজে।

অত দূর যেতে হোল না, হাটখোলাও দেখা হল না।

মাঠটা পেরিয়ে উঁচু জমিতে উঠতে দেখল একটা জেলে চুবড়ি মাথায় করে এগিয়ে চলেছে।

—হেই কত্তা মাছ আছে নি ?

লোকটা দাঁড়াল। ভাল করে লক্ষ্য করল মদনের দিকে। লোকটাকে তো এ চত্বরে কখনো দেখে নি। জেলেটা বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল মদনকে।

—মাছ আছে। বাড়ি কোয়ানে ?

মদন বিরক্ত হোল। তার বাড়ি কোথায়, তা দিয়ে এ লোকটার কি দরকার। ও কথার উত্তর না দিয়ে মদন ওর মাথার চুপড়িটা ধরে টানল। চুপড়িটা হালকা লোকটা নামাল। চুপড়ির ভেতরে গাব দেয়া জালখানা গোটান; তার তলায় গোটা পাঁচেক শিলং মাছ রয়েছে। এক-একটা এক বিঘতের মত লম্বা।

—মাছ কয়ডা কয় পইসা দিমু ?

—তিন আনা পইসা দ্যান।

মদন হেসে ফেলল। বলে কি। পাঁচটা মাছ তিন আনা। পয়সা কি গাছের গোটা ?

—ইরে বাইরা ! তিন আনা। চারডা পইসা দিমু।

দেবে না লোকটা। শেষ পর্যন্ত বলল, বেচাকেনা শেষ করে ঘরে ফিরছে, যাক গে। ছ' পয়সা হলে ও মাছ ক'টা দিয়ে দেবে। মদন মাছ পাঁচটা হাতের খাবলায় নিয়ে বাঁ হাতে একটা টাকা বার করে ওর হাতে দিল। ভাগ্যিস লোকটার বেচাকেনা শেষ হয়েছিল, কাছে পয়সা ছিল, নইলে টাকা ভাঙান বিপদ হোত।

ভাঙানি পয়সা নিয়ে মাঠটা পেরিয়ে হন হন করে আবার বকুলতলায় যখন ফিরে এল মদন, তখন মনে হোল ওর ভুল হয়ে গেছে। তেল মশলা আনা হয় নি। মাছ রান্না হবে কি করে কে জানে।

আবার এই মাঠ ভেঙে ওর হাটখোলায় যেতে ইচ্ছে হোল না। মাছ ক'টা ঘরের ভেতর একটা বাটিতে রেখে জামা খুলে বসল। জামাটা ঘামে ভিজে জবজবে। জামা পরে এখানে চলাফেলা করা যাবে না দেখা যাচ্ছে। যাত্রা দলে তো এত হাঁটা-হাঁটি হাঙ্গাম ছিল না। জামা পরে বাবু সেজে রাঁধা ভাত খেত।

খেপী ফিরে এসেছে। ঘরে ঢুকে খঞ্জনী রেখে কাঁধ থেকে থলে নামাল। চাল আর ডাল মেশান আর একটা ছোট চালকুমড়ো—ভিক্ষেতে এই জুটেছে।

মুখখানা খেপীর কাঁসার মত চকচকে, ঘামে ভিজে, চোখ দুটো সামান্য লাল। ঝোলা নামিয়ে চাল ডাল ঢেলে ফেলল একটা ছোট্ট চুপড়িতে, চালকুমড়োটা রাখল। মদনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

—গোসা নি পড়ল ?

মদন ও কথার জবাব দিল না। ও ভাবছিল। এর পরে খেপী উনুনে শুকনো ডালপাতা ধরিয়ে রান্না চাপাবে তারপর খাওয়া। কুমির বোধ হয় রান্না করে এতক্ষণে খাওয়া সারা হয়ে গেছে !

বিরস মুখে ও বললে—মাছ লইয়া আইছি।

খেপী বলল,—মাছ ! দিলা কেডা ? পরাণ জাইলা আইছিল ?

—না, কিন্যা লইয়া আইছি।

খেপীর মুখখানা মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হোল।—ক্যান ?

খেপীর এমন মুখ এ পর্যন্ত দেখে নি মদন। খেপীর মুখে হাসি নেই। এ যেন ভাবনার বাইরে। মদন ওর মুখ দেখে একটু সতর্ক হোল। সে কি কিছু গোল করে ফেলেছে।

—খামু। তুমি খাইবা, আমি খামু।

হাসবার চেষ্টা করল মদন।

—অ !—খেপীর মুখে হাসি ফুটল।—তুমি খাইও, আমার খাওন নাই।

এবারে মদনের মুখটা গম্ভীর হোল—ক্যান ?

খেপী উঠে দাঁড়াল। ফিক করে হেসে ফেলল,—সাইয়ের নামে যা জোটে তাই আমাগো খাওন। আর কিছু খাওন নাই। তুমি খাইও। কলুর ঘরে যাইয়া ত্যাল লইয়া আইস। মাছ ভাইজ্যা দিমু অনে !

মদন অবাক হোল। বিরক্তও হোল। একি কথা। গান গেয়ে ভিক্ষেয় যা জুটবে তাই খাবে। তা ছাড়া আর কিছু খাওয়া চলবে না ওদের। কেন খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়। কেউ যদি দেয় খেতে আপত্তিটা কি ! তবে তো বড় বিপদ ! তবে তো কোনদিন চাল না জুটলে পয়সা দিয়ে চাল কিনলে খেপী খাবে না। ওর সামনে উপোস করবে। তাকেও উপোস করতে হবে।

বাউল বাউলীর কারখানা দেখে তাজ্জব মদন !

এমন যদি হয়, তবে এর সঙ্গে কি করে থাকা চলে ! কিন্তু একটা কথা না কবুল করে উপায় নেই। খেপী আছে বেশ। যা জুটল তাই খেল, না জুটল তো খেল না। আফশোষ নেই, ভাবনা যন্ত্রণা নেই। মনের সুখে দিনগুলোকে যেন কাপাস তুলোর মত হালকা খুশির বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে চলেছে। ভাত না থাকে নাই বা থাকল খুশি তো আছে। তাজ্জব কারখানা !

মাছগুলো এখন কি হবে? কোথায় কলুর ঘর? কোথা থেকে আবার তেল আনতে যাবে ও।

মদন বুদ্ধি খাটাল।—মাছ কয়ডা আমি তোমারে ভিক্ষা দিল্যাম।

—ভিক্ষা করি না। সাইয়ের নামে ঘুন্না দেই। মানুষে খুশি হইয়া যা ছ্যায়, লই।

বুদ্ধিটা আবার গুলিয়ে গেল মদনের। খেপীর তল পাওয়া ভার। ও কি বলে, কি চায়, সবই যেন আবছা আবছা। বুঝে উঠতে পারছে না মদন।

তবু বলল,—আমি খুশি হইয়া দিল্যাম।

খেপী ফিক ফিক করে হাসছে। কথাখান তোমার মুখের, না পরাণের?

মদন তাকায়। অতশত কে জানে। মুখের কথা, না প্রাণের কথা কে অত ভাবতে বসেছে ভরা দুপুরের রোদ্দুরে। খেপী যেন ঝাঁপি জাল। মেয়েমানুষ অনেক দেখেছে মদন। কিন্তু এমন ব্যাঁকা-ত্যাড়া মেয়েমানুষ জন্মে দেখে নি। এর চেয়ে মাছক'টা না আনাই ছিল ভাল। সবচেয়ে ভাল ছিল এখানে না আসা।

মদন বসে রইল মুখ ভার করে।

খেপী আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

তারপর কলুর ঘরে গিয়ে তেল এনেছিল খেপী। মাছ পাক করেছিল। চাল-কুমড়ো খণ্ড খণ্ড করে কেটে চালে ডালে খিচুড়ির মত একটা ঘ্যাঁট আর মাছ ভাজা। খাবার পর বিড়ি ধরিয়ে এসে দেখল মদন খেপী দু'খানা মাছ নিয়েছে নিজে। ওকে দেখেই হেসে বলেছিল,—তোমার বাক্যি ফ্যালনা না। লইলাম দুইখান মাছ।

খুশি হোল মদন। খেপী তার কথা রেখেছে। খেপীকে দেখেশুনে এ কথা সে নিশ্চয় বুঝেছিল যে, একমাত্র ওর কথাই খেপী রেখেছে, অন্য কেউ বললে কথা রাখত না। খেপী তাকে মান্যি করে।

কিন্তু না। ঠিক যেন মান্যি করবার মত ভাবসাব মনে হয় না। সময়ে সময়ে মদনকে বোকা বানিয়ে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। যেন একটা বাচ্চা ছেলেকে খ্যাপাচ্ছে। খেপী যে ওকে কি চোখে ছাখে, ও আজ পর্যন্ত বুঝল না। খেপী জানে আর ওর সাঁই জানে।

এরপর থেকে খেপী সকালে বেরিয়ে যাবার পর মদন কুমির ঘরে যেত চা আর মুড়ি খেতে। কখনো-সখনো একটু মাছ চচ্চড়ি অথবা কাসুন্দি দিয়ে কাঁচা আম মাখা। কুমির আদর পরিষ্কার বোঝা যায়। ভাল লাগত মদনের যেন কোন মূল্যবান বস্তুকে আদর যত্ন করে বশে রাখার চেষ্টা। খেপীর চেষ্টা নেই। বশের চেষ্টা নেই। রসের চেষ্টাও নেই। ও যেন এক অদ্ভুত।

বিকেলে আর সন্ধ্যায় বেরোত মদন মাঠে যে দিকে দু'চোখ যায়। বেড়িয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা কাবার। খেপী বেরোত না। থাকত ঘরে। এই সময়ে ওর কাছে আসত পাঁচ ঘরের বৌ-ঝি কাচ্চা-বাচ্চাদের ঝাড়ফুঁক করাতে।

মাঝে মাঝে মদনের ইচ্ছে হোত বিকেলে অথবা সন্ধেবেলা কুমির কাছে যায়, কিন্তু পারত না। কেমন একটা সঙ্কোচ লাগত। এর ভেতরে ওর গুণাগুন শুনতে পেয়েছিল কুমির ঘরে সন্ধ্যার পর মানুষ আসে। কুমিকে কথাটা জিজ্ঞেস করা যায় না। খেপীকে জিজ্ঞেস করেছিল—কুমি নাকি নষ্ট ?

খেপী হেসে উ.ঠছিল। যেন একটা হাসির কথা।—কেডা কইল ?

—হুনাহুন শুনলাম।

—যে যেমুন সে তেমুন গ্যাখে। বেখাও সগ্‌গল তোমার মনে। যার যেমুন মন, তার তেমুন পাওন। যে মনে নষ্ট, সে সগ্‌গলের নষ্টামী খুঁইজ্যা ফেরে। আমাগো ও দিয়া কি কাম! ও হগল কথায় কান দিও না।

মুখখানা খুশিতে ভরে ওঠে। আবার বলে—কুমির পরাণডা বড় সাফ। ওর পরাণের টানে আউগাইয়া যাই। আন কথায় আমাগো কি কাম!

মদন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় খেপীর দিকে। কি কথাই বলল খেপী। সাত কথার এক কথা। কথার মার নেই। সত্যিই তো কি দরকার কুমির নষ্টামীর খপরে। কুমির প্রাণের টানটুকু নাও। প্রাণ ঠাণ্ডা। সত্যিই কি টান। কি ভালবাসা। খেপীকে যেমন ভালবাসে, তেমনি অন্তরের টানটা মদনের ওপর। দিন কতকেই মদন কুমির টানে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওর ওই ছায়া-ছায়া ঘরের দাওয়ায় বসে বিয়ানে চা খেতে যে আরাম ও পায়, সেটা আর কবে কোথায় পেয়েছে। অধিকারীর দলের দামড়া কাত্তিকের বানান চা আর কুমির ঘরের চা!

খাশা কথা বলেছে খেপী। খেপীর তুলনা নাই।

অন্ধকারে রাত্তিরে বকুলতলায় বসে ভাবতে ভাবতে থ' মেরে যায় মদন। খেপীর ঘরে কেটে গেল তার একমাসের ওপর, অথচ কই একবারও তো তার ত্যামন কুনজর পড়ল না খেপীর নিটোল নধর যৌবনের দিকে। কেমন করে যে এটা সম্ভব হোল।

এ কথা সত্যি, মদন যাত্রাদলে এক আধটুকু নেশাভাঙ যে মাঝে-মধ্যে করত না, তা নয়। কিন্তু নষ্টচরিত্রের মানুষ সে নয়। মেয়েমানুষ সম্পর্কে কৌতুহল তার কম। ঝোঁকটা ছিল বরাবর গাওনা গেয়ে মান্য কুড়োবার দিকে। মর্যাদাও তার কম ছিল না। ওই মর্যাদাটুকু রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতেই ভাল লাগত ওর। মেয়েমানুষের ধারে কাছে বড় একটা ঘেঁষত না। দেশে যখন ফিরত, দিদির অনেক অনুরোধ-উপরোধেও বিয়ে ও করে নি। সাতপাকের বাঁধনে বরাবরই ওর ভয়।

তবু মদন ভূঁইয়া একটা সাই জোয়ান পুরুষমানুষ। বিদ্যাধরীর সঙ্গে এক-মাসের ওপর মেলামেশা। তবু কেন তার মনটা কখনো দেহের আনাচে-কানাচে পথ খুঁজে বেড়াল না। এ আর এক আশ্চার্য কারখানা।

মনের বিত্তান্ত মনই জানে। মনের কাছে মন অবাক মানে।

এই অবাক ভাবটুকু মনে নিয়ে ঘরে ফিরে এল মদন বকুলতলা থেকে।

॥ আট ॥

সেদিন সেই বকুলতলার ছাপরায় বিদ্যাধরীর ফান্দে বুঝি চান্দ ধরা পড়ল।

সে বিত্তান্ত কওনের না—বলনের না।

দিনকতক ধরে মদন দাশু শেখের দোকানে যেত সন্ধ্যাবেলা। ফিরত একটু রাত হলে। মন্দ লাগত না। সন্ধ্যাবেলাটা একা একা বেড়ানর চেয়ে খলিফার দোকানে গিয়ে বসলে জামাটার তাগাদা করাও হোত। আর হাটখোলার নানা মানুষের সঙ্গে নানা গল্প-গুজব করে সময়টা বেশ কাটত। জনাকতক ওখানে প্রায় রোজই আসত। মনছুর মিয়া, পরমা হালুইকর, রাউজা, মনসাচরণ। মাঝেমধ্যে পদ্মদিদি। তামাক বিড়ির ধোঁয়া, খুক-খুক কাশি, হাসি আকাশ মারা গল্প, আর ঢুলুঢুলু ঘুম-ঘুম চোখে খলিফার হাসি-হাসি মুখ, এক আধটা ফোড়ন। হাটখোলার দর্জির দোকানের আড্ডাটা বেশ জমত। ওটা আরও জম-জমাট হোত, রাত গভীর হলে। তখন ছোট কলকে বেরোত, কখনো কখনো বোতল। আড্ডাটা আসলে নেশার। মদন সেটা প্রথম প্রথম জানত না। ও জামার তাগাদার আছিলায় যেত, ঢুলুঢুলু চোখে দাশু শেখ তাকাত, ফেরবার আগে বলত,—কাইল আইসেন। আবার পরের দিন যাবার একটা সুযোগ পেত। আসলে যেতে ইচ্ছে হোত মদনের, জামার তাগাদা একটা ছুতো।

সেদিন পরমা আর মনছুর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। মদন উঠতে আর চাইছে না। ওদের যাত্রাদলের গল্প জুড়ে দিয়েছে। পরমা আর মনছুর দুজনেই উসখুস করছে। ছোট কলকের সময় বয়ে যায়। গলাটা বুকটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

পরমা হালুইকর জিজ্ঞেস করে বসল,—তোমাগো দলে দমকট্নের কাম নি আছিল মদনভাই ?

বলে একটা চোখ ত্যারছা করে দুটো হাতের তালু মুঠো গাঁজা টান দেবার ভঙ্গীতে জোরে হাওয়া টানল মুখে।

মদন হাসল।—হ', নটগুরু শিবের প্রসাদ না খাইক্যা পারে!

—তোমার এক ছিলিম আধ ছিলিম চলত ?

—হইলে অইত। না হইলে না।

মনছুর মিঁয়া হাসল।—জান বাচাইলা মদনভাই। লও পরমা ঝাপখান লামাইয়া দ্যাও। অই খলিফা, ল মশল্লা বাইর কর। কইলক্যা ধরাও।

মদন প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। এরা সবাই গাঁজা খায়।

ঢুলু ঢুলু চোখে খলিফা উঠল।

বেড়ার একটা জায়গায় দরমা টেনে খুলে একটা খুপরী থেকে পোঁটলা বার করল।

—কয় আনা ?

বিক্রী করবে খলিফা। কিনবে পরমা মনছুর ওরা।

—আষ্ট আনার কমে অইব না। মদনভাই রইছে।

ঘুম ঘুম চোখে হাত পাতল খলিফা। পরমা ট্যাঁক থেকে বার করল পয়সা। মনছুরও বার করল। মদন বলতে চাইল, আমিও দিই।

না। তা কখনো হয়।

মনছুর লাল দাঁত বের করে হাসল,—তুমি হইল্যা আমাগো অতিথ্!

খলিফা পয়সা হাতে নিয়ে পোঁটলা খুলে মশলা বার করে দিল! এক পোঁটলা মশলা। মদনের চক্ষুস্থির। অতখানি গাঁজার দাম অন্তত তিন-চারশ টাকার কম নয়। কি তারও বেশি।

দ্রব্যটি হাতের তালুতে নিয়ে পরম যত্নে তৈরি করল মনছুর। ছোট কলকের মুখে সাজিয়ে আগুন দিয়ে চোখে-মুখে পরম বিনয় প্রকাশ করে মনছুর মদনের দিকে কলকেটা এগিয়ে দিল।—প্রসাদ কইর‍্যা দাও।

ওকে আজ বড় মান দিয়েছে মনছুর। মদন বিনীত গুণে দুটি টানে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল। ঝলসে উঠল কলকের মুখ। তারপরে হাতে হাতে পাক ঘুরতে লাগল কলকে ভরা দমে চলল গঞ্জিকা চক্র।

সেদিন মদন যখন ফিরল, তখন রাত নিঝুম। অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে আসতে ওর অনেকটা সময় লাগল। ধোঁয়ার চাপে ওর মাথাটা ভারি। চোখদুটো টকটকে লাল। মাঠের কয়েকটা পাক ঘুরল বিনা কারণে। বকুলতলাটা ঠিক দিশা করতে পারছিল না। ঘুরে ফিরে বকুলগাছের গোড়ায় এসে থম্ ধরে দাঁড়িয়ে রইল একটু সময়। এখনো ঠাওর করতে পারছে না যেন। কোনদিকে এল কোনদিকে যাবে।

অনেকদিন পর ধোঁয়া টেনে কেমন বোম হয়ে গিয়েছিল মদন।

বার বার লক্ষ্য করে অতি সন্তর্পণে ঘরে ফিরল।

বিদ্যাধরী তখনো বসে রয়েছে রান্নাঘরের ছাপরার সামনে। একটা বেড়াল ওর সামনে। তার গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

মদনকে দেখে বিদ্যাধরী উঠে এল।

—কোয়ানে আছিলা ?

মদন টকটকে লাল চোখ মেলে তাকাল।

ঘরের ভেতরের কুপির আলোয় বিদ্যাধরীর ছায়া-ছায়া নধর দেহটার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মস্ত বুকখানা ঘামে ভিজে উঠেছে। ভেতরে যেন আগুনের ভাওয়া জ্বলছে।

হেসে উঠল বিদ্যাধরী। অন্ধকারে হাসিটা ঢেউ তুলে মিলিয়ে গেল।

—তোমারে জানি কেমুন ঠ্যাকে। কোয়ানে আছিল ?

—হাটখোলায়।

বিদ্যাধরীর মস্ত চোখদুটো চিক্‌চিকিয়ে উঠল। আর কোন কথা না বলে ঘরের ভেতরে ঢুকল।

মদন ঘরে গিয়ে মাচার ওপর উঠল।

—খাইবা না ?

—না।

শরীরটা ভাল লাগছে না মদনের। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। খেতে বসলে হয়তো বিদ্যাধরী তার নেশার কথা টের পাবে। চুপচাপ শুয়ে পড়াই ভাল। তাছাড়া খলিফার ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা গিয়েছিল পরমায় দোকানে। হালুইকর বেশ কয়েকটা রসগোল্লা খাইয়ে দিয়েছে। তাতেই নেশাটা জমেছে আরও বেশি।

চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মাচার ওপর। বিদ্যাধরী টের পায় এটা চায় না মদন। কেমন একটা সঙ্কোচ লাগে। বিদ্যাকে মনে মনে কেমন একটু ভয় না করে পারে না ও। কি যে আছে খেপীর চোখে-মুখে ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ধারাল একটা স্রোত ঢেউ তুলে তুলে সমানে উজানে বইছে। এ স্রোতে ছহুল-বহুল করে ডুবোডুবি করা যায় না। বিদ্যাধরীর কাছে গেলেই কেমন আপনা-আপনি সামাল সামাল ভাব আসে একটা।

কেন যে এমন হয় !

মদন ভোম হয়ে পড়ে পড়ে ভাবে !

বিদ্যাধরী কি খায়। কখন ঝাঁপটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ও লক্ষ্যই করে না। ওব গাঁজার ভাবনায় ও মশগুল। খেপীর কথাটা ভাবতে লাগে। একবার ভাবনায় পেলে গাঁজার ভাবনা থামে না।

ঘামে বুক পিঠ ভিজে উঠেছে। তুম্‌শানি গরম পড়েছে আজ। ঝাঁপটা খুলে দিলে বোধহয় বাতাস আসত ঘরে।

ভাবে। কিন্তু উঠতে পারে না মদন।

খেপীর কথাই ভাবে। খেপী কি মানুষ! ওকে যেন হাওয়ায় তৈরি বলে মনে হয় ওর। ধরতে গেলে কিছু নেই, হাওয়া। অথচ চোখে ত্যাখ রিষ্টুপুষ্ট মেয়েমানুষ। মনে মনে ধরবার চেষ্টা করে মদন। না, ধরা যায় না।

ধোঁয়ার নেশায় উঠে বসে মদন। হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়, ধরা যায় না। খেপী কি তবে হাওয়া? হাওয়ায় হাওয়ায় ওর হাসির শব্দ গানের আওয়াজের মত বুকে লাগে। ও দেখতে পায় বুকে যেন অনেকগুলো তার। খেপীর আওয়াজের হাওয়ায় তারগুলো ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে। কি মিঠে আওয়াজ তোলে বুকে।

আবার খেপীকে ধরতে যায়, আবার ফসকে যায়। শুধু হাসনের আওয়াজখানা বুকে লাগে।

তাজ্জব কারখানা।

অনেক রাত পর্যন্ত নেশার ঘোরে মদন খেপীকে শুধু ধরবার চেষ্টা করে। ওই এক ভাবনায় পেয়ে বসেছে তাকে।

রাত তখন কত হবে কে জানে। হয়তো ভোর হতে আর বাকী নেই।

মদন উঠে পড়ল। স্তব্ধতার ভেতরে ওর মনে উথাল-পাথাল। গরমটা যেন তুমশানী গরম। ঘরে টিকতে পারছে না। মাথার চাঁদিটায় আগুনের হলকা উঠছে। দমে দমে খেপীর ভাবনা পেয়ে বসেছে ওকে।

উঠে দোরের ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে বেরুনমাত্র চোখদুটো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ধু-ধু মাঠের ওপর পড়েছে পশ্চিমে ঢলে পড়া চাঁদের বাইল জোছনা। বালু বালু রঙের জোৎস্না। চাঁদ উঠেছে শে রাত্রে। সামনে বকুলগাছের পাতার ঝির-ঝিরনি। কেমন শির শির করে ওঠে গা।

মদন উঠোনের শেষ প্রান্তে এসে পাকঘরের চালাটার দিকে তাকাল। এই ঘরেই খেপী থাকে। কিন্তু ঘরের ঝাঁপটা যেন আলগা মনে হয়। একটু খোলা। কাণ্ডখানা কি। খেপী উঠেছিল নাকি? নাকি রাত্তিরে খেপী ঘরে থাকে না। অন্য কোথাও চলে যায়। মদন জানতেও পারে নি।

না, ঘরের ঝাঁপটা বন্ধ নয়। খানিকটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে।

মদন এগোল। পা টিপে টিপে এগোল। এমনও হতে পারে ভেতরে অন্য কোন মানুষ আছে। হয়তো খেপীর কাছে এসেছে। তার পায়ের শব্দ পেলে সতর্ক হয়ে যাবে। খুব সন্তর্পণে এগোল মদন।

আজ বোধহয় খেপীর জারিজুরি ধরা পড়বে। রাত-বিরেতের কারখানা সব ফাঁস হয়ে যাবে।

ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল মদন।

না, ঘরে কোন মানুষ নেই, খেপীও বেরিয়ে যায় নি।

ভাল করে লক্ষ্য করল মদন। খেপী বসে রয়েছে ওর শোবার কাঁথাটার ওপর। বসবার ধরণটা ভারি অদ্ভুত। একটা পা ভেঙে একেবারে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, আর একখানা পা আসনের মত। সোজা টান টান হয়ে বসে রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা দম ফেলল খেপী।

মুখখানা রসে খুশিতে টলমল করছে। পেছনের মাটির বেড়ার চৌকো জানালার মত ফাঁক দিয়ে এক ঝলক বালু চিকচিক জোছনা এসে পড়েছে ওর চোখে মুখে দেহে।

খেপীর নিটোল ভরন্ত দেহখানা জোছনায় ভেসে যাচ্ছে।

মদন ঝাঁপটা আরও খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। না ঢুকে ও পারল না। অসম্ভব। কোনমতে ও নিজেকে বাইরে ধরে রাখতে পারল না। মনে হলো, ভেতরে রসের জোয়ার বইছে। জোছনা আর খুশি ঢেউ তুলেছে। ওর চোখদুটোয় আগুন ধরল। ছনমন করে উঠল মনখানা।

ভেতরে ঢুকে ও বসল খেপীর সামনে।

ঝিরঝিরে বালুর মত জোছনা ঝরে ঝরে পড়েছে খেপীর চোখে মুখে দেহে।

মুখখানা যেন এইমাত্র রসে ডুবিয়ে এনেছে কেউ। টলমল করছে। চোখের কোলদুটি ফুলো ফুলো। মস্ত মস্ত চোখের পাতা দুটি বোজা। মুখে হাসিমাখা যেন মিষ্টিমাখা।

উঃ! অসহ্য লাগে মদনের। এত লাবণ্য এত মিঠা! ওর বোধ-ভাবনা পৌঁছোতে পারছে না এর কাছাকাছি। মনে হয় যেন আকাশের ওই চান্দখানা খেপী বেটে গুলে সর্বাঙ্গে মেখে নিয়েছে।

মদনের বোধভাস্থি হারিয়ে যায়। এগিয়ে খেপীর হাতখানা চেপে ধরে।

কেঁপে ওঠে খেপীর দেহটা। মুখের হাসিটাও যেন থরথরিয়ে কাঁপে।

মস্ত চোখ দুটো মেলে খেপী। রাত্রির নিথর দীঘির মত টলটলে দুখানা চোখ।

—তুমি?

ফিসফিসিয়ে ওঠে খেপী বিদ্যাধরী।—চক্ষু বুইজাও তুমি, চক্ষু চাইয়াও তুমি। তুমি আমার সবখানে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকায় মদন। খেপী কি বলতে চায়, বোঝন দায়। মদন দেখে

খেপীর মস্ত চোখ দুটো তার দিকে মেলে রয়েছে। কিন্তু দৃষ্টিটা যেন ওর বুকের ভেতর পর্যন্ত সেঁদোচ্ছে। সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে উঠল মদনের।

খেপীর হাতখানা চেপে ধরে কাছে টানবার চেষ্টা করল মদন। খেপী যেন শোলার মত হালকা। ওর কাছে এগিয়ে এল। মদনের হাতটা কাঁপছিল। গলাটাও কাঁপছিল। বলল—এত রাইতে জাইগ্যা আছিলা কি কামে ?

খেপী ওর মুখখানার ওপর চোখ দুটো মেলে ধরে বললে,—তোমার জন্যে ?

মদন দেখল মুখখানা ওর তেমনি হাসি হাসি, দৃষ্টিটা তেমনি ভেতরে সেঁদোচ্ছে। তবু কথাটা যেন মধুতে ভিজিয়ে বলা। তোমার জন্যে জেগে ছিলাম। কথাখানা য্যামন ত্যামন নয়। সহজে বলা যায় না, যেখানে-সেখানে শোনা যায় না। এমন কথা বলতে পারা শুনতে পারা দুটোই বড় ভাগ্যিতে মেলে। মদন দুলে উঠল। দোলা লাগাল মদনের ভেতরটায়। তোমার জন্যে জেগে ছিলাম। এমন কথা সংসারে কখনো কেউ যে ওকে বলতে পারে ভাবতে পারে নি মদন।

ওর বুকেও কি রস জমল। আওয়াজটা নিজের কানেই মিঠে মিঠে শোনায়।—তা আমাবে ডাইকলে পারতা।

ফিক করে হাসল খেপী—তুমি তো আছিলা !

কথাখানা আবার গোলমেলে। বোঝা দায়।

—কোয়ানে ?

—সবখানে।

মাথায় গোলমাল না থাকলে এমন আজগুবি কথা কেউ বলে, তা নইলে আব মানুষ খেপী বলে কেন ? কথাবার্তার কোন মাথা নেই, মুণ্ড নেই। আবার ভ্যাবলার মত তাকাতে হয় মদনকে।

কিন্তু হলে হবে কি। এই থম্ মার রাতে বালু চিক চিক জোছনায় খেপীর কথা কানে গিয়ে একটা সমান তালে ঢেউ তোলে। কথার মানে বোঝনের উপায় নেই। কিন্তু কি যে একটা বোঝা যায়। মদন ঠাওর করতে পারে না। ওর ওই মস্ত চোখ দুটো যেমন দীঘির মত শান্ত নিথর গহিন। তেমনি গহিন একটা কোন বোধ ভেতরে টনটনিয়ে ওঠে ওর কথার ঘায়ে।

মনে হয় যেন বোধ আছে, ভাষ্যি নেই—এমনি জুতের কথা।

মদন বলে,—এ ঘরে আমি আছিলাম না।

—আছিলা।

—কখন ?

—রাইত দুফুরে উইঠ্যা বইলাম। জোয়ার আইছিল। তোমারে দেখলাম।

মদনের মনখানা থমথমিয়ে ওঠে। দূরে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। রাত বুঝি তবে শেষ হয়ে এল। মাটির দেয়ালের চৌকো খোপর দিয়ে তখনো চাঁদের আলো এসে পড়ছে।

খেপীর ফিসফিসানি কথা ওর বশ হরণ করে। কেমন অবশ অবশ লাগে। ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে, কি ভাল লাগে মদন জানে না।

খেপীর কথার ঢেউয়ের তালে কথার ঢেউ তুলতেই হয় ওকে।—কিসের জোয়ার ?

—রসের।

—রাইত তুফুরে রসের জোয়ার দেখলা কোয়ানে ?

—এই বেম্মাণ্ডে।

বলে নিজের দেহখানা দেখিয়ে দিল খেপী।—তুমি আইলা। তোমারে নি ধরা যায়। সায়রের ঘাটে গিয়া ধইরা আনলাম, আর আইজ পাইলাম তোমারে। ডুব দিয়া তুইল্যা আইন্যা পৈঠায় বসাইলাম।

মদন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। খেপীর হাতখানা তখন ওর হাতের মুঠো থেকে খসে গেছে।

খেপীর মুখখানা আনন্দে ভাসছে।—তোমারে পাইলাম। সাদন আমার সাথক অইল।

মিটি মিটি হাসছে খেপী।—আর তোমার পলানের পথ নাই। আর যাইবা কোয়ানে।

মদন শোনে। কি বোঝে। কে জানে। কথার মর্ম জানে বা না জানে। শোনে। এমন কথা শোননের ভাগ্যি আর কি হবে কখনো ? ওর অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। খেপী ওকে অবশ করে দিয়েছে। চোখের সামনে চাঁদের আলোয় মাজা খেপীর নিটোল দেহখানা। স্পর্শ করতে পারছে না মদন। কাকে ধরবে। কাকে দংশন করবে। এ যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তবু ধরা দিয়ে বসে আছে।

—তুমি এক্কারে আমার হইয়া গ্যাছ।

মদন সুর মেলায়।—আর তুমি ?

—আমি তোমার। আমার সব তোমার। মদন ভুঁইয়ার গায়ে কম্প দেয়। জারিয়ে ওঠে সমস্ত শরীর। গায়ে কাঁটা দেয়।

এসব খেপীর আজব কারখানা। কখনো ওর এমন হয় নি! রাত কখনো এত মিঠা লাগে নি। মেয়েমানুষের এত কাছে বসে এমন করে কখনো সে কথা বলে নি রাত-বিরেতে। কখনো যদি বা রাত্তিরে কোন মেয়েমানুষের ভাবনা মনে জেগেছে, সেটা অন্যভাবে। এমন অদ্ভুত ভাব-সাব ভাবতে পারে নি কখনো।

তাকে কি যেন করে দিল খেপী। সে কি করতে এসেছিল। কি হয়ে গেল।

পচা মাংসের লোভে এসে রসের বন্যায় ভেসে গেল। এই কি রস। ওর গা জারিয়ে উঠছে। বুকের ভেতরে উথাল-পাথাল। চোখ দুটোর পাতা ভারী হয়ে নেমে আসছে।

খেপীর চক্ষু টলোমলো।—আমার নিজের কইতে কিছু রাখলাম না গো, সব তোমারে দিল্যাম।

খেপী নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিল তার কাছে। এমন কথার পর মদনের আর কি চাইবার আছে? কি সে চায়। না, কিছু না। কিছুই আর চাইতে পারছে না সে। শুধু দেখছে আর দেখছে। খেপী নিজের বলতে কিছু রাখল না। সব তাকে দিয়ে দিল। কোথায় দিল। কেমন করে?

কে জানে? তবু ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারছে স্পষ্ট করে। খেপী সত্যিই তার সব তাকে দিয়ে দিয়েছে। ও টের পাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে। ভেবেচিন্তে ঠাওর করতে পারছে না। অত ভাবনা চিন্তার কাজ কি! ও সব ভাবনা তার আর আসছেও না। কি করে কি হোল। কে অত ভাবে।

রাত দুপুরে রসের জোয়ার কেমন করে আসে। আর সেই জোয়ারে ফান্দ পেতে কেমন করে ঘাটে বসেছিল খেপী। আর কি কবে তার মানুষকে আজ পেল। চান্দ ধরল ফান্দে। কে জানে আর কেই বা ভাবে অত কথা। ওর ভেতরটায় যে ভাবনার দড়ি-দড়ার বাঁধন শক্ত গেরো পড়ে পড়ে জট পাকাচ্ছিল, আর এই স্তব্ধ রাত্রে খেপীর ঘরে এসে সব বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেল জোয়ারের স্রোতে। অবশ হয়ে গা ভাসিয়ে দিল।

মদন ভুঁইয়া কিছুই বুঝল না। কিন্তু সবই যেন বোধে বোধ করতে পারল।

এ বিত্তান্ত বলনের না, কওনের না।

বোধে বোধ করতে যদি পার, তবেই মর্ম বুঝে নাও।

বিদ্যাধরী জাত পাটনী। ত্রিবেণীর জোয়ারের খবর জানে। ফান্দ পেতে বসে থাকে চান্দের আশায়। আজ চান্দকে নিয়ে বসিয়েছে পৈঠায়। রসের ভিয়ানে নীরে ক্ষীরে এক জ্বাল দিতে দিতে আজ রসিক মানুষের সন্ধান পেয়েছে। একের ভেতরে দুই। পুরুষ পিকিতি দুই আছে এক দেহের ব্রহ্ম . । দুইকে এক করে নিতে পেরেছে বিদ্যাধরী। কেমন করে নিতে পেরেছে বিদ্যাধরী। কেমন করে কে অত ভাবে, কে অত হিসাব-নিকাশ করে।

রসের ভিয়ানে হিসাব নাই। অফুরন্ত জোয়ার।

বাইরে বকুলগাছে পাখীর কিচিরমিচির শোনা গেল।

রাত পোহাল। ভোর হয়ে এসেছে।

॥ নয় ॥

ভোর রাত্রে কুমির ঘরে খলিফা দাশু শেখ উঠে বসেছে বিছানায়। চোখদুটো ঘুমে ঢুলু ঢুলু।

কুমি উঠে শুকনো বেলপাতা জ্বেলে একটা এনামেলের বাটিতে গরম জল চাপিয়েছে। চা করে দিতে হবে শেখকে। রোজ ভোরে চা খেয়ে এখান থেকে চলে যায় শেখ। এখন বেশি রাত্রে রোজ দাশু শেখই ওর ঘরে আসে। উঠে চলে যায় রাত থাকতে ভোরে। সন্ধ্যায় মাঝে-মধ্যে আসে দয়াল কবিরাজ। ওকে কোনমতে বারণ করতে পারে না কুমি। আর সবাইকে বারণ করে দিয়েছে। পরমা হালুইকরকে স্পষ্ট বারণ করে দিয়েছে কুমি। রাউজা, অন্নদা, কালীচরণ সবাইকে বারণ করে দিয়েছে।

এত মানুষের দস্তামী আর সহ্য হয় না কুমির।

আসবার মধ্যে এখন দাশু শেখ আসে রোজ রাত্রে। মাঝে মাঝেই বিশ-তিরিশ টাকা দেয় ওকে। প্রাণটা ওর খুব দরাজ। তাতে কুমির বেশ চলে যায়, বরং কিছু টাকা জমে।

চা চিনি দাশু শেখই এনে দেয় মাঝে মাঝে। কুমির চা তৈরি করে দিতে হয় রোজ ভোরে। ভাল লাগে না। শেখের জন্যে চা বানাতে তেমন মন আসে না কুমির। মনটা ওর পড়ে থাকে আরও কয়েক দণ্ড পরে চা করার ওপর। যখন মদন আসবে তার এখানে চা খেতে। দাশু শেখের দেয়া চা চিনি খরচ করেই মদনকে খাওয়াবে কুমি। কিন্তু তাতে যেন ও সুখ পায় বেশি।

খলিফার ঘুম ঘুম চোখ আর ঘড়ঘড়ে গলার আওয়াজ ওকে বিরক্ত করে তোলে আজকাল। ভাল লাগে না খলিফার ভ্যারভ্যারানি আর প্যানপ্যানানি।

আগে কিন্তু ভালই লাগত। ওর ওই ঢুলু ঢুলু চোখ আর গুমগুমা গলায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা ভালই লাগত। সব কথায় হাসি, আদর করতেও হাসি, গাল দিলেও হাসি, ভালই লাগত।

এখন মনে হয় মিচকা শয়তান। ওর টিপ্পটিপানি হাসন দেখলে গা জ্বলে যায় কুমির।

এমন ছিল না। মদনকে দেখবার পর থেকেই এমন হয়েছে। মদনের সঙ্গে তুলনাটা আপনি মনে এসে পড়ে। আর তখনি গায়ের জ্বালা ধরে এদের দেখলে। এরা কি পুরুষ! মর্দার মত ব্যাভার জানে! মর্দা হোল মদন। কেমন গম্ভীর দশাসই

শরীর। ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল। কথা বলে কম। যা বলে, মোক্ষম কথ বলে। অকারণ কৌতূহল নেই। পাঁচ কথায় কান দেয় না। এমন কি আজ পর্যন্ত মদন একবারও জিজ্ঞেস করে নি, কুমি কি করে, তার ঘরে কটা মানুষ আসে আর তারা কারা?

চায়ের জল নামিয়ে কুমি মুখ না ফিরিয়েই বলে,—মদন তাইলে গাঞ্জায় দম দিত্যাছে?

—হ।

মিটিমিটি হাসে দাশু শেখ।

কুমির মুখে হাসি আসে।—কোনদিন বান খেপী ধইর‍্যা পিট্টি লাগায়।

ঢুলু ঢুলু চোখে দাশু শেখ বলে,—পিট্টি খাওনের মাইয়া খেপী না। পিট্টি খাইলে তুই খাইবার পারস!

কুমিকে পিটুনী দেবে মদন! কুমির ঘুম ভাঙা চোখ জুলজুলিয়ে ওঠে। আহা, ওর হাতের পিট্টি খেয়েও আরাম। তাকে যদি খুব পিটুনী দেয় একদিন।

বলে,—ওয়ারে মদ খাওয়াইবার পার না?

মদ খাক মদন। মদ খেয়ে উত্তেজিত হোক, খেপীর কাছে ধাক্কা খেয়ে আসুক কুমির কাছে।

খলিফা তাকায়।—রইস। আলারে মদ ভাঙ সব খাওয়ামু। রইয়া সইয়া। কিন্তু এ কথায় তর কি কাম?

ত্যারছা চোখে তাকায় কুমি। চায়ের বাটি এনে দাশু শেখের হাতে দিয়ে বলে, —এডাও নি বুঝলা না খলিফা। আলায় নিশা কইর‍্যা খেপীরে নষ্ট করুক। ভয় স্থান আমাগো—

কথাটা মন্দ বলে নি কুমি। মদন ব্যাটা নেশার ঝোঁকে খেপীটাকে যদি নষ্ট করতে পারে, তবে দাশু শেখই প্রথম হাত বাড়াবে ওদিকে। তারপর কালাকান্দির ব্যাপারীর কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা বার করা যাবে। সবদিকেই লাভ। চোখদুটো আধবোজা করে চা খায় খলিফা। ঢুলু ঢুলু চোখে কি ভাবতে ভাবতে কুমির ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তখনো ভোর হয় নি। কাক ডাকে নি।

এরপর সকাল হয়, রোদ ওঠে। কুমি ঘর-দোর পরিষ্কার করে ফেলে। এক ফাঁকে বাজার ঘুরে আসে। তেল মাখতে বসে। ঘসে ঘসে পরিপাটি করে দেহটিতে তেল মাখতেও অনেকটা সময় নেয়। স্নান সেরে আসে। দয়াল কবিরাজ দয়া করে ওকে লক্ষ্মীর পেন্নামের মন্তরটা শিখিয়ে দিয়েছিল। মালসার ওপর আঁকা লক্ষ্মীর মূর্তির সামনে সেই মন্তরটা বার কয়েক বিড় বিড় করে প্রণাম করে। তারপর শাড়ি পালটে সিঁথিপাটি করতে অনেকটা সময়। তারপরে রাঁধনের জোগাড়।

এই যে এত কাজ করে কুমি। মনটা কিছু ছনমন করে মদনের জন্যে। কখন মদন আসবে—দাওয়ায় বসবে। চা চাইবে। চালতেগাছের ছায়ার দিকে তাকায় আর আন্দাজ করবার চেষ্টা করে মদনের আসবার সময় হোল কি না! চালতেগাছের ছায়া ওলবনের কাছাকাছি সরে গেছে কি না!

পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে তাকাল কুমি। মদন এলো বোধ হয়। শুকনো পাতার মড়মড়ে শব্দ। ছোট ইঁচড়টা কুটতে কুটতে ফিরে তাকায় কুমি। মরণ আমার। একটা কুকুর আসছে ছায়ায় ছায়ায় উঠোনে। কুকুরটা যেন ক্লান্ত, চারদিক তাকায় তারপর উঠোনে পা গুটিয়ে বসে জিভ বার করে হাঁপায়।

মরণদশা আমার। পোড়া কপাইল্যা কুত্তা!

বিড়বিড় করছিল কুমি। মদনের গলার আওয়াজ পায়। কি অইল। বকন-বাকন কার উপুর?

কুমির বুকের ভেতরটা ধড়াস্ করে ওঠে। এমন অকস্মাৎ মদনের গলার আওয়াজ পাবে ভাবে নি। আর আওয়াজ পেলেই বা বুকের ভেতরে ঢেঁকির পাড় পড়বে কেন? কে জানে, আজকাল এই রকম হয়।

প্রথম প্রথম ও নিজেকে সামলে চলত। হাজার হোক, খেপীর ঘরের মানুষ—তার এমন কু-দৃষ্টি পড়াটা কি উচিত। খেপী যদি কখনো টের পায়। কি মনে করবে? আর কি তাকে এমন প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে পারবে? খেপী তাকে সত্যি ভালবাসে। সে বোঝে, খেপীর ভালবাসা বুঝতে পারে, সব উজাড় করে দিয়ে ভালবাসতে জানে খেপী। কিন্তু সে কেন মদনকে নিয়ে এমন সব কারখানা করছে মনে মনে।

মনে মনে এমন কারখানা ঘটছে যে বাইরে তা বেরিয়ে পড়তে দেরি নেই আর।

ও কোনমতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না আজকাল।

মদনের পায়ের আওয়াজ পেলে বুকের ঢিপঢিপানি। শত কর্মের মধ্যে মদনের ওপর পড়ে থাকে বারো আনা মন।

শুয়ে শুয়েও মদনের ভাবনা। মদনের কালো বাবরি চুলে বিলি কাটবার কল্পনা করতে করতে একটা আমেজ আসে। ভাগ্যি মনের কথা বাইরের মনিষ্যি টের পায় না। তা যদি পেত তবে কি কাণ্ডটাই না হতো।

মদন তার কাছে আর আসত না কখনো। এ কথাটা বোঝবার মত বুদ্ধিসুদ্ধি তার আছে যে মদন তাকে কখনো তেমন মান্যি ভালবাসা দিতে পারবে না। সে নিজে কি! সে কি জানে না, সে কত ছাইকপালী আবাগী! মদন যদি জানতে পারে তার এই ভাবসাব মনে মনে কৌতুক লাগবে। ঘেন্নায় জন্মে আর তার কাছে আসবে না।

বেশ ছিল কুমি। তেলে জলে চুকচুকিয়ে মনের সুখে দিন কাটাচ্ছিল। কি কুক্ষণে যে খেপীর সঙ্গে সায়রের মেলায় গেল। আর মদনকে এনে জোটাল খেপী!

এক মস্ত শ্বাস ফেলে কুমি।—এত দেরী অইল ক্যান?

মদন এসে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে দাওয়ায় বসল। হাসল,—কারে গাইল পাড়তাছিলা?

কুমি ত্যারছা চোখে তাকাল।—তোমারে।

—ক্যান, আমি কি করছি?

—কিছু করো না ক্যান? বইসা বইসা গাবাও। এত বড় মর্দা। বইসা বইসা থাকো কি কইর‍্যা?

কথাটা মিথ্যে নয়। এত বড় জোয়ান মানুষটা মদন। এমন করে শুয়ে-বসে থাকে কি করে? কাজ নেই কর্ম নেই।

—ভিক্ষা করবা না। গাঁওনা চুলায় গ্যাছে। খালি খাওন আর বইস্যা থাকন! আ রাম রাম! লজ্জা পিত্তিও নি মানষের থাকে। তোমার তাও নাই।

কুমি বেশ কড়া কথা শোনাচ্ছে মদনকে। একটা কথাও কিন্তু মিথ্যে নয়। কোন প্রতিবাদ করবার জো নেই। সত্যি মদন কিছুই করে না। একটা কিছু না করে মানুষ থাকে কি করে?

এমন একটা আক্রমণের জন্যে মদন প্রস্তুত ছিল না। মুখটা ওর বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বাইরে উঠোনে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে,—কি করুম?

—ক্যান কত শত কাম রইছে, কামের নি অভাব আছে?

মদন কথা বলে না। ত্যি, কথাটা বড় খাঁটি বলেছে কুমি। বসে বসে এমনি করে আর কত কাল থাকা যায়! কতদিনই বা এভাবে ভাল লাগবে? প্রশ্নটা এতদিন এমন স্পষ্ট করে তার মনে হয় নি দিন কাটছে তো কাটছে, রাত পোয়াচ্ছে তো পোয়াচ্ছে। কেমন যেন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল মদন। হয়তো বা খেপীর সঙ্গে থেকেই ওর এমনটা হয়েছিল। খেপী যেমন গা ভাসিয়েই আছে। যেন স্রোতের মুখে শোলা। মদনও তেমনি একটা ভাব নিয়েছিল। বেশ একটা মজাও পাচ্ছিল। খামুদামু গান গামু, নাইচা বেড়ামু—খেপীর কথাগুলোই যেন মনের ভেতরে ভাবনার দড়িদড়া আলগা করে দেয়। কে অত ভেবে মরে?

কুমি কিন্তু উল্টো গাইছে, আর কুমির কথাটাই যেন বেশি সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

—খেপীর ফান্দে পড়লে পরকালডা তোমার ঝরঝইয়া অইব। কইয়া রাখলাম।

কুমির ত্যারছা চাউনী আরও ছুঁচোল হয়।

জলের গেলাস আর একবাটি মুড়ি আর কদমা এনে রাখে মদনের সামনে।

—আমার কোন কাচাকলা, তোমারে নি ভাল লাগে, তই কইলাম ।

মদন তাকাল। এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল।

কুমি হাসল। বাঁকা কেমন একটা নষ্টামীর হাসি। এমনি হাসলে কুমিকে বেশ দেখায়। কালো কুচকুচে ভারী মুখখানা, রক্তাভ চোখ দুটো, খাট মাংসল দেহখানা। সব মিলিয়ে কুমিকে এই হাসিটাই মানায়। যাকে যা মানায়। যার যা সাজে।

—খেপী কৈল তোমারে ভাউরা কইর‍্যা ফালাইব।

একটার পর একটা কথা মদনের কানে ছুঁচোল হয়ে ঢুকে ভেতরে বিঁধতে থাকে।

খেপীর কাছে থাকলে তার পরকাল ঝরঝরে। সত্যি তো। তার কি লাভ? লাভ যা কিছু নিশ্চয় খেপীর! সে বাউল সাধন নেয় নি। নেবার কোন বাসনাও তেমন নেই। খেপীর বাউলামী তার ভাল লাগে। খেপীর নাচন, গাওন, হাসন ভাল লাগে। এই ভাল লাগার জন্যে কত কাল সে বিদ্যাধরীর কাছে এমনি ভেড়ুয়ার মত থাকতে পারে। খেপী তাকে ভেড়ুয়া করে তুলেছে—কুমির এ কথাটাও কিছু তো মিথ্যে নয়।

ধীরে ধীরে এর পরে মানুষ বলবে, খেপী একটা ম্যাড়া পুষেছে। মদন ম্যাড়া। খেপীর ঘাড়ে বসে বসে খায় আর ঝিমোয়। দুনিয়ায় আর কোন কর্ম নেই।

কুমির ভেতরটা যেন গরম হয়ে উঠেছে। কালো মুখে কিছু কিছু ঘাম। চা খেয়ে একটা দোক্তা দেয়া পান মুখে পুরল কুমি, পানের পিক ফেলে আবার হাসল ধারাল হাসি। মদনের ভেতরের কোন জমাট ভাব যদি থেকে থাকে, তবে তা কেটে খান খান করছে কুমির হাসি।

বিদ্যাধরীর ছায়াটা যেন কেটে কুঁচি করতে চায় কুমি।

মদন মুড়ি শেষ করে চা খেল। তাকাল কুমির দিকে। মুখটা ওর বিষণ্ণ। নিজের ভাবনাটা যেন কুমির সামনে এই মাত্তর বুড়বুড়িয়ে উঠেছে ওর মনে। সত্যি মর্যাদা তার সবই গেল। যাত্রাদলের কিষ্ট মদন ভুঁইয়া। এক ডাকে যাকে পঞ্চাশ গাঁয়ের মানুষ চিনত, সে আজ এক খেপীর পাল্লায় পড়ে ম্যাড়াকান্ত বনে যাবে—রাম, রাম!

কুমি জুত করে বসেছে দাওয়ার ওপর।—হাটখোলায় দাশু খলিফার দোকান চিন?

—হ।

—ওয়ার পিছু ধরো। খলিফা মানুষ ভাল। কাজকাম জুটাইয়া দিব।

মদন চুপ করে রইল। ভাবল, কুমি জানে না, সে দাশু শেখের দোকানে মাঝে

মাঝেই যায়। দিন কয়েক আগে গাঁজায় দম দিয়ে ফিরেছে অনেক রাতে। দাশু শেখ এখন তার এক কলকের সাঙ্গাত। দাশুকে কি একটা কাজ-কর্মের কথা বলবে মদন? সে ধরণের কোন কথা আজ পর্যন্ত বলে নি ও।

দাশু শেখ মানুষ সত্যি ভাল। ঢুলু ঢুলু চোখ। শান্ত মোটা গলা। কোন কারণে উত্তেজিত হয় না। রাগ করে না। ভারি ঠাণ্ডা মানুষটা। কে জানে ও হয়তো তার উপকার করলেও করতে পারে।

থম্ মেরে বসে রইল মদন। উঠোনের কুকুরটা তখন ছায়ায় বসে ঝিমোচ্ছে। ও আজ আর উঠান থেকে উঠবে না। দুপুরে কুমির খাওয়া হবার পর এঁটো ভাত খেয়ে তবে চলে যাবে।

টিপ্ করে করে একটা আওয়াজ হোল। ঘরের পেছনে বোধ হয় চালতে পড়ল একটা। পচে পোকায় খেয়ে, মাঝে-মধ্যে অমন টিপ্-টাপ্ করে চালতে পড়ে।

—আইজ রাইতে আমার ঘরে খাইও।

নেমন্তন্ন কবে বসল কুমি।

মদন এতক্ষণে একটু হাসতে পাবল। বলল—ক্যান?

—কলুবাড়ি পাঠা কাটা অইব। মাংস আইন্যা রাঁধুম।

মাংস! বহুদিন মাংস খায় নি মদন। আগে যাত্রাদলের সঙ্গে কোন জমিদারবাড়ি-টাড়ি গেলে খাসী কাটা হোত। দুপুরে খাসীর মাংস আর খাসীর তেলের বড়া। খেতে খেতে বেলা চারটে। তারপর বিশ্রাম। সন্ধ্যের পর থেকে সাজ সাজ রব। জমিদার বাড়িব গান প্রাণ দিয়ে গাইতে হয়।

মাংস অনেক দিন খা য়া হয় নি।

—আসুম। ঝাল কইর‍্যা রাইধ কৈল।

হাসল কুমি। হাসিটার ভেতরে প্রাণ ছিল না।

ভাবছিল, খেপীকে নেমতন্ন করল না কুমি। শুধু মদনকে করল। এটা কি ঠিক হোল? নেমতন্ন সে খেপীকে কখনো করে নি। একবার শুনেছিল, খেপী কোথাও নেমন্তন্ন খায় না। ভিক্ষার অন্ন ছাড়া অন্য অন্ন খায় না। ভয়ে ভয়ে ও কখনো খেপীকে নেমন্তন্ন করে নি।

মনে মনে কিন্তু কুমির বিশ্বাস ছিল, নেমন্তন্ন করলে খেপী তার মুখের ওপর না বলতে পারত না। নিশ্চয় তার ঘরে এসে খেত। খেপীকে না বলে মদনকে খেতে বলা—কেমন যেন খচ্ খচ্ করছে মনটা।

মদনকে অনেক আগেই খাবার নেমন্তন্ন করত। কিন্তু ওর একটা ভয় ছিল। মদন তার কথা সব শোনবার পর তার হাতে খাবে কি-না! আজ কথায় কথায় কেমন

একটা সাহস ভরসা পেয়ে গেল। ও যেন বুঝতে পারল—তার হাতে খেতে মদনের কোন আপত্তি হবে না। ঠিক তাই। এক কথায় রাজী হোল।

তাই আনন্দে বুকের ভেতরটা ঢুপ্ ঢুপ্ করছে। আজ রাত্রে মদন তার ঘরে খাবে। ঝালে তেলে লঙ্কায় সরষেয় মজিয়ে রান্না করতে হবে আজ—আজ আর সন্ধ্যার পর থেকে কোন মানুষ নয়। কেউ নয়। মদন আর কুমি।

কিন্তু খেপীকে কি কথাটা বলা উচিত নয়? কেন, কি দরকার! মদন কি খেপীর সাতপাকের সোয়ামী। এই যে রোজ মদন তার ঘরে চা খেতে আসে। সে ঘুণাক্ষরেও খেপীকে একথা বলে নি। বলবার কোন প্রয়োজন মনে করে নি।

রোজই বকুলতলার ঘাটে যেতে-আসতে দেখা—চান করতে দেখা—জল তুলতে দেখা—না, মদনের কোন কথা সে খেপীর কাছে বলে না। বলতে পারে না। কেমন যেন নিজেকে ছোট ছোট মনে হয়। খেপী যদি বা কখনো মদনের কথা তোলে কুমি হুঁ-হাঁ করে কথা এড়িয়ে যায়।

—পিরান ছিড়া ফালা ফালা। গরুতে গুতাইছে তর বোগদা মদনেরে।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে খেপী।

কুমি ওর হাসিতে যোগ না দিয়ে মুখ নিচু করে আঁচল নিংড়োতে নিংড়োতে কথাটা পাল্টায়। —অলো, পদ্মদিদির কি পোলা অইছে। শুনছস?

এমনি করে মদনের প্রসঙ্গ ও বরাবর এড়িয়ে গেছে। সহজ হাসি সহজ কথায় মদনের সম্পর্কে ও আলোচনা করতে পারে না। খেপী ওর কথা তুললেই কুমির ঠোঁট বেঁকে। দৃষ্টি ত্যারছা হয়। কোনমতেই সহজ হতে পারে না।

এতদিন পরে আর পারল না কুমি। মদনের দিকে সরাসরি হাত বাড়াল। খেপী কি ভাববে সে কথাটাও ভাবতে চাইল না।

মদন নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশিই হোল। প্যাজে ঝালে রান্নার গন্ধ পেয়ে মনে মনে অনেক দিন ইচ্ছে হয়েছে কুমির এখানে একদিন খায়। কিন্তু মুখে বলতে পারেনি। কুমির রান্নার গন্ধই আলাদা। বিদ্যাধরী রাঁধে। কিন্তু প্রায়দিনই সেদ্ধ-পোড়া। কোনদিন যদি কলু কিছু তেল দিয়ে গেল বিদ্যাধরীকে, বা কেউ তেলপড়া করিয়ে নিতে এসে একটা সিধে দিয়ে গেল, সেদিন দু-একপদ ব্যঞ্জন হোল। কোনদিন যদি জেলে মাছ দিয়ে গেল তো হোল একটু মাছের ঝাল। তবে হ্যাঁ দেয়। মাঝে-মধ্যেই তেলটা মাছটা, লাউটা, বেগুনটা, ক্ষীরটা, চাঁছিটা দিয়ে যায় ওকে। সবটাই খায় মদন। খেপী খুব কম খায়। খাবার পরিমাণটা ওর এত কম যে মদন প্রথম প্রথম ভাবত, সে এসেছে বলে বোধ হয় তার খাওয়ায় কম পড়ছে। তা নয়। পরে বুঝল ওর খাওয়াই কম। দু'গা ভাত একটা কাঁচালঙ্কা ব্যস্। এই হলেই একটা দিন রাত কাবার। অবাক

কাণ্ড! এত কম খেয়ে এত নাচন-কোঁদন। এত আওয়াজ তোলা, ঘুরনা খাওয়া। কি করে পারে বিদ্যাধরী। বিদ্যাধরীর সবই অদ্ভুত।

অত কম খেয়েও গায়ের রঙখানা কাঁসার মত নিভাঁজ। লাবণ্য উপচে পড়ে অঙ্গে প্রতিটি দোলনে। সেদিন ভোর রাত্তিরে বিদ্যাধরীর যে রূপ দেখেছিল মদন—আজ পর্যন্ত ভুলতে পারেনি। একটা সুখস্বপ্নের মত চোখে লেগে আছে। মদন ভুঁইয়া যাত্রাদলে গাইত—

'ও চন্দ্রবদনী রাধা—'

চন্দ্রবদন যে কাকে বলে জানত না। মুখে রঙ মেখে একটা ছোঁড়া রাধা সেজে দাঁড়াত। তাকেই উদ্দেশ করে বলা—ও চন্দ্রবদনী রাধা……আর রাম রাম। চন্দ্রবদনী কাকে বলে জীবনেও জানতে পারত না যদি না সেদিন বালু বালু জোছনামাখা বিদ্যা-ধরীকে দেখত।

—তুমি আমার সবখানে।

হায় রে! পরাণডা মোচড় দেয়—য্যান আউর চিপডায়। টস্‌টসাইয়া রস বাইয়া পড়ে বুকের মধ্যে। কথাখানার মানে কি কে জানে—কিন্তু কথার রসে হাবুডুবু।

নাঃ! বিদ্যাখেপীর তুলনা নেই। সেদিন রাত্রের মত বিদ্যাধরীকে আর একবার চোখ মেলে দেখবার জন্যে আর একবার তার ওই আকাশ-ভাঙা কথা শোনবার জন্যে আরও পাঁচ বছর এমনি করে অপেক্ষা করতে পারে মদন। বিদ্যাধরীকে ভাবতে বসলে সংসার ভুল হয়ে যায় মদনের। কুমি তো কোন ছার!

পশ্চিম আকাশখানা কাকের ডিমের মত ধোঁয়াটে অন্ধকার হয়ে এল। বাতাস দিচ্ছে জোরে। ঠিক দুপুরে এমন মেঘ করে এল। সূর্য মেঘের আড়ালে একেবারে চাপা। অন্ধকার করে এল চারধার। বকুলগাছের ডালপালার ঝপঝপানি শোনা যাচ্ছে।

ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মদন। সাঁই সাঁই করে হাওয়া দিচ্ছে। ঘরের ভেতরে যাবে কি-না ভাবছে মদন। কিন্তু বিদ্যাধরী এখনো এল না। সে কি করে যায়?

এগিয়ে গেল মদন। বাতাসের উজানে যেতে জোর লাগে। কাপড়খানা ফুলে ওঠে। তবু এগিয়ে এল মদন বকুলতলার দিকে। বিদ্যাধরী এখনো এল না। ঝড় উঠে এল। অসময়ে ঝড় এল।

উই যে—উই মাঠের আল ধরে এগিয়ে আসছে বিদ্যাধরী। চুল উড়ছে আর ফুলে উঠেছে শাড়ির আঁচল। নিটোল টান-টান দেহখানা ধনুকের মত বেঁকে গেছে। ধু-ধু মাঠ আর আকাশের নিঃসীম মেঘের মাঝখানে শুধু বিদ্যাধরীর টান-টান দেহখানা ছোট একখানা ছবির মত।

হায় রে রূপের কথা! পিকিতি যেন বিদ্যাধরীর অঙ্গে সঙ্গে রূপ জোগায়। নইলে এমন মাঠে এমন মেঘে এমন মেয়ে। মদন থ' মেরে যায়। চোখের পলক পড়ে না।

হোই আওয়াজ তুলেছে খেপী। সাঁই সাঁই হাওয়ার সঙ্গে আওয়াজ।

ছলবল ছলবল নদীর জলে
তুফান উঠে ভারী।
গুরগুরাইয়া কম্প উঠে
তুমি গো কাণ্ডারী,
অ সাই তুমি গো কাণ্ডারী।

সাঁই সাঁই বাতাসে গাছগাছালি যেন উপড়ে পড়ছে। গুম-গুমাইয়া মেঘ ডাকে। একছুটে মাঠে নেমে পড়ে মদন। মাঠের মধ্যে গিয়ে বিদ্যাধরীর হাতখানা টেনে ধরে। বাতাসের উজান ঠেলে এগিয়ে আসে দু'জন।

॥ দশ ॥

মন ভাল নেই মদন ভুঁইয়াব।

আজ ক'দিন ধরে যেন মনের ভেতরটা আঁচড়-পাচড় করছে। নিজেকে আর সামাল দিতে পারছে না কোনদিকে। টালমাটাল অবস্থা। দুদিকের জবর টানে প্রাণ যায় যায়।

কি কুক্ষণেই যে সেদিন রাত্তিরে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিল মদন। কুমির ঘরে যে অত ভরাট অন্ধকার কে জানত? মনটাও ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। যোগাযোগ চমৎকার। সেদিন রাত্রে খলিফার ঘরে ছোট কলকের বদলে বোতল বেরোল। দিশী চোলাই মদ। মাটির তলায় জালা বসান। তার ভেতর থেকে বাঁশের চোঙায় করে তুলে বিক্রি করে দাশু শেখ। যেমন গন্ধ তেমনি ঝাঁজ। সেদিন বসল সুরাচক্র।

খলিফা দাশু শেখ ব্যবসায় বড় পোক্ত। বাজারে যা দাম, তার চেয়ে কম দামে মাল দেয়। কেনে তার চেয়ে অনেক কম দামে। আবগারী খাজনাটা ফাঁকি দেয়। তার জন্যে দু-চার পয়সা চৌকিদার পেয়াদার হাতে যে না গুঁজে দেয় তা নয়। অনেক সময় পয়সার বদলে খানিকটা মাল খাইয়ে দেয়।

ঘুম-ঘুম চোখে টাকা নিল খলিফা আবার সেই মদ নিজেও খেল। পরের পয়সায়।

গাঁজার চেয়ে এই পদার্থটি মদনের অধিক প্রিয়। তাই মাটির তলায় জালার সন্ধান পেয়ে আর সঙ্গীসাথী পেয়ে ও বেশ ডগমগিয়ে উঠল। সেদিন খেয়ে ফেলল একটু বেশি পরিমাণ।

যাত্রাদলে গলা ভেজান অভ্যেস ওর ছিল, তবে রোজ নয় মাঝে মধ্যে। অধিকারী খেত রোজ। ব্যাটা দলের পাওনা টাকার অর্ধেকটাই গলায় ঢালত। পেট মোটা। হাতে ছিল একটা তামার তাগা। দেখলেই মনে হোত—ব্যাটা শয়তানের নাতি!

অনেকটা খেয়ে ফেলেছিল মদন, তার আর একটা কারণ মনখানা ওর ভাল ছিল না।

কুমির কথাটা ও ভুলতে পারছিল না। খেপী কৈল তোমারে ভাউড়া করব। সে ভেড়ুয়া হবে? লোকে যে দুদিন পরে তাই বলবে না, এমন কথাই বা কে বলতে পারে! এমনভাবে খেপীর কবলে দিন কাটান, কেমন একটা অতৃপ্তি লাগে।

আবার তৃপ্তিই বা কম কিসে। সেদিন দুপুরের ঝড়ে প্রাণে যে কি আস্বাদই পেল। প্রাণের নাচন আর উল্লাস কাকে বলে ও জানতেও পারত না খেপীকে সেদিন মাঠের আর মেঘের পটে না দেখলে। সে পটখানা পরাণটা কানায় কানায় ভরে রেখেছে। বিদ্যাধরীর তুলনা নেই। আর সেইজন্যেই বিদ্যাধরীকে ও ধরতে পারছে না। ছুঁতে পারছে না। বিদ্যাধরী যেন বাতাস শনশনিয়ে উজান বয়ে চলেছে। তাকে ধরা কি মদনের সাধ্য আছে।

কুমি রক্তে-মাংসে-গড়া মেয়েমানুষ—আর বিদ্যাধরী উজান হাওয়া।

দুটো টানে প্রাণটা টনটনিয়ে উঠছে আজ ক'দিন ধরে। হৃদয়খানায় রক্ত ঝরছে।

সেদিন রাত্রে কুমির থাপ য় তার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

চোলাই মদের নেশা জমবার মুখেই সে গিয়েছিল কুমির ঘরে নেমন্তন্ন রাখতে। মাঠের বাতাসে নেশাটা জমেছিল। ঘরে ঢুকেছিল বোধ হয় টলতে টলতে। চৌকাঠে এসে হোঁচট খেতেই কুমি ওকে ধরে খিল খিল করে হেসে উঠল।

—নিশা করছ? হায়রে কপাল, এমুন নিশা মান্‌ষে করে!

খিলখিল করে হাসছিল কুমি মনের সুখে। খলিফা তার কথা রেখেছে। মদনকে পেটভরে মদ খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এখন মদন ভুঁইয়া আর একটা বুনো ষাঁড়ে কোন তফাৎ নেই। কুমি সুখের নাগাল পেল। নিজের সুখ নিজে বানাল। নিজের বারত নিজে বানাল।

—গেছিলা কোয়ানে?

টকটকে লাল চোখ মেলে তাকাল মদন। কুমির দেহের স্পর্শটা ওর নেশাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ঘরে চৌকিতে বসে মদন তাকাল কুমির দিকে। কুমির চোখদুটো যেন দুটো থাবার মত উদ্যত। ধারাল নখের মত ছুঁচোল। মদন হাসবার চেষ্টা করল।

—খলিফার দোকানে!

—সেয়ানি মদ পাওয়া যায়?

মদন বুঝতে পারে না, কুমি কি বলতে চায়। কুমি কি জানে না, সেখানে চোলাই মদ পাওয়া যায়!

—এট্টু আইন্‌বার পার নাই, আমি খাইত্যাম।

খিলখিল করে আবার হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমি! মদন টান টান হয়ে বসবার চেষ্টা করে। বলিহারী, কুমি মদও খায়। মেয়েমানুষ একখানা—যেমন জাঁহাবাজ তেমনি জমাট।

নেশার ঘোরে মদন কি যে ভাবল, কি যে খেল, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে রাত অনেক হয়ে গেল। টলতে টলতে বকুলতলার দিকে যখন আসছিল, কুমি ওর হাত ধরেছিল। পাছে ও পড়ে যায় বা পথ ভুলে যায় তাই বকুলতলার পাড় পর্যন্ত ওকে হাত ধরে এনে পৌঁছে দিল। ফিরে ও এল, কিন্তু হৃদয়খানা তখন রক্তাক্ত। কুমির থাবলায় ও তখন বিক্ষত হয়ে গেছে।

কি করে যে কি হলো। ভালো করে বোঝবার আগেই ঘটনাগুলো যেন পর পর ঘটে গেল। কেনই বা মদ খেল আর কেনই বা কুমির কাছে ওই অবস্থায় সেদিন নেমন্তন্ন খেতে গেল। কিছু ভাল করে বুঝতেই পারছে না মদন।

রাত্তিরে নেশার ঘোরে একবার শুধু চমকে উঠেছিল কুমির ঘরে। বাইরে থেকে একটা ডাক শুনতে পেল। কুমি চৌকি থেকে নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি। দোর খুলে বাইরে গেল। দাওয়া থেকে কথাগুলো ওর কানে ভেসে আসছিল।

—কেডা, খলিফা আইছ?

—হ। ঘরের দুয়ার বন্ধ ক্যান?

—দেহখান আইজ জুত নাই। আইজ তুমি ঘরে যাও।

—রাইত দুফুরে ঘরে যামু। তার থিক্যা এয়ানে বড় ঘরে শুইয়া থাকি।

—না। আইজ চইল্যা যাও। কাইল আইস।

বলে কুমি ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিল।

তখন নেশাটা পাতলা হয়ে এসেছিল। চৌকির ওপর থেকেই মদন জিজ্ঞেস করল,—কেডা আইছিল?

—তা দিয়া তোমার কাম কি?

কুমি যেন ধমক দিল ওকে।

মদন শুনেছিল কথাগুলো। বুঝেছিল, খলিফা দাশু শেখ এসেছিল। কুমি তাকে তাড়িয়ে দিল। কুমির শরীর ভাল নেই। আজ তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। কাল আসতে বলে দিল। সবই শুনতে পেয়েছিল মদন। তবু ও তখন কুমির বশে। তাই ধমক খেয়ে চুপ করে যেতে হোল।

আরও রাত বাড়ল। ফিরে এল মদন বকুলতলার ঘরে। সবটা পথই কুমি ওকে হাত ধরে এগিয়ে দিল। ওকে ছেড়ে দেবার আগে অন্ধকারে ফিসফিস করে বলল,—খেপীরে কৈল কিছু কইও না।

ঘরে চলে এল মদন। ঘরের ঝাঁপ খোলা ছিল। বিদ্যাধরীকে বাইরে দেখতে পেল না। বোধ হয় রান্নাঘরের ভেতরে ছিল বিদ্যাধরী। জেগে ছিল, না ঘুমিয়ে ছিল কে জানে। দেখবার কোন আগ্রহ হোল না ওর।

ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করল। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। স্তব্ধ অন্ধকার ঘরে মাচার ওপর শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে ছটফট করছিল মদন। ভেতরটা অন্ধকার। বিদ্যাধরীকে সে অন্ধকারে চেষ্টা করেও আর দেখতে পাচ্ছে না ও। কেমন একটা যন্ত্রনায় কুঁকড়ে শুয়ে রইল মদন। জ্বালা আর যন্ত্রনা!

কুমির কুচকুচে কালো দেহের অন্ধকারে বিদ্যাধরীকে আর দেখা যাচ্ছে না। কুমির দেহেব অন্ধকার ওকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। সে অন্ধকারটা কোনমতেই ও ভেদ করতে পারল না।

বড় যন্ত্রণায় রাত কাটল।

পরদিন বেলায় উঠল ঘুম থেকে। চোখ মেলতে ভয়-ভয় করছিল। বিদ্যাধরীর দিকে ও তাকাবে কি করে? কি করে ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলবে? ভেতর থেকে যেন কাঁকড়ার দাড়ার কামড়ে ওর ভেতরটা ছোট করে ফেলেছে। আকাশ থেকে গুটিয়ে এনে ধরে রেখেছে কুমির ঘরে।

বেলা কত হয়েছিল কে জানে! একতারার বঙাবং আওয়াজ এল ঘরে।

খেপী আওয়াজ তুলেছে—

গুরু তোমার নিশান রাখা হইল দায়।
মানুষ আইন্যা বসাইল পৈঠায়।
মানষে মানুষ চিনল না গ,
হইল বিষম দায়,
অ সে ক্ষীর ফ্যালাইয়া মত্ত হইয়া
পাত্তরে খামচায়।
গুরু তোমার নিশান রাখা হইল দায়।

কাঁকড়ার দাড়ার কামড়ের মত এক-একখানা কথা পরাণটাকে টেনে ধরেছে, রক্তাক্ত করে তুলছে। বিদ্যাধরীর ভয়ে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না মদন। গুটিসুটি হয়ে চোখ বুজে রয়েছে।

বিদ্যাখেপী, চিনে মেকী, অন্ধ হইল
কাঁচের ঘায়।
গুরু তোমার নিশান রাখা হইল দায়।

খেপীর আওয়াজে বিষ ঢালে পরাণের পরতে পরতে। সর্বাঙ্গে বিষের ব্যথা। মদন একভাবে শুয়ে রইল। একটু নড়তে পর্যন্ত পারছে না। নড়তে চাইছেও না। বিদ্যাধরী বেরিয়ে গেলে উঠবে মদন, তার আগে ও কিছুতেই উঠতে পারবে না।

হলোও তাই। বিদ্যাধরী বেরিয়ে গেল রোজের মত সাঁই নামে ঘুরনা দিতে। ওকে ডাকল না। একটা কথাও বলল না। কাল রাত্রে কেন ওর আসতে দেরি হয়েছিল, কখন এসেছিল, কোথায় গিয়েছিল, কিছুই জিজ্ঞেস করল না।

এইটে মদনের আরও খারাপ লাগল। বিদ্যাধরী যদি ওকে ডাকত, রাগ করত, কৈফিয়ৎ চাইত, ও বেঁচে যেত। কিন্তু কিছুই করল না সে। বিয়ানে উঠে চুপ-চাপ বেরিয়ে গেল। যেন কিছুই হয় নি।

কিন্তু এত বেলা পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠছে না দেখে বিদ্যাধরী তো ডাকতে পারত, তার কোন ব্যারাম হোল কি না, একটু চিন্তিত হতে পারত। না। বিদ্যাধরী ভাবনা-চিন্তা করনের মেয়ে নয়। বিদ্যাধরী অদ্ভুত।

ব্যাপারখানা কিন্তু ভাল লাগে না মদনের। ওর কেমন রাগ হয় বিদ্যাধরীর ওপর। একটা খোঁজ-খবর নেয়া দরকার মনে করল না। কাল রাত্রে কি খেয়েছে, কেমন ছিল, কিছু জানবার প্রয়োজন মনে করল না।

সে কি করেছে না করেছে সেটা কোন কথা নয়। কিন্তু বিদ্যাধরীর এই অবজ্ঞাটাও সহ্য হয় না। বিদ্যাধরী কেন তার ওপর রাগ করল না। এই জন্যেই ও বিদ্যার ওপর রাগে ফুলে উঠল। মেজাজটাও ভাল ছিল না। রাগ যেন মাথায় চড়ে বসল। উঠে বসে বিড়ি ধরিয়ে রাগে গোমরাতে লাগল। এতক্ষণের ভয় যন্ত্রণা সঙ্কোচ সব যেন রাগের তাপে গলে গিয়ে ওর মাথায় বিষাক্ত রক্তের মত চড়ে বসল।

উঠল বিছানা থেকে। স্নান সেরে সোজা চলে গেল কুমির ঘরে।

কুমি যেমনটি তেমনি। আজ যেন মুখখানা আরও ফুলো ফুলো, পানের রসে ভেজা ঠোঁট।

চালতে বাগানের ছায়ায়-ছায়ায় তেমনি ঠাণ্ডা দাওয়ায় বসে জিরিয়ে সাতিয়ে ছড়িয়ে মেলে বসে তরকারি কুটছে।

ভেতরে রাগ চনচন করছে তাই কোন সঙ্কোচ এলো না মনে। নইলে কুমির কাছে আজ সকালে যেতে নিশ্চয় বাধো-বাধো ঠেকত মদনের। ভুরু দু'খানা ফিঙের ল্যাজের মত বেঁকিয়ে দাওয়ায় বসল মদন।

—দেহ নি ভাল আছে?

বাঁকা হেসে ত্যারছা তাকাল কুমি।

মদন কোন উত্তর দিল না। গোঁজ হয়ে বসে রইল।

—গোসা হইল কার উপুর?

মদন এবারেও কোন কথা বলল না।

কুমির হাসি আর নরম মিঠে কথা শুনে বিদ্যাধরীর ওপর রাগটা ওর আরও চড়ে গেল। কি ভেবেছে খেপী। সে এমন ভাবে অবজ্ঞা করবে। তবু সে খেপীর কাছেই যাবে আবার। খেপীকে নইলে তার চলবে না!

ধেত্তরি, আর ভাবনের চিন্তনের কাম নাই। সে চলে যাবে এখান থেকে। আর থাকবে না।

কুমি মুড়ি আব চা এনে দিল। চা মুড়ি খেয়ে একটু যেন ঠাণ্ডা মনে হোল নিজেকে।

ওর বার বার ইচ্ছে হোল, ও বলে আজ দুপুরে ও কুমির কাছে খাবে। কিন্তু মুখে বলতে পারল না। বাত্তিরে আজ আবার আসবার কথা বলবে ভাবল, তাও বলতে পারল না। কেমন বাধো-বাধো লাগল। আর মনে পড়ল গত রাত্রে কুমি খলিফাকে বলেছিল, আজ রাত্তিরে আসতে।

কুমি দাওয়ার পাশে রান্না ঘরে ঢুকল। মদনকে বোধ হয় আর বেশি ঘাঁটাতে সাহস করল না।

মদন কিছু সময় একা একা বসে সেদিন চলে এল।

এবপর থেকে বিদ্যাধরীর সঙ্গে ও ভাল করে কথা বলে নি। বিদ্যাধরী যেমন সহজ তেমনি সহজ। হেসেছে ওর দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে, খেতে দিয়েছে, রাত্তিরেও খাবার ঢেকে রেখেছে ঘরে। নিজে এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়েছে। মদন যে কেন কথা বলছে না, কেন যে মদন মুখ ভার করে বসে আছে, কিছুই যেন দেখছে না। জানছে না। নিজের ভেতরে নিজে বাস করছে। বাইরের বসবাস ওর কাছে যেন আলগা-আলগা। কি এল আর কি গেল, কিছুই যেন কিছুই নয়। হাল-বৈঠা আলগা করে নৌকোর বাদাম তুলে বসে আছে নিশ্চিন্তে।

কি যে অদ্ভুত টান বিদ্যাধরীর! মদন তবু চলে যেতে পারছে না। তবু কেমন যেন মাঝে মধ্যে বিদ্যাধরীর দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। দুটো কথা বলতে ইচ্ছা

হয়। ওর আওয়াজ শোনবার জন্যে মনটা ফণা ধরে থাকে। ভাল লাগে। কোথায় যে কতটুকু ভাল লাগে, কিসে যে ভাল লাগে, বোঝে না মদন।

মনটা মদনের ভাল থাকে না, যখন একা থাকে।

ক'দিন হাটখোলায় যায় নি মদন। মাঠে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ ও ভাবছে একবার হাটখোলায় যাবে।

মনখানা কোন মতেই বাগে আনতে পারছে না।

বিদ্যাধরীও টানে, কুমিও টানে। পরাণটা ওর টনটন করে যন্ত্রণায়। হৃদয়টা বুঝি রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

হাটখোলায় যাবে আজ মদন। একটা হেস্তনেস্ত কিছু করে ফেলতে হবে এবার।

সন্ধ্যের কিছু পরেই খলিফার দোকানে গিয়ে হাজির হোল মদন।

খলিফা দাশু শেখ ঢুলু-ঢুলু চোখে তাকাল ওর দিকে।—কয়দিন আস নাই ক্যান ?

কোন উত্তর দিল না মদন। মুখখানা ওর শুধু গম্ভীর নয়, কেমন শুকনো শুকনো। বিষণ্ণ দুটো চোখের দৃষ্টিতে আঁট নেই। আস্তে আস্তে মাদুরটার ওপরে বসল।

তখনো কেউ আসে নি খলিফার দোকানে। মনছুব আসে নি, পরমা আসে নি। রাউজা আসে নি। মদন তাকাল বাতায় ঝোলান লণ্ঠনটার দিকে। লণ্ঠনের চিমনি একপাশে কালো হয়ে উঠছে। পলতেটা বোধ হয় ভাল করে কাটা নেই। একপাশ দিয়ে ধোঁয়ার কালি উঠছে। মদন কোন কথা না বলে উঠে লণ্ঠনটা একটু কমিয়ে দিল।

—কি অইল ?

তাকাল আবার দাশু শেখ। মদন কোন কথা না বলে আবার বসল।

মনটা আজ ওর একেবারে ভাল নেই। কি করবে ও কিছুই বুঝতে পারছে না! বিদ্যাধরীর কাছে আর এমন করে দিন কাটান চলে না। তবু বিদ্যাধরীর কাছে যদি থাকা যায়, কুমির কাছে তো নয়ই। তাতে কুমির রোজগারের পথটা বন্ধ করে দেয়া হবে। সেটা পারবে না মদন।

—পিরানডা কাইল দিতেই অইব খলিফা।

হাসি হাসি মুখে তাকায় দাশু।—ক্যান, এত সকালে পিরানের কি কাম ? চলত্যাছে, চইলব্যার দ্যাও। নতুন পিরান নিলেই পুরান অইয়া যাইব।

অকাট্য কথা। জামাটা দর্জির ঘরে যতদিন থাকে থাক না, তাতে নতুন থাকবে। তাড়াতাড়ি নিয়ে পরলেই তো পুরোন হয়ে ছিঁড়ে যাবে। তাতে সমুহ লোকসান। দর্জির ঘরে যতদিন থাকে ততদিনই মঙ্গল।

মদন বিষণ্ণ চোখদুটো তুলে বলে,—না খলিফা, এয়ানে আর থাকুম না, চইল্যা যামু।

দাশু শেখের ঘুম-ঘুম চোখ ফাঁক হয় একটু। সেলাই বন্ধ করে বলে,—কও কি কথা। চইল্যা যাইবা? ক্যান? কোয়ানে?

—চইল্যা যামু।

আর কিছু বলে না মদন। কোথায় যাবে, কেন যাবে, সে সব কথা খলিফাকে বলা যায় না।

খলিফার মুখের হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়েছিল। আবার হাসি ফুটে ওঠে। চোখে কৌতুক।

ফিস ফিস করে বলে,—ক্যান, খেপীর সাথে খচর-মচর অইছে না কি?

মদন চুপ করে লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আহা। অমুন ধুমসা ধম্‌ধমা মাইয়্যা লইয়া মন উঠল না। কও কি মদন ভাই?

—খেপীর কথা কই না।

—তয়?

—খেপীর সাথে আমার সম্বন্ধডা কি। ওয়ার মত ও থাকে, আমার মত আমি।

খুক্ খুক্ করে হাসে দাশু শেখ।—হায় রে হায়, চাপ্‌সী ছ্যাওয়ার আর মানুষ পাইলা না। খেপীর সাথে তোমার সম্বন্ধ কোন মান্‌ষে না জানে!

—ও কথা থাউক। আমি চইল্যা যামু। বইয়া বইয়া ভাল লাগে না। কাজ কাম নাই। খেপীর কন্ধে খ: ন-খ:কন। বুঝলা না, মান মর্য্যাদায় ঠ্যাকে।

খলিফা চুপ করে একটু সময় ভাবে। বলে,—কি কাম কইরব্যার চাও। তুমি নি যাত্রাগাওনার দলে আছিলা?

—হ। কিষ্টযাত্রার দল।

—এয়ানে এউগ্‌গা দল বানাও। ছ্যামড়া-ছেমড়ি ম্যালা আছে। দল বানাও।

মদন টান টান হয়ে বসে। খলিফা দাশু শেখের ঝিমোন গরুর মত ঢুলু-ঢুলু চোখ—কিন্তু কাকের মত সেয়ানা বুদ্ধি।

বেশ ভেবেচিন্তে মোক্ষম কথাখানা বলেছে। মদনের মুখটা চিকচিকিয়ে ওঠে। চোখদুটো জ্বল-জ্বল করে।

একটু যেন হাসে, বলে—তুমি যদি আশা-ভরসা ছ্যাও, ভয় নি কথাখান ভাইবা দেখি।

—ভাবনের কিছু নাই। দল বান্ধ। একখানা পালা বানাও।

—দুই-তিনখানা পালা আমার আগা পান্তালা মনে রইছে।

খলিফা ভাবে আর একটু।—একখান ঘর লাগব তোমার?

—হ।

খলিফা তখন-তখনি সাহায্য করে। বেশি কিছু না ভেবেই বলে ওর বাড়িতে বাইরে একখানা ঘর আছে। সেই ঘরটা মদন আপাতত নিতে পারে। সেখানে পালা লেখা চলুক। পদ্মভূষণ ঘোষ—পদ্মদিদির হাতের লেখা ভাল। তাকে বলেকয়ে পালাটা লেখান যাবে আর ছ্যামড়া জোটাবার ভার দাশু শেখের। কলুর ছেলেটার গলাখানা সাফ। দেখতেও গোরা-গোরা। একটু খাটো মোটা। ওকে ছিরাধার গান গাওয়ান যাবে। আরও ছ্যামড়া আছে অনেক। কুমির ভাই ম্যাগাকে একটা ভাল কিছু—মানে অন্তত বিন্দাদূতীব পাট দিতে হবে। প্রথম গান হবে বাবুদের বাড়ি। বাবু বদনচাঁদ সরকারকে কথাটা জানালে তিনি খুশিই হবেন। তাঁব গাঁয়ে একটা যাত্রাগানেব দল বান্ধা হচ্ছে, এটা তাঁরও একটা মর্যাদা।

কোন অসুবিধে হবে না। মদন একটা ভাল দিনক্ষণ দেখে কাম শুরু করে দিক।

মদন খুশি হয়েও গম্ভীর হয়ে উঠল।—কিন্তু ডেছ?

ড্রেসের কথা বলছে মদন। যাত্রা-গানে জমকালো চোখ ধাঁধান ড্রেস পেণ্ট চাই। চুমকি আর জরি বসান পোষাক, টিনের তরওয়াল, ঢাল ধনুক, বাঁশী। মুখে মাখবার সব রঙ। তারপর চুল, গোঁফ, দাড়ি।

—ডেছ পামু কোয়ানে?

তাই তো! সেলাই বন্ধ হয়ে যায় দাশুশেখের। তাই তো ড্রেস চাই। সে সব আনতে হবে সিরাজগঞ্জ থেকে।

—আমি কইর‍্যা দিমু ডেছ-ডুছ। ছিলকেটেব কাপড় জবি আনাইয়া দিলে আমি বানাইবার পাবি।

মদন ভাবিত হয়ে বলে,—ভয় শেখ টাহার কাম!

—হ' টাহা লাগব।

দাশু শেখও এবার একটু ভাবনায় পড়ে।

রাত হয়ে আসছে ক্রমে। মনছুব মিয়াঁ এল। পরমানন্দ এল না আজ। বোধ হয় ওর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে সকালে। তিনজন ওরা। ঘুম-ঘুম চোখে দাশু শেখ মদের জালা খুলে বাঁশের চোঙায় করে একটা বড় ভাঁড়ে চোলাই বার করে নিল। ও আজ খাওয়াবে। বড় ভাবনায় পড়েছে। ডেছের ভাবনা, টাকার ভাবনা। এক পাত্তর পেটে পড়লে ভাবনাটা জমবে, মাথা খোলসা হবে।

—বেশ কয়েক পাত্তর খেয়ে ফেলল ওরা।

ঢুলু-ঢুলু চোখ রাঙা হয়ে উঠল।—আলা মদন!

মদনের মাথাটা চন্‌চন্‌ করছে।—কও খলিফা।

—আলায় ব্যাপারীরে চিন? কালা-কান্দির পাটের ব্যাপারী? ওনাবে কইলে দুই শত টাহা দিব্যার পারে।

—ব্যাইল্যারে! তয় গাওনা দল বান্দি।

দাশু শেখ মদনের মাথা চাপড়ায়। নেশাটা জমেছে।—রইস, একখান কথা আছিল।

মদন দুলতে থাকে।

খলিফা বলে,—মনছুর ভাই।

মনছুর মিয়াঁ তাকায়।

খলিফা বলে,—কি পাইলে ব্যাপারী দুই শত টাহা দিব্যার পারে? অয়, খেপীরে পাইলে। কেমুন না?

মনছুব রক্তিম চোখে তাকাবাব চেষ্টা করে।—অয়। তিন খুদি চাইব খুদি টাহা দিবার পারে।

খলিফা খুক খুক করে হেসে ওঠে।—লও মদন ভাই, তোমার ডেছ্‌-ডুছ্‌ অইয়াই গ্যাল গা! লও, দল বানাও।

—কিন্তু কথাখান—

—এয়ার মধ্যে আর কথা-কুথা নাই। খেপীর ঝুঁটি ধইর‍্যা ব্যাপারীর হাতে তুইল্যা দ্যাও।

ব্যস। সব সমস্যার মীমাংসা করে দিলে দাশু শেখ। কিন্তু বড় আথান্তরে পড়ল মদন। নেশার ঘোরে ও ঠিক বুঝতে পারছে না কি করে বিদ্যাধরীকে কালাকান্দির ব্যাপারীর হাতে তুলে দেবে? বিদ্যাধরী কচি খুকী নয়, বা কোন দ্রব্য নয় যে সে কারো হাতে তুলে দেবে? আর তার এক্তিয়ার কোথায়? বিদ্যাধরী কি তার সম্পত্তি? এরা বিদ্যাধরীকে চেনে না। কেইবা চেনে? ওকে চেনাও বড় কঠিন। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, কুমিও বোধ হয় খেপীকে ঠিক চেনে না। ও চেনা না দিলে চেনা যায় না। বড় ফাঁপড় ফাঁপড় লাগে মদনের।

সমস্যাটা ওর মনে সমস্যাই রয়ে যায়। খলিফা দাশু শেখ কিন্তু সমাধান করে দিয়ে ঢুলু-ঢুলু চোখে একাই অর্ধেকটা দ্রব্য খেয়ে নেয়। মদন বেশি খায় না।

মনছুর বলে,—তাইলে ব্যাপারীরে কথাখান শুনাই? কও কি খলিফা?

—হ। নিচ্চয় টাহার কথাডাও কইও।

মদনের নেশা জমে না। বেশি খেতেও পারে না। এ আবার আর এক কারখানা বেধে বসল। সে কিছু বলতেও পারছে না, অথচ কথাটা যে কত ভয়ঙ্কর, তাও বুঝতে পারছে।

বড় আথান্তরে পড়েছে মদন।

ওখান থেকে উঠে ও বকুলতলার ঘরের দিকেই এগোল। একেই মনটা ভাল ছিল না। কুমি আর খেপীর জট পাকিয়ে ছিল। তার ওপর খলিফা মনে আরও কতকগুলো শেকড়-বাকড় ঢুকিয়ে একটা জটিল জঙ্গল করে তুলল তার মনটাকে।

কিষ্টযাত্রার দল যদি করতে পারে এখানে, তবে তার মর্যাদা দেখে কে? শুধু এখানে নয়। পাঁচগাঁয়ের লোক চিনবে। সেই হবে একটা পুরো দলের কর্তা। যা খুশি তাই করবে। যা বলবে সবাই তাই শুনবে। মানে মর্যাদায় তার অংখার তখন দেখে কে? ওই বিদ্যাধরীই কি তখন খাতির না করে পারবে? তার সঙ্গে মান্যি দিয়ে কথা না বলে পারবে?

দল তাকে একটা বাঁধতেই হবে, কিন্তু টাকার ভাবনাটাই বড় ভাবিয়ে তুলেছে। এক-আধটাকা নয়, শ'দুই-তিন টাকার দরকার। আটটা সখীর পোষাকই তো আশী। আর ছিরাধা, বিন্দে, কিষ্ট, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, অনেক টাকার দরকার।

দল তাকে বাঁধতেই হবে। কিন্তু খলিফা আর মনছুর যা বলল। এটা কি করে হয়?

বুকের ভেতর হাস-ফাঁস করে। দল বানাবার লোভটা তেজী হয়ে উঠেছে মনে। টাকার জন্যে ব্যাপারীর কাছে বিদ্যাধরীকে যেতে হবে, এটা ভাবতেই কেমন মেজাজ খারাপ লাগে। তা ছাড়া সে বললেই বা বিদ্যাধরী শুনবে কেন? এটা কি একটা কথা হোল?

তবু টাকা পাবার যে রাস্তাটা খলিফা দেখিয়ে দিয়েছে, সেটা ওর নজরে বেশ আঠার মত লেগে রয়েছে। অন্য কোন পথ ও দেখতে পাচ্ছে না। বোধ হয় ওইটেই একমাত্র পথ।

দরকার হলে বিদ্যাধরীকে জোর করে মেরে ধরে—

আরে রাম, রাম, কথাটা সে ভাবতে পারছে কি করে। যে তাকে এতদিন ভিক্ষে করে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াল। আজ পর্যন্ত যে তার সঙ্গে একটা আকথা-কুকথা বলে নি। তাকে সে জোর করে অন্য মানুষের কাছে বেচে দেবে? ঘিন্নার বারো বচ্ছর। কথাটা সে ভাবতে পারল কি করে?

নিজেকে নিজে ঘেন্না করতে পারল মদন ভুঁইয়া। এই প্রথম।

॥ এগারো ॥

মনটার ভেতর যেন এক জাঙ্গাল সাপের বাচ্চা কিলবিল করছে।

মদন ভুঁইয়া সহ্য করতে পারছে না। ও ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

বিদ্যাধরী একই রকম। দেখেও দ্যাখে না। শুনেও শোনে না। বোধহয় অনেক কথা অনেক ভাবসাব বুঝেও বোঝে না। এ কেমনতর? তাপ-উত্তাপ নাই। গোসামোসা নাই। মুখের ছিরির বদল নাই। যেন জ্যান্তে মরা।

সত্যি সত্যি মরা হলে একটা কথা ছিল। সওয়া যেত। কিন্তু তা নয়। হাসন, নাচন, গাওন তার সমান বরাদ্দে চলছে। নিজের খুশিরসে নিজেই বিভোর। আশে-পাশের কোন মনিষ্যি বাঁচল না মরল, থাকল না গেল, কই তার কোন খবর নেই। সর্ব শরীর জ্বলে যায় মদনের।

সেদিন সন্ধ্যেয় বেরোবার সময় বেশ রুক্ষস্বরে বলে,—রাইতে আসুম না।

বিদ্যাধরী একখানা কাঁথা সেলাই করছিল। মোটা ছুঁচ, মোটা ধাবড়া ধাবড়া সেলাই। এ সব কাজে মোটেই পোক্ত নয় ও। চোখ তুলে তাকায়। মস্ত মস্ত চোখ দু'খানা এইমাত্র কে রসে চুবিয়ে তুলেছে। ভিজে ভিজে টস্‌টসে। দু'খণ্ড বর্ষার মেঘের মত মদনের খাখায়-জ্বলা পরাণটায় যেন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ছায়া ফেলে! ওই চোখ দু'টোকে মদন বড় ডরায়। বিদ্যাধরী চোখ মেলে একবার পুরোপুরি তাকালে মদনের চোখের তাপ-উত্তাপ জোলো হয়ে আসে।

অল্প অল্প হাসি লেগেই আছে মুখে।—থাকবা কোয়ানে?

তাকাতে পারে না মদন। মুখ ফিরিয়ে বলে,—যেখানে মন হ্যায় সেখানে। তোমার হেয়া দিয়া কাম কি?

গলাটা বেশ কঠিন করে রাখতে পেরেছে মদন।

বিদ্যাধরী চোখ নামায়। আবার কাঁথায় মন দেয়।

আর একটা কথাও বলে না বিদ্যাধরী।

সর্ব শরীর চিড়বিড়িয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় ওকে ধরে নিয়ে কোন বাঘের মুখে ফেলতে। কালাকান্দির ব্যাপারীর ফান্দে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। তারপর একবার শুধু দেখতে ইচ্ছে হয় ওর ছটফটানী। ওর রুসুকুসু বার করে দিতে ইচ্ছে হয়।

মদন রাগে গোমরাতে গোমরাতে হাটের দিকে চলে যায়।

সেদিন বেদম নেশা করে। কেন যে ওর বিদ্যাধরীর ওপর এত রাগ, এটা যতই

বুঝতে চেষ্টা করে বুঝতে পারে না। ততই চিড়বিড়ানি বাড়ে। নেশা করে ঠাণ্ডা হতে চায়।

মনছুর মিয়া পান খাওয়া দাঁত বার করে হাসে।—দুই শত্ টাহা দিবার পারে ব্যাপারী। বুঝলা নি মদন।

মদন নেশার ঘোরে তাকায়।

বাউলানীডারে ধইর‍্যা কালাকান্দির ঘাটের গদিতে পৌছাইয়া দিবার পার ?

মদন চোখ টেনে তাকাবার চেষ্টা করে। কথাটা বোঝবার চেষ্টা করে। কথাটায় মনছুর ভাই ঘোর-প্যাঁচ রাখে নি। কালাকান্দির ঘাটে ব্যাপারীর পাটের গদি। ওখানে সন্ধ্যার পরে বিদ্যাধরীকে শুধু পৌঁছে দেয়া ব্যস্। এইটুকু করতে পারলেই দু'শ টাকা। দল খোলবার টাকাটা এসে যাবে। বেশ ভাল মতে একটা কিষ্টযাত্রার দল বানান যাবে। ছ্যামড়া জোগাড়ের ভার খলিফার। ঘর দেবে খলিফা।

ছ্যামড়া সখীদলের ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পায় মদন: এক-দুই-তিন। নাচন ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

দলের কর্তা মদন, গুণীমানী ব্যক্তি। পাঁচ গাঁয়ে মর্যাদা।

শুধু কালাকান্দির ঘাটে খেপীকে নিয়ে পৌঁছে দেয়া ?

—হ, তুমি পৌছাইয়া দিয়া খালাস। হাতে হাতে টাহা দিয়া দিব। গুদাম ঘরে বন্ধ কইর‍্যা বাউলানীরে সজুত করনের কাম তোমার না। সে কাম ব্যাপারীর। আমার।

হাতখানা হাওয়ায় ঘুরিয়ে বলে মনছুর মিয়া।—খাবাশী দিয়া বাইড়াইয়া সজুত করুম। কত মিয়া দ্যাখলাম। দু'খান বাড়ি পিঠে পড়লে ঝরঝরাইয়া রক্ত বাইর অইব।

রক্ত! বিদ্যাধরীর নধর নিটোল পিঠ ফেটে রক্ত! গুদাম ঘরে আটকে রেখে ব্যাখারী দিয়ে মেরে তাকে সজুত করবে মনছুর মিয়া। বাবুদের বাড়ির বরকন্দাজ। পাকা লাঠিয়াল মনছুর মিয়া। কালাকান্দির ব্যাপারীর বড় অনুগত। বাবুদের চেয়েও ব্যাপারীর কাছে বোধহয় পয়সাকড়ি পায় বেশি। দিনকাল পাল্টাচ্ছে। জমিদার বাবুদের দাপটের চেয়ে ব্যাপারীর দাপট বেড়ে চলেছে।

শুধু মাত্র কালাকান্দির ঘাটে বিদ্যাধরীকে পৌছে দেয়া। ব্যস্। এই কাজের জন্যে দু'শ টাকা। তার পর বিদ্যাধরীকে সজুত সামাল করবার ভার ব্যাপারীর আর মনছুর মিয়ার।

খাবাশী দিয়া বাইড়াইয়া সজুত করুম।

আছোলা ব্যাখারী দিয়ে সপাসপ মারবে পিঠে। বিদ্যাধরীর নরম নিটোল পিঠখানা ছড়ে কেটে রক্ত ঝরবে।

পরাণটা উল্লাসে ঝমঝমিয়ে ওঠে। গরম হয়ে ওঠে মদন।

কিন্তু ব্যাপারী তো এখান থেকে ধরে নিয়ে যেতে পারে খেপীকে। মনছুর মিয়া যে কোন দিন লাঠি নিয়ে চড়াও হয়ে বিদ্যাধরীকে ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে পারে।

না, তা পারে না। বাবু বদনচাঁদ সরকারের এলাকা থেকে জোর করে কোন মেয়েমানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া যায় না। মরা হাতীর দাম লাখ টাকা। নেই নেই করেও বদনচাঁদ সরকারের ঘরে এখনো বন্দুক আছে। তেমন তেমন বুঝলে ব্যাপারীকে গুলী করে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবেন না বাবু বদনচাঁদ।

অতখানি সাহস ব্যাপারীর নেই। তবে তার গদিতে যদি কাউকে পায়, সেখানে সে সর্বময় কর্তা। যা খুশি তাই করতে পারে। আর বিদ্যাধরী যদি কালাকান্দির ঘাটে যায়, তবে সেখান থেকে সে কোথায় গেল, কি হোল, সে সব খবর কে রাখে। ওখানে ঘরে বন্ধ করে রেখে দেবে মাসের পর মাস।

মনছুর মিয়া খাবাপী দিয়ে বাইড়াইয়া রক্ত বার করে দেবে।

বিদ্যাধরীর নধর নরম দেহখানা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠবে। ওই মস্ত মস্ত চোখ দুটোয় তাপ-জ্বালা আর যন্ত্রণা আসবে।

বুকের ভেতরে উল্লাস অনুভব করে মদন।

—হ পারুম। ওয়ারে নিবারে পারুম কালাকান্দির ঘাটে।

খলিফা ঢুলু ঢুলু চোখ মেলবার চেষ্টা করে—মদনের পিঠটা চাপড়ে বলে—আরে বাইর‍্যা। না পারনের আছে কি? চুলের ঝুটি ধইর‍্যা টাইনা নিয়া যাইবা। কোন আল্লার ডর কইরো না। আমি আছি। মনছুর আছে। পরমা আছে কি কও পরমা।

পরমা হালুইকর চোখ বুজেই বলে—অয়।

মদনের চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে ওঠে। পারবে সে। খলিফা আছে। পরমা আছে। মনছুর আছে। তার সাথে তরা রয়েছে। কেন পারবে না সে একটা মেয়েমানুষকে ধরে নিয়ে যেতে। খুব পারবে। তাকে পারতেই হবে। দু'শ' টাকা নগদ। যাত্রাদল। মান-মর্যাদা।

শুধু কি তাই, বিদ্যাধরীর গা এলান কুসুকুসু ভাবখানাকে সজুত করা। চোখের ওই ট্যালা-ট্যালা চাউনীকে ছুঁচোল করে তোলা—এটাও কি কম! সে চায়। বিদ্যাধরীর ট্যালামী সে ভাঙতে চায়।

সে থাকবে কোথায়, খাবে কি?

কেন, কুমি! কুমির কাছে থাকবে। নয়তো খেপীর ঘরেই থাকবে। খাবে কুমির কাছে।

কুমির কথা মনে হতে মদনের মনটা আনচান করে ওঠে। সত্যি। তার জন্যে

কুমি অনেক করেছে। শুধু সকালে চা করে দেয়া নয়। তার খোঁজ নেয়া খবর নেয়া। মুখ ভার করে থাকলে বার বার দেহ ভাল আছে কিনা জিজ্ঞেস করা। নানাভাবে তার সঙ্গে হাসি-গল্প করে তাকে খুশি রাখা। কুমি তার জন্যে অনেক করে।

তার ওপর কুমির যে টানটা—কথায় ব্যাভারে বেশ বোঝা যায়।

একটা কথাই শুধু বুঝতে পারে না মদন। কেন তার ওপর কুমির এত টান।

কুমির জন্য তো সে কিছুই করে নি। বরং কুমির ওপর অকারণে সে অত্যাচার করেছে। তার ঘরে নেশা করে সে এরি ভেতর দু-চারদিন গেছে। অনেক রাত্রে বেরিয়ে এসেছে তার ঘর থেকে। ও জানে কুমির এতে লোকসান হয়েছে। তার জন্যে কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছে। দু'দিন খলিফা দাশুকে বিদেয় করে দিতে হয়েছে। তবু কুমি অখুশি হয় নি। রাগ করে নি। একটা অনেয্য কথা বলে নি।

কুমিকে কি সে সুখী করতে পারে না ?

আনচান করে ওঠে মদন। নেশার ঘোরে হাট থেকে সোজা চলে আসে কুমির ঘরে। সন্ধ্যেবেলা থেকেই কুমির ঘরে আসবার ইচ্ছে ওর ছিল। যে জন্যে ও বিদ্যাধরীকে বলেছিল, রাত্রে আজ ফিরবে না।

কিন্তু সত্যিই কি ওব আসবার ইচ্ছে ছিল ? বিদ্যাধরী যদি তার ওপর জোর করত। তাকে ধমকাত। তাকে তুষিয়ে-বুষিয়ে বলত। তবে কি সে রাত্রে ফিরত না ? বিদ্যাধরী যদি একবার তার হাতখানা চেপে ধরত। আর ওই মস্ত চোখ দু'টো তুলে তাকিয়ে তাকে কাছে টানত !

ভাবতে ভাবতে দেহটা শিরশিরিয়ে ওঠে মাঠের হাওয়ায়। হাওয়ায় হাওয়ায় খেপীর স্পর্শ পায়।

মাঠ পেরিয়ে চলেছে মদন। পা দু'টো সামান্য টলমল করছে। চোখ দু'টো টেনে আসছে।

বুকের ভেতরটা কেমন-কেমন করছে। খেপী যেন এই একটানা দক্ষিণের হাওয়ায় মিশে আছে। তার গায়ে এসে লাগছে আলতো আলগা স্পর্শের মত। কানের পাশ ঘেঁসে বাতাসের শন্‌শনানীতে—খেপীর আওয়াজ। খেপী কি ছড়িয়ে রয়েছে সবখানে হাওয়ার মত। খেপী কি হাওয়া, না মনিষ্যি !

নেশার ঘোরে এমনি একটা আকাশ-ভাঙা ভাবনা ওর হয়। কেন হয় মদন জানে না। পরাণটা উজানটানে বইতে থাকে। জাল দেয়া শুকনো রসের চটচটে একটা মিঠা টান লাগে বুকে। টনটনিয়ে ওঠে বুকের ভেতরটা। কেমন যেন দমে যায় মদন।

টালমাটাল চলতে চলতে অন্ধকার চালতে বাগানে এসে হাজির। বিরাট মস্ত

চালতেগাছগুলোর নিচে জমাট অন্ধকার। ঝিঁ-ঝিঁর একটানা আওয়াজ, আর চালতে-গাছের শুকনো পাতার মড়মড়ানি।

ঝুম্ ঝুম্ নূপুরের মত একটা আওয়াজ কানে আসে উত্তরের পুকুরের ধারে বেত ঝোপের কাছে থেকে। থমকে দাঁড়ায় মদন। ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজ। ঝোপের ভেতরে বোধহয় একটা সজারু ঢুকে গেল। সজারুর গায়ের কাঁটার আওয়াজ ঠিক নূপুরের মত। বাচ্চা শালিকের ডাকও নূপুরের মত লাগে। মদন শুনেছে ওদের দেশে। ওদের গাঁয়ে শালিকের ছড়াছড়ি। এখানে শালিকের চেয়ে কাক বেশি।

নেশার ঘোরে কি সব ভাবছে মদন। এসেছে ও কুমির কাছে। ভাবছে আকাশ পাতাল। আস্তে আস্তে কুমির ঘরের দিকে এগোয় মদন। ঘরের ভেতরে লণ্ঠন জ্বালান। দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে।

মদন দরজার সামনে এসে দরজায় টোকা দেয়।

ভেতর থেকে আওয়াজ আসে।—কেডা? খলিফা?

উত্তর দেয় না মদন। ও আগেই জেনেছে খলিফা মাঝে মাঝেই রাত্রে কুমির ঘরে—প্রায় রোজই।

দরজাটা খোলে কুমি।—অ তুমি?

মদন ঘরের ভেতরে ঢোকে। কুমিকে বলতে হয় না কিছু। ওর টলমল পা ফেলার ধরণ দেখে বোঝে নেশা করে এসেছে মদন। কুমি হাসে। খুক খুক করে হাসে।

—খাওয়া হইছে নি?

মদন চৌকির ওপর বসে ঘাড় নেড়ে জানায়—না। খাওয়া হয় নি।

কুমি ঘরের ভেতরে এনামেলের থালার ঢাকনা খোলে। মাটির হাঁড়ি থেকে ভাত বাড়ে থালায়। ভাত আর গোটা চারেক কাঁচালঙ্কা। নুন তেল। আর বেগুন-প্যাজের ছেঁচকি। মাটির মেজের ওপর একখানা চট পেতে দেয়। থালাটা সামনে দেয়। মদন চৌকির ওপর থেকে নামে। মুখখানা ওর ঘামে চকচক করছে।

হঠাৎ কি মনে পড়ে—বসতে গিয়েও বসে না।—তুমি খাইবা না?

কুমি হাসে খুক খুক করে।—আমার গেলনের কথা তোমার ভাবনের কাম নাই। তুমি বইও।

মদনের খিদে পেয়েছিল খুব। বসে পড়ে। আবার মনে হয় বিদ্যাধরীর কথা। সে তো কোনদিন রাত্রে এমন করে তার জন্যে জেগে থাকে না। ভাত বেড়ে দেয় না। নিজের ছাপরায় শুয়ে থাকে। অথবা কি করে কে জানে। চোখ বুজে বসে থাকে। দমের কাজ করে। কে জানে কি করে। কুমির মত এমন যত্ন করে তাকে খাওয়াতে বসায় না। ভাবতে ভাবতে আবার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে।

খেতে খেতে বলে,—খেপীর কাছে আর থাকুম না।

কুমি ত্যারছা তাকায়। সে জানে এসব নেশাভাঙের বুলবুলানি হতে পারে। তবু জিজ্ঞেস করে,—ক্যান? কি অইল?

—না। থাকুম না। খেপীর কোন চ্যাড় ভ্যাড় নাই। এট্টা উলুম্বুষ!

খেপী একটা উলুম্বুষ! বলে কি মদন! খেপীর ওপর খুব রেগেছে! কারণটা কি? কথাটা অবিশ্যি মদন খুব যে মিথ্যে বলেছে তা নয়। খেপীর চেতন-ভেতন নেই। তাকিয়ে রয়েছে তো তাকিয়েই রয়েছে। হাসছে তো হাসছে। খাচ্ছে তো খাচ্ছে। কথা বলছে তো বলছেই। তা নইলে কি আর সাধে মানুষ ওকে খেপী বলে!

কুমি হাসে।—ও ছাইডা বরাবরই ওমনি।

বেশ রোক করে বলে মদন।—থাকুম না ওয়ার কাছে। ওডা জ্যান্তে মরা।

কথাখানা বলেছে মানানসই। সত্যিই খেপী যেন জ্যান্তে মরা। কুমি তো ওকে আজ দেখছে না। বহুকাল ধরে দেখছে। যে সব অকানে-কুকানে মরা মানুষও নড়ে ওঠে। সে সব কারখানাতেও খেপী নড়ে না। মড়ার মত সত্যিই। জলজ্যান্ত মেয়েমানুষ যে এমন ভিজে ন্যাতার মত থাকতে পারে কি করে কুমি ভেবে পায় না। যৌবনকালে মনের দাফানি নাই। পরাণের জ্বলুনী নাই। এমনটা কে কবে দেখেছে।

সত্যি খেপী জ্যান্তে মরা। চ্যাড় ভ্যাড় নাই।

কুমি উঠে পড়ল। ঘরের ভেতর দিয়ে একটা ফোঁকর আছে দাওয়ায় রান্নার জায়গায় যাবার। নিচু হয়ে সেখানে গিয়ে একটা বড় এনামেলের বাটিতে এক বাটি মুড়ি নিয়ে এল। তেল নুন দিয়ে মাখল। গোটাকতক কাঁচালঙ্কা নিল বাঁ হাতের মুঠোয়। ন্যাটা হয়ে বসল। বেশ জিরিয়ে সাতিয়ে কাজ করে কুমি। যাই করে বেশ আরাম করে জিরিয়ে আস্তে আস্তে করে।

একমুঠো মুড়ি মুখে ফেলে কাঁচালঙ্কা চিবিয়ে বলল,—যাইবা কোয়ানে?

মদন ভাত খাচ্ছিল। কুমির দিকে তাকিয়ে বুঝল, ও আজ রাত্রে মুড়ি খেয়েই থাকবে। জলের ঘটিটা উঁচু করে ঢক্‌ঢক্ করে জল খেয়ে বুকের ভাত পেটে নামাল মদন।

ঘটিটা নামিয়ে বলল,—তাই ভাবত্যাছি যামু কোয়ানে।

একটু ভেবে আবার বলল,—চইলা যামু। ছ্যাশে চইলা যামু।

কুমি মুচ মুচ করে মুড়ি চিবোচ্ছিল।

মদন বলল,—আবার ভাবি। খলিফা কইছিলো কিষ্টযাত্রার দল বানাইতে। দলডা বানাইবার পারলে একখান ভাল কাম অইত।

কুমি মুড়ি চিবিয়ে গিলে বলে,—তয় দলই বানাও।

মদন রক্তিম চোখ দু'টো মেলে কুমির দিকে তাকায়। কুমির তেলতেলা মুখখানা ঘেমে উঠেছে। ঘাট মোটা গলা থেকে পিঠ পর্যন্ত নিটোল কুচকুচে কালো। ছোট চোখ দু'টি করমচার মত সামান্য রক্তিম। মুখখান ভরা যেন পোলাপানের মত একটা স্নেহ-মমতা। নরম নরম লাগে প্রাণটা। ওর দিকে তাকাতে ভাল লাগে মদনের। এই প্রথম খুব বেশি ভাল লাগে।

ন্যাটা হয়ে বসে কেমন আরামে জিরিয়ে জিরিয়ে মুড়ি চিবোচ্ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কুমি। দু'চোখে আনমনা ভাব।

একটা বড় শ্বাস ফেলে মদন বলে,—দল বানাইতে টাহার কাম। টাহা পামু কোয়ানে?

কুমি মুড়ি খাওয়া শেষ করে বাটিটা একটা কোণে রাখে। ঘটিটা বাঁ হাতে নিয়ে উঁচু করে মুখে জল ঢালে। ঢোকে ঢোকে গলায় এক ঘটি জল ঢেলে দেয়। চৌকির নিচ থেকে একটা মাটির সরা বার করে। তাতে পানের সরঞ্জাম। তিনটে পান এক সঙ্গে করে বেশ মোটা একটা খিলি বানায়। মুখে পান দিয়ে চিবোয়। বাঁ হাতের তালুতে খানিকটা দোক্তা নিয়ে মুখে ফেলে।

পান-দোক্তার গরমেই বোধহয় ওর মুখখানা ঘেমে ওঠে।

আস্তে আস্তে বলে,—আমি কিছু টাহা দিবার পারি।

মদনের চোখ দু'টো চিকচিকিয়ে ওঠে। কয় কি কথা!

—হ। এক শতের মত টাহা রইছে আমার। তুমি নিবা?

মদন সত্যি বড় খুশি হয়। এত কষ্টের জমান টাকা কুমি তাকে দিতে চাইছে। একি সামান্য কথা! মনখানা কুমির সত্যি দরাজ। কিন্তু ওকি আর কেউ চাইলে দিত? মনে হয় না। মদনকেই শুধু দিতে পারে।

মদন গম্ভীর স্বরে বলে,—এক শতে অইব না। তবু কমে পড়লে হাওলাত নিমু।

ধার নিতে পারে মদন। কুমির এত কষ্টের জমান টাকা সে একেবারে নিয়ে নিতে পারে না।

মদন নেশার আমেজে খুশি হয়ে এবারে হাসে।—তোমার কাছে থাকুম ভাবত্যাছি।

—আমার কাছে?

কুমির চোখ দু'টো চিকচিকিয়ে ওঠে। মদন বলে কি? কুমির কাছে থাকতে চায়? মদন কি জানে না, কুমি কি করে। কি করে কুমি দিন চালায়? কুমি কথ

নষ্ট—কত ঘৃণ্য। মদনের মত এমন তাজা একজন মর্দা তার সঙ্গে বসবাস করতে চায়? অসম্ভব। মদন নিশ্চয় তার সব কথা জানে না।

ক্রমে কুমির মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। চোখ দু টোয় কিছু ব্যথাবেদনা জমে।

মদন ভাবে অন্য কথা। কুমি বোধহয় ভাবছে, তার কাছে দিন-রাত্তিব থাকলে তার দিন চলবে কি করে?

—কিষ্টযাত্রার দল বানাইবাব পারলে এহেক রাইতে পচিশ টাহা পামু—তিবিশ পায়তিরিশও পাইবার পারি। ও টাহায় আমাগো তুইজনের দিব্যি মাছে-ভাতে হইয়া যাইব।

কুমির মুখটা ঘেমে ওঠে। চোখ দু'টো যেন মরা মাছের চোখের মত।

কি কারখানা! মদন কি তারে ঘরের বৌ বানাইবার চায়? কয় কি কথা।

তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করবে। মাছে-ভাতে খাবে যাত্রাদলের রোজগারে! এসব কি কথা শোনায় মদন। নিশ্চয় মদন ভুল করেছে। চান্দের সন্ধান করতে গিয়ে কালি মাখা লণ্ঠনের কাছে এসেছে। নদীর সন্ধান করতে গিয়ে পচা ডোবাকে নদী বলে ভেবেছে!

এমন কথা কেউ কখনো কুমিকে শোনায় নি। সব মানুষ এসেছে তার কাছে জন্তুর মত। দস্যিদানবের মত শুধু লুঠ করে নিতে। চোরের মত কিছু চুরি করতে। তারপর ঘৃণা করেছে। তার নাম করে থুতু ফেলেছে। নষ্টামী করে গিয়ে তাকে নষ্ট বলেছে। নচ্ছার বলেছে।

কুমির চোখ দু'টো ভিজেভিজে লাগে।

এ কি কথা শোনাল মদন! এমন কথা তাকে কেউ কখনো শোনায় নি।

মুখটা তুলতে পারে না কুমি। মুখ নিচু করে বলে,—আমার এয়ানে তোমার থাকনের কাম নাই।

—ক্যান?

তুমি জান না। আমার ঘরে নানান মান্‌ষে আসে।

—তাগো আইবার দিবা না। আমি একা থাকুম।

কুমি চোখ তুলে তাকাতে যেতেই ওর চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ে।

তুমি জান না। আমি নষ্ট-নচ্ছার।

মদন অক্লেশে বলে,—তাতে কি অইল। আবার ভাল হইবা।

—একবার নষ্ট হইলে আর কি ভাল হওন যায়?

—খুব যায়। আমি তোমারে ভাল করুম।

বলে মদন নেশার ঝোঁকে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। দরজাটা ভেজান ছিল।

একটু খুলে গেছে দরজাটা। একটা লোক দেখা যাচ্ছে দরজার বাইরে অন্ধকারে। মদনের চোখটা সেদিকে পড়তেই থমকে দাঁড়ায় ও।

কুমি আছস ঘরে?

খলিফা দাশু শেখের গলা।

কুমি বাঁ হাতের চেটোয় চোখ মুছে দরজার সামনে এগিয়ে যায়।

দাশু শেখ এসেছে। দাশু শেখ দেখেছে মদনকে। মদনের নেশাটা ছুটে যায়।

কুমির গলা শোনে।—অখন যাও। ঘরে মানুষ আছে।

—কেডা?

—তা দিয়া তোমার কাম কি?

—মদনের ঘরে ঢুকালি কবে?

দাশু শেখের গলাটা বেশ রুক্ষ। ঘড়ঘড়ে গলার আওয়াজটা মদনের কানে এসে লাগে। ওর নেশা ছুটে গিয়ে কেমন একটু ভয়-ভয় করে। দাশু শেখ তাকে এই ঘরে দেখে ফেলল। আবার ভাবে। ভয়েরই বা কি আছে। এর পরে তো কুমির কাছেই সে থাকবে। তখন তো সবাই জানবে। দাশু শেখ না হয় আজ জানল। তাতে আর ক্ষতি কি!

কুমির গলা আরও ঝাঁজাল।—সে কৈফিৎ তোমারে দিমু না। তুমি অখন আইগাও।

দরজাটা জোরে শব্দ করে বন্ধ করে দেয় কুমি।

মদনের মুখটা শুকিয়ে যায়। খলিফার সঙ্গে তার বেশ ন্যাটাপ্যাটা ভাব হয়ে উঠেছিল। আজ তাকে কুমির ঘরে দেখে খলিফা যে ফিরে গেল, কুমি যে তাকে দাবড়ি দিয়ে খেদিয়ে দিলে এটা কি ভাল হোল?

—খলিফা নি গোসা করল?

আস্তে আস্তে বলে মদন।

কুমির চোখে ত্যারছা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।—করল তো আমার কচু হইল; মিচ্‌ক্যা শয়তানডারে দুই চক্ষে দেখব্যার পারি না। আবার আইলে দূর দূর কইরা খেদাইয়া দিমু।

কুমির খলিফার ওপর বেশ রাগ ছিল। কিন্তু কেন। খলিফা তো টাকা দিত। চা দিত। জামার কাপড় দিত। মাঝে-মধ্যে শাড়ি দিত। কুমির এত রাগ কেন?

মদনের কিন্তু খলিফাকে বেশ ভালই লাগে। মানুষটা ভাল। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঘুম-ঘুম ভাব। কথা বলে আস্তে। যা বলে অনেক ভেবেচিন্তে রয়েসয়ে বলে। যাত্রাদল খোলবার কথাটা খলিফাই বলেছিল। সেই তাকে সাহায্য করবে বলেছিল।

এখন এই কুমির রাগারাগির ঠ্যালায় যদি জল সব ঘোলা হয়ে যায়, তবে বড় মুস্কিল হবে।

আস্তে বলল মদন,—আমিই নইলে চইল্যা যাইত্যাম।

—ক্যান, তুমি যাইবা ক্যান ?

কুমি এগিয়ে এসে ঘাড় দু'টো ধরে চৌকির ওপর বসিয়ে দেয়।

—এউগ্‌গা কথা জিগাই।

—কও।

—তোমার এয়ানে আসনের খপর খেপী নি জানে ?

—না।

—জানাও নাই ক্যান ? খেপীরে তুমি ডরাও ?

মদন একথা জিজ্ঞেস করবার মানেটা ঠিক বোঝে না। তবু সে বিদ্যাধরীকে ভয় করে। এমন একটা কথা সহ্য করতে সে রাজী নয়। ভুরু কুঁচকে বলে,—আমি কোন আলা-আলীরে ডরাই না। আমার যা মন ন্যায় করুম। কাউর কাছে কৈফিৎ দিমু না।

হাসে এবার কুমি।—তয়! আমিও তাই। আমার যা মন ন্যায় করুম। খলিফারে আমি ডরামু না।

কথার পৃষ্ঠে কথাটি বড় জুত করে বলেছে কুমি। কুমিকে বোকা বোগদা মনে হয় না।

মদনও হেসে ফেলে।

ক'দিন ধরে যে মদনের বুকের ভেতরে তাওয়ার আগুন জলছিল। দাহ আর জ্বালা-যন্ত্রণা ছিল, সেটা আজ চালতে তলায় এই নিবিড় অন্ধকার ঘরে ধুয়ে-মুছে গেল। মদন কুটো ধরে স্রোতে ভাসল। বিদ্যাধরীর নাও থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল উথাল-পাথাল স্রোতে। কুমিই তার ভরসা। কুমির টানে গা ভাসাল মদন।

॥ বারো ॥

হায়রে দুখের কারখানা
মন দিয়া মন ফেরত পাইল্যাম না।
বন বাদাড়ে ঘুইর‍্যা মইলাম,
আম ভাইব্যা তেতুল খাইলাম।
অখন অম্বলেতে পরাণ গেল,
সাইয়ের দয়া হইল না।
মন দিয়া মন ফেরত পাইল্যাম না।

হাওয়ায় হাওয়ায় আওয়াজ তুলে পথ চলেছে খেপী। ঠুং ছুয়াং ছুং—ঠুং ছুংয়া ছুং—খঞ্জনীর ঘায়ে ঘায়ে পা ফেলছে। পাশে মদন। গায়ে নোতুন পিরান, হাতে একটা খালই। মাছ তরিতরকারী আনবার দরমার তৈরি থলের মত। মদন তাকায় সামনে। ধু-ধু মাঠের সীমানায় রোদে-জ্বলা আকাশ। সড়কের দু-পাশে শুধু খেত। খেতের পর খেত। দূরে দূরে সামান্য কিছু গাছ-গাছালী জঙ্গল ঘেরা দশ বিশখানা ছাপরা, এক-একটি ছোট গাঁও বসতি।

মদনের চোখদুটো রোদের তাতে লাল। না কি মনের তাপে রক্তাক্ত?

ও আজ খেপীকে নিয়ে চলেছে কালাকান্দির ঘাটে। ওখানে আজ হাটবার। শুক্রুবারের হাট। এ চৌহদ্দি সবচেয়ে বড় হাট। হাট ছেড়ে ওকে ঘাটে যেতে হবে প্রথমে। সেখানে ব্যাপারীর গদি। জল খাবাব নাম করে গদিতে ঢুকবে। তারপর বেরিয়ে আসবার সময় ও বেরিয়ে আসবে, বিদ্যাধবী বেরোতে গেলেই গদির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। বাইরে থাকবে ব্যাপারী। নগদ দু'শ টাকার খুঁতি নিয়ে। ভেতরে থাকবে মনছুর মিয়া আর গদাই। ওরা দু'জন সুজত করবে বিদ্যাধরীকে। না কি ব্যাপারীও ভেতরে থাকবে? টাকাটা তাকে ভেতরেই দিয়ে দেবে?

মনছুর কি বলেছিল ঠিক মনে পড়ছে না।

ও খলিফার দোকানে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে। মনছুর মিয়া ছিল। দাশু শেখ ছিল। কুমির ঘরে তার আগের দিন রাত্রে ওকে দেখেছিল দাশু শেখ। তাই মদনের কেমন একটু ভয় ভয় কবছিল।

তবু সেদিন দাশু শেখ কথা বলেছিল ওর সঙ্গে। ঘুম-ঘুম চোখে তাকিয়ে একটু তেতো হেসে বলেছিল,—কাইল রাইতে কামডা তুমি ভাল করো নাই কৈল।

মনছুর কথাটা বুঝতে না পেরে তাকিয়েছিল ওর দিকে। দাশু আর কিছু বলে নি, মদনও কিছু বলে নি।

কুমির ওপর খলিফার একটা ঝোঁক ছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে কুমি যে আর কোন মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবে না, এমন জোর করতে পারে না খলিফা। কুমি তার বিয়ে করা বউ নয়! বলবার বেশি কিছু ছিল না, তবু দাশু তাকে একটু সাবধান করে দিল। তা করুক।

আসল যে কাজে এসেছিল মদন, সেই কথাটা বলল মনছুরকে। সে বিদ্যাধরীকে কালাকান্দির ব্যাপারীর কাছে নিয়ে যেতে রাজী আছে। কবে যাওয়া যাবে?

মনছুর খুব খুশি। ক্যান। সামনের হাটবারে নিয়ে এস। ব্যাপারীর সঙ্গে কথাবার্তা আমার বলাই থাকবে। সেদিন আসাই সুবিধে। ফিরে গিয়ে বলতে পারবে পাঁচ গঞ্জের মানুষ আসে হাটে, খেপী কার সঙ্গে কোথায় চলে গেছে কে জানে! তাছাড়া নগদ টাকাটাও সেদিন ব্যাপারীর হাতে থাকবে বেশি। টাকাটা পুরোই পেয়ে যাবে।

কিন্তু মনছুর কি বলেছিল ব্যাপারী ভেতরে থাকবে না বাইরে থাকবে—ঠিক মনে নেই মদনের।

বিদ্যাধরীকে রাজী করাতে একটুও বেগ পায় নি মদন। খেপী যেন তৈরি হয়েই ছিল।

—চলো হাটবারে কালাকান্দির ঘাটে বেড়াইয়া আসি। যাইব্যা?

বিদ্যাধরী যেন নেচে উঠল।—হ যামু।

তারপর একটু থেমে বলল,—কাইলই চলো।

—না। কাইল না। হাটবারে যামু। এক্কারে কিছু সওদা কইরা আমু।

বিদ্যার মস্ত চোখ দু'খানা যেন শিশুর মত খুশিতে ভরে উঠল।—আমি কৈল হাটে নাচুম, নামের আওয়াজ তুলুম।

হাসে মদন। নিখুঁত অভিনয় করে বলে—আমিও তোমার সাথে দোয়ার দিমু।

বিদ্যাধরী তখনি দুলে দুলে ওঠে। তখনি যেন ওর পরাণে নাচন লাগে।

ফিক করে হেসে বলে,—কুমি যাইব না?

—না। তুমি আর আমি। আর কেউ না।

কথাটা খুব মনোমত হয় না বিদ্যাধরীর।—কুমি গ্যালে নি মজা হইত।

মদন নারাজ।—না, আমরা দুইজন। আর কেউ না।

বিদ্যাধরী খুব রাজী। বেড়াবার নামে খুশির ওপর খুশি। ওকে রাজী করাতে একটুও সময় লাগেনি মদনের। শুধু কটা দিন নিখুঁত অভিনয় করেছে। অনেক

বছর, কিষ্টযাত্রায় পালা গেয়ে অভিনয় করতে হয় কি করে, সেটা ওর ভালই জানা আছে। বেশ কিছুদিন পরে আবার সন্ধ্যের মুখে খেপীর কাছে বসেছে। কালাকান্দির ঘাটে ওরা দু'জনেই গান গাইবে। পদকর্ত্তা খেপী বিদ্যাধরী। যা কিছু ভিক্ষে মিলবে খালই ভরে নিয়ে আসবে। তারপর নদীর ধারে গিয়ে হাত-মুখ ধোবে। গাছতলায় বসে দু'দণ্ড জিরোবে। কিন্তু যদি মেঘ ওঠে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। গাছ ভাঙা হাওয়া ছোটে। ভিজতে ভিজতে আওয়াজ তুলবে আরও জোরে। ত্যামন তেড়ে বাতাস এলে দু'জনে জড়িয়ে ধরবে একটা গাছের গুঁড়ি।

কথায় কথায় বিদ্যাধরী আনমনা। বড় বড় চক্ষু দুটো যেন বাইরের দৃষ্টি হারায়। চোখের সামনে বোধ হয় ছবির মত স্পষ্ট দেখতে পায় বিদ্যাধরী কালাকান্দির পথে ওদের নাচন-গাওন।

মদনও দেখে,—কিন্তু সে দেখে ব্যাপারীর লালাভরা মুখ আর টাকার খুঁতি।

আজ চলেছে ওরা সত্যি-সত্যি কালাকান্দির ঘাটে।

বেরিয়েছে ঠিক দুপুরে চাট্টি ভাত মুখে ফেলে। পোঁছবে বিকেলে। ফিরতে ফিরতে রাত।

কিন্তু বিদ্যাধরী আর ফিরবে না। এই পথ দিয়ে মদন ফিরবে একা। খালই ভরে মাছ নিয়ে ফিরবে। গিয়ে উঠবে সোজা কুমির ঘরে। কুমি যখন কপালের ঘাম মুছে মাছ কুটতে বসবে, বিদ্যাধরীকে তখন খাবাশী দিয়া বাইড়িয়া সপাট করছে মনছুর মিয়া। বিদ্যাধরীর আর্তনাদ তখন মদনের কানে পোঁছোবে না।

হায়রে দুখের কারখানা
মন দিয়া মন ফেরত পাইল্যাম না।

গুনগুনিয়ে উঠছে খেপী। চক্ষু দুটো আকাশে দুটো পাক খাওয়া চিলের দিকে। একভাবে পাক খেয়ে চলেছে দুটো চিল। মাটি-মাটি রঙের ঠাসা মেঘ পশ্চিমের কোণে। পরতে পরতে মেঘের ওপর মেঘ জমে কালো করে তুলেছে আকাশখানা। এক জাঙাল কাক কা-কা করে চিৎকার করতে করতে ওপরে উঠল। মেঘের রঙ ঘন হয়ে কাশের রঙে মিশ খেয়েছে।

তিরতিরাইয়া বাতাস দিচ্ছে। খুব অল্প। গাছের পাতা নড়ে কি নড়ে না। গুমসানী গরম লাগছে বাইরে।

একটা মস্ত মাদারগাছের নিচে বসেছে খেপী পা ছড়িয়ে গা আলগা করে। মদনের বসবার ত্যামন ইচ্ছে ছিল না। তবু খেপীর পাশে বসতে হয়েছে। অনেকটা হেঁটে একটু জিরোতে পারলে মন্দ হয় না।

মাঠে দুটো বাছুর ল্যাজ তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। কেন কে জানে? কেউ তাড়া করেছে কি?

উই পূবের জমিটা উঠে গেছে বেশ খানিকটা কিছু দূরে। গাছ-গাছালীর ফাঁকে মস্ত মস্ত টিনের ঘর চোখে পড়ছে। ওইটেই কালাকান্দি। আর সামান্য পথ বাকী।

মেঘের গুম্‌গুমানী শোনা যায়। থরে থরে মেঘ এসে জুটেছে আকাশে। কারো ভয়ে এসেছে না কি কারো ডাকাডাকিতে এসেছে। ডেকেছে বোধ হয় খরখরা গরম মাটি আর গাছ-গাছালীর রোদে ঝলসানো পাতা।

মেঘ এসে জানান দিচ্ছে, তারা এসেছে।

দলে দলে এসে জুটেছে।

বিদ্যাধরী ফিক ফিক করে হাসে।—দেখছ নি। পাতাগুলান হাত নাইড়্যা নাইড়্যা ম্যাঘেরে নাইমা আইবার কয়।

মদন ভাল করে তাকায় খেপীর দিকে। ওর চোখের দৃষ্টি উধাও আকাশে গাছে পাতায়। মস্ত চক্ষু দুটোয় যেন আকাশের মেঘের ছায়া নেমেছে। খেপী থির হয়ে থমকে আছে। ওর বুকের হাওয়া থম্ ধরেছে নিশ্চয়।

পারে বইস্যা পুইড়া মইলাম,
ম্যাঘ দেইখ্যা আশা কইলাম।
অ ম্যাঘের গুমগুমানী সার হইল,
জল পাইলাম না।
মন দিয়া মনের ফেরত পাইল্যাম না
হায়রে দুখের কারখানা!

বুকের ভেতরে শিরশিরিয়ে ওঠে খেপীর আওয়াজে। মদন কথা বলতে পারে না। ভাবনা-চিন্তাগুলো যেন কেমন আলগা হতে শুরু করেছে। বিদ্যাধরীর আওয়াজ মেঘলা আকাশে উধাও হয়ে কোথায় কোন নিঃসীমে মিশে যায়। বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দেয়।

হায়রে দুখের কারখানা। দুঃখ যেন থরে থরে ঘন হয়ে ওঠে বিদ্যাধরীর আওয়াজে। কিসের দুঃখ? মদনের বোধভাম্বি থমকে গেছে। ওর চোখের পলক পড়ে না। হঠাৎ আবার যেন মনে হয় ওর এ মাইয়ার যৌবন কোথায়, দেহ কোথায়? কি নিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারীর কাছে। খেপীর কাছ থেকে কি পাবে ব্যাপারী। খেপীর কাছে যা পাওয়া যায়, সে পাওয়াটা দেহের খাঁচায় বদ্ধ নয়। খেপী যেন হাওয়া। ও যেন এই মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে মেঘে মাঠে গাছ-গাছালীতে। ব্যাপারী

ওকে পাবে না। মদন এতদিনেও ওকে কাছে পায়নি। ব্যাপারী তা কেমন করে পাবে! ব্যাপারী ভুল করেছে। সে নিজেও কি ভুল করছে।

বিদ্যাধরী মদনের হাতখানা চেপে ধরে।

হায়রে দুখের কারখানা।

মন দিয়া মন ফেরত পাইল্যাম না।

মাদারগাছের নিচে মেঘলা অন্ধকারে কি যে হোল মদনের। বুকের ভেতরটা গামছা মোচড়াবার মত মোচড়াচ্ছে। খেপীকে সে ব্যাপারীর গদিতে বিক্রি করতে চলেছে। ওখানে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে খেপীর চোখের সামনে দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। মদন যখন আবার এই পথে ফিরবে কুমির ঘরের দিকে, তখন মনছুর মিয়ার থাবাশীর ঘায়ে খেপীর নিটোল নধর পিঠখানা রক্তাক্ত হয়ে উঠবে।

তখন অ মদন—আমার মদন কোয়ানে গেল?—বলে কি খেপী কাঁদবে না? সে কাঁদন আর আর্তনাদ এই মেঘলা নিঝুম বিকেলে মাদারগাছের নিচে বসে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মদন।

বুকের ভেতরে হাওয়া পাক মারছে, শিরা-নাড়ীগুলো মোচড়াচ্ছে। মদনের চোখ দুটো সামান্য রক্তিম হয়ে উঠল। নেশা না করেও কি ওকে নেশায় ধরল না কি?

দু'খণ্ড মেঘে ভরা আকাশের মত দু'খানা চক্ষু তুলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে খেপী। শিশুর মত চাউনী। যেন পাঁচ বছরের এউগা ছেমড়ি তার ওপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত নিষ্টাগ্ঠায় তাকিয়ে রয়েছে।

মদনের চাঁদিটা গরম হয়ে উঠল। ঘাড়টা টনটন করছিল। চোখদুটো জ্বালা করছিল।

ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী।—গোসা কইর‍্যা ম্যাঘ পলাইল। বিষ্টি অইব না।

বাতাস ছুটেছে এবার। মেঘগুলো ভেসে ভেসে হাওয়ায় হাওয়ায় কোথায় উধাও হয়ে চলেছে। না। বৃষ্টি বোধ হয় আর হবে না। মেঘের গজরানী সার। এলোমেলো বাতাসের ঝাপটে মাদারগাছের ডালপালা আছড়ে মরছে।

মদনের বুকের ভেতরটা আছড়াচ্ছে মোচড়াচ্ছে।

হঠাৎ টান টান হয়ে দাঁড়াল মদন। খেপীর হাতটা ধরে টেনে ওঠাল।—লও যাই। আর দেরি করনের কাম নাই।

খেপী কোন কথা বলল না।

মদন ওর একটা হাত চেপে ধরে হন হন করে এগিয়ে চলল কালাকান্দির ঘাটের দিকে।

বৃষ্টি আর হোল না। মেঘ পাতলা হয়ে এল। বাতাসের জোর বাড়ল।

বাতাস বইছে ওদের চলার দিকে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস যেন ওদের ঠেলে নিয়ে চলল। হাওয়ার ঠ্যালায় ঠ্যালায় ওরা অল্প সময়ের ভেতরেই কালাকান্দি এসে পৌঁছোল। তখনো সূর্য আছে কি নেই, বোঝা যায় না। সন্ধ্যা হোল কি না হোল বোঝবার উপায় নেই। আকাশ ভরা পাতলা মেঘের আস্তরণ।

সড়কের মুখে অনেক মানুষের ঘরে ফেরবার তোড়জোড় দেখল ওরা। ঝড় তুফান যদি আসে। কে জানে, জষ্টি মাসের ঝড় কখন আসে। কখন যায়। মাথায় ঝুড়ি-ঝোড়া নিয়ে মাইয়া মর্দা সড়কে ঘরের পথ ধরেছে।

আসতে বোধ হয় ওদের দেরি হয়ে গেল। মাদারগাছের নিচে বসে কত সময় কেটেছিল কে জানে। সময়ের হিসেব ছিল না। সূর্যের ওঠানামা দিয়ে সময়ের হিসেব করে ওরা। সূর্যের সাক্ষাৎ নেই। সময়ের জ্ঞান থাকবে কি করে। মদন ঘাটের কাছাকাছি এসে উলটো পথ ধরল।

—আগে ঘাটে যাইবা না ?

মদন ওর হাতখানা বেশ শক্ত করে চেপে ধরে বলল,—না।

এই উলটো পথে খানিকটা এগোলেই একটা আমবাগান, আমবাগানের ধারেই ব্যাপারীর গদি। মনছুরের কাছে থেকে শুনে রেখেছিল মদন। যেতে যেতে আমবাগানের কাছাকাছি এসে পড়ল।

—এ কোয়ানে আইলা ?

মদন আরও জোরে হাতটা চেপে ধরল ওর।—তিষ্টা পাইছে বড়। এট্টু জল খামু।

—এয়ানে জল কই পাইবা। ঘাটে চলো।

দাঁতে দাঁত চেপে মদন বলল,—না।

এগিয়ে এল ওরা। আমবাগানের মুখেই মস্ত টিনের চালাঘর খান তিনেক। সামনের ঘরটার দোর খোলা। মদন আরও এগিয়ে এল। খেপীর একখানা হাত ওর শক্ত হাতের মুঠোয়।

ওই তো একখানা মস্ত চৌকি পাতা। তার ওপর চিকন মাদুর। গোটা দুই তাকিয়া, একটা কাঠের বাক্স, একটা লোহার সিন্দুক। এগিয়ে এসে উঁকি দিল মদন।

খেপী হেসে উঠল, বলে উঠল—ও মা, এনা যে আমাগো চিনা মানুষ গো ! কেমুন ব্যাপারী চিনব্যার পার ?

খেপী আগে ঘরে ঢুকে চৌকির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দাউসা ব্যাপারী। কালাকান্দির পাটের ব্যাপারী বসেছিল একটা তাকিয়া ঠেস

দিয়ে। ওকে দেখে হাসল। মাথার টাকে হাত বুলিয়ে নিয়ে বিদ্যাধরীর দিকে ভাল করে তাকাল।

মদন ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল। বিদ্যাধরীর কাণ্ড দেখে মদন চমক খেয়েছে। চোখে পড়ল, ভেতরের দিকে আধা অন্ধকারে বসে রঁয়েছে উবু হয়ে মনছুর মিয়া আরও দুটো লোক। মদন আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। মনছুর মিয়ার মুখের হাসিটা দেখে সামান্য আশ্বস্ত হোল। কিন্তু এ কি কাণ্ড!

—বলে অ ব্যাপারী। কতকাল যায়েন নাই আমাগো ওয়ানে?

খেপী যেন খুশিতে ডগমগিয়ে উঠেছে। দাউসা ব্যাপারী যেন ওর কত আপন কত চেনা-জানা।

ব্যাপারী হাসে।—বয়। তর বঙা বঙ্ বাজনা কোয়ানে?

একতারার কথা জিজ্ঞেস করছে ব্যাপারী। একতারাটা আনা হয়নি। তা হোক। খঞ্জনী আছে—ঠং ছুঙা ছং—ঠং ছুঙা ছং—বেশ মিঠে বাজে।

ঝড় তুফানের নিশানা দেখে মানুষ তখন সব ঘরমুখো। গদিতে তখন মানুষ নেই। বেচা-কেনা সব আগ-বেলায় হয়ে গেছে। ব্যাপারীর মেজাজটা খুশি। গা এলিয়ে হাসছে ব্যাপারী।

খেপীর মস্ত মস্ত চক্ষু দুখানা টল টল করে উঠছে। রসের ভিয়ান চড়েছে। খেপী হাওয়ায় আওয়াজ মিশালো। সেই একই পদ। আজকের বানান এ গানের পদ।

হায়রে দুখের কারখানা।
মন দিয়া মন ফেরত পাইলাম না।

বুকের হাওয়া গুড়গুড়িয়ে ওঠে কণ্ঠের পৈঠায়। থম্ ধরে যায় কণ্ঠে। চোখের পলক পড়ে না।

বাইরের এলোমেলো বাতাসের ঝাপটা আসে ঘরের মধ্যে। সুখদুঃখের ঢেউ উঠিয়ে দেয়। দুঃখ যে এত মিঠা আগে কে জানত। দুঃখের কথা যে এত মরমছোঁয়া কে ভাবতে পেরেছিল। মানুষগুলোর বক্ষে আলগা ও পাতলা দুঃখু ব্যথার মেঘ জমে। কিসের দুঃখু। এ কোন্ দুখের কথা। মাঠে প্রান্তরে যে দুখের বাতাস বয়। এ কি তারই আওয়াজ।

পরাণগলানী আওয়াজ তুলেছে খেপী। চক্ষু দুটো ওর টলোমলো।

হায়রে দুখের কারখানা।
মন দিয়া মন ফেরত পাইলাম না।

হায় হায়! বক্ষের মধ্যে হু হু করে। ব্যাপারী থম ধরে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে

মস্ত একটা শ্বাস ফেলে বলে,—বাইর‍্যা গাইছস্ খেপী। গলাখান তর বড় মিঠা।

খেপী দীঘির মত স্বচ্ছ টলটলে দুটো চক্ষু মেলে তাকায় ব্যাপারীর দিকে। যেন কত আপন। কত জানা-শুনো।

ব্যাপারী গোটা একটা টাকা খেপীর হাতে তুলে দেয়।—ল, আবার আসিস।

খেপীর মুখখানা খুশির হাসিতে ভরা।—আমি আমু। আপনে যাইব্যান কবে? আমাগো ওয়ানে?

—যামু। বিষয়-আশয় নিয়া বড় ব্যাড়া জালে পড়ছি।

আর একটা লম্বা শ্বাস ফেলে ব্যাপারী।

খেপী ওঠে এবার। তাকায় মদনের দিকে। আধা অন্ধকারে মদনের মুখখানা ভাল দেখা যায় না।

খেপী বাইরে চলে আসে। এসে দাঁড়ায়। কই মদন আসছে না কেন?

হ্যাঁ, এসেছে। কিছু তফাতে মনছুর ভাইয়ের সঙ্গে কি যেন তক্কাতক্কি করছে। মনছুর ভাই একটা ঠ্যালা দিল মদনকে। মদন রুখে উঠে ধমাস করে ওর বুকের ওপর একটা কিল বসাল।

—ওমা, করো কি! কাইজ্যা লাগাইছ!

মদন মনছুরের সঙ্গে কাইজ্যা লাগিয়েছে, মারপিট করছে। মনছুর ভাইয়ের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। মদনের সঙ্গে পেরে উঠছে না। সাই জোয়ান মদন। ওর কিল চড় মনছুর মিয়াকে হজম করতে হোল।

গুরাইয়া গুরাইয়া তাকাতে তাকাতে চলে গেল মনছুর মিয়া। রণে ভঙ্গ দিল।

মদন ফিরে এল খেপীর কাছে। ওর ডানদিকের ভুরুটা ফুলে উঠেছে। মনছুর ভাই একটা কিল বসিয়েছিল ওর কপালে। ভুরুটা বেশ ফুলেছে।

খেপী বলে উঠল।—ও মা, কি কাণ্ড। মনছুর ভাইয়ের সাথে কাইজ্যা লাগাইছিলা কি কামে?

মদনের চোখ দুটো টকটকে লাল।—তর কি রে হারামজাদী। সব্ব কথায় কৈফিয়ৎ চাওন?

এই প্রথম খেপীকে গালমন্দ করল মদন।

তারপর খেপীর দিকে আর না তাকিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল সড়কের দিকে একেবারে সোজা সড়ক ধরে এগোল।

খেপী পেছন পেছন জোর পায়ে এগোল—কিন্তু মদনের সঙ্গে আজ পারল না। মদন গোঁ ভরে চলেছে। দেখতে দেখতে সড়কের সীমানায় মিলিয়ে গেল।

খেপী আস্তে আস্তে চলল—ঘরমুখো। পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধ্যে হবে ও জানে। হোক সন্ধ্যে। খেপীর মুখখানা ভার হয়ে উঠল, বিষণ্ণ হোল চোখদুটো।

মদন যেভাবে আজ তাকে গাল দিলে এমন গাল সে কারো কাছে কখনো খায় নি। জীবনে সে গাল খাবার মত কোন কাজও করে নি। আজও সে জানে না, সে কি অপরাধ করেছে। কেন যে মদন এমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন কে জানে! বিদ্যাধরী এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে চায় না। মনটা ভার ভার লাগে মদনের ব্যাভারে।

মদনের মনে কোথাও জ্বালা ধরেছে নিশ্চয়। কিসের জ্বালা। প্রেমের জ্বালা। মদন প্রেমের জ্বালায় দগ্ধে মরছে। এই দাহতে সোনা খাঁটি হয়। এ দাহতে মনের ময়লা পুড়ে যায়। তাই হবে। মদন প্রেমের ফান্দে পড়েছে। কার প্রেমের? খেপীর প্রেমে। না, সাঁইয়ের প্রেমে। সাঁইয়ের কৃপা হয়েছে মদনের ওপর।

ফিক ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী।

আপন মনে পথ চলে। নিশ্চিন্ত নিষ্ঠাঠায় পথ চলে।

॥ তেরো ॥

আজ হপ্তা-দুয়েক কাবার হোল। মদন কুমির ঘরে বসবাস করছে।

সেদিন কালাকান্দির ব্যাপারীর ওখানে খেপীকে নিয়ে যে নাকালটা হয়েছে মদন, তারপর আর খেপীর সঙ্গে থাকা তার সম্ভব হোল না। সেদিনই খেপীর আগে আগে হনহনিয়ে বকুলতলার ঘরে এসে নিজের টিনের বাক্সটা নিয়ে সোজা চলে এসেছিল কুমির ঘরে।

এমন নাকাল জীবনে হয় নি মদন ভুঁইয়া। কি করতে গিয়ে কি হয়ে গেল। খেপীর আওয়াজে নিশ্চয় যাদু আছে—এ বিশ্বাস পাকা করে ফেলল মদন। ও গুণতুক জানে। মানুষকে ভাউরা বানাতে জানে!

নইলে ব্যাপারীর মত অমন জবর মানুষ। অর্থে সামর্থ্যে যার তুলনা নেই এ তল্লাটে। তাকে দু'দণ্ডে মজিয়ে ভিজিয়ে দিলে। মানুষটা থম ধরে গেল। তার ষোল আনার ওপর সতেরো আনা ঠিক করা মতলব আওয়াজ শুনে ভেস্তে গেল। কি আজব কারখানা!

ঠাই করে একটা টাকা ছুঁড়ে দিলে খেপীর দিকে। ভোঁস ভোঁস করে শ্বাস

ফেলতে ফেলতে বললে,—আবার আসিস। এমন তো কথা ছিল না। কথা ছিল, তাকে ডেকে টাকাটা দিয়ে দেবে। সে বেরিয়ে আসবে আর বিদ্যাধরী আটক পড়বে ওই গদিঘরে। কিছুই হোল না। ব্যাপারীর মন ঘুরে গেল। খেপীর আওয়াজের হাওয়ায় ওর মনের হাওয়া ঘুরে গেল। ভাইটাল স্রোত উজানে বইতে শুরু করল।

নাকাল হয়ে মদন গরম হয়ে উঠল। তার এত তোষান-বোষান, খাটুনী সব পণ্ড হয়ে গেল। কোথায় টাকা আর কোথায় যাত্রাদলের স্বপ্ন।

ব্যাপারীর মাথার টাকখানা ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। সেটা না পেরে মদন বাইরে ধরল মনছুর মিয়াকে। এ কেমন কথাবার্তা! তাকে এমন নাকাল করবার কি দরকার ছিল। মনছুর কি তবে মিথ্যে কথা বলে তার সঙ্গে রঙ্গ করেছে? এই সং ব্যাপার নিয়ে রঙ্গ-রস!

মনছুর বলেছিল, সে কিছু জানে না। কথা সব ঠিকই ছিল। ব্যাপারী যে এমন কাণ্ড করে বসবে সে নিজেও ভাবতে পারে নি। কথাটা বিশ্বাস হোল না। নিশ্চয় মনছুর তাকে চাপ্‌সী দিচ্ছে। তার সঙ্গে রঙ্গ করে তাকে নাকাল করেছে।

দু-এক কথায় টং হয়ে গেল মদন। মনছুরের সঙ্গে মারপিট লাগাল। ওর যে মনছুরকে মারবার খুব ইচ্ছে ছিল তা নয়। মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল, আর সহ্য করতে পারল না মদন। খেপীর কাছে এমন নাকানি-চুবানি খেয়ে সে নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারে নি।

তবু ভাগ্যি খেপীকে সে মেরে বসে নি। শুধু গালমন্দ করেছে। কেন যে খেপীকে গাল দিল। কেন যে খেপীর ওপর রাগে ওর সেদিন সর্বাঙ্গ জ্বলছিল, ও নিজেই এখন ভেবে পায় না।

মনছুর মিয়াকেও মারাটা বোধ হয় ঠিক হয় নি। হাজার হোক, সে এখানে অন্যদেশী। এখানকার বাসিন্দা নয়। মনছুর যে সুযোগ পেলে এর শোধ নেবে না তা কে বলতে পারে। তাছাড়া ও শুনেছে, মনছুর পাকা লাঠিয়াল। লাঠির চোট বড় জবর। অনেক সাই সাই মিয়া ওর লাঠির চোট সামলাতে পারে না। কে জানে কখন অন্ধকারে কোণে ঘুপচিতে তার চাঁদি সই করে এক ঘা বসিয়ে দেবে। মাথাখানা দু-ফাঁক হয়ে যাবে।

এ ক'দিন কুমির ঘর থেকে বেরোয় নি মদন। কখনো কখনো চালতেবাগানে গিয়ে বসেছে। কিন্তু বেশি দূরে যায় নি। ওর ইচ্ছে আছে, এবারে একদিন হাটখোলায় খলিফার দোকানে গিয়ে মনছুরের সঙ্গে একটা মিটমাট করে আসবে।

বকুলতলার দিকে এর ভেতর আর একদিনও যায় নি মদন। খেপীর কাছে গিয়ে

দাঁড়াবার কোন মুখ নেই ওর। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। যা ভেবেছিল তার কিছুই হোল না।

একটা মাত্র ভরসা কুমি। কুমি বলেছে তার জমান টাকা থেকে একশ' টাকা সে মদনকে দেবে, মদন যাত্রাগানের দল খোলবার চেষ্টা করুক। একশ' টাকায় চেষ্টা করলে আরম্ভ করা যায়। কিন্তু তার জন্যেও তো খলিফার কাছে যাওয়া দরকার।

খলিফাও কি তার ওপর খুব খুশি আছে ? মনে হয় না।

এর ভেতরে খলিফা তিন-চারদিন কুমির ঘরে এসে ফিরে গেছে। শেষ পর্যন্ত কুমি তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছে। বলে দিয়েছে সে যেন কুমির ঘরে আর কখনো না আসে। খলিফা যাবার সময় শাসিয়ে গেছে, কুমি আর মদন দুজনেরই এতে ভাল হবে না।

চারিদিক থেকে শুধু শাসানী! ভাল লাগছে না মদনের। একেবারে ভাল লাগছে না। সব কিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। ভাবনা-চিন্তাগুলো তেমন সোজা রইল না। কেমন হাপছি-খাপছি হয়ে গেল। মনের চিপিতে চিপিতে ময়লা জমে উঠল। মুখ ভার। মন ভার। কোথাও আর বেরোয় না মদন। ওর সবচেয়ে জ্বালা হয়েছে খেপীকে ব্যাপারীর ওখানে নিয়ে যাবার কথাটাও কুমিকে বলতে পারছে না। মনে হচ্ছে, কথাটা শুনলে ও যেন কুমির চেয়েও ছোট হয়ে যাবে।

কুমি মাঝে-মধ্যে ওর বাবরি চুলের ভেতর বিলি কাটতে কাটতে বলে,—তোমার মুখে হাস নাই ক্যান ? ভুতুমের নাগাল বইয়া থাক সব সময় ?

মদন বিষণ্ণ মুখে বলে,—কি জানি, ক্যান য্যান ভাল লাগে না।

কুমির চোখের দৃষ্টি ছুঁচোল হয়।—খেপীর জন্যে মন কেম্‌ন করে ?

—কি যে যা মন ল্যায় তাই কও। খেপীর নি মন আছে যে মন কেম্‌ন করবো ? ও এট্টা উদুম ভূত। মন পরাণের মম্ম ও জানে কি ?

খেপীর ওপর রাগটাও কুমির খুব ভাল লাগে না। কথাটা মেনে নেয়া কুমির পক্ষে সম্ভব নয়। মন পরাণের খপর খেপী জানে না তো জানে কেডা ? অমন একখানা আকাশ মাপা পরাণ কার আছে ? আর মনের খপর ? মনের খপর জানাই তো খেপীর সাধন। মন নিয়ে সাধন।

মদনের এই ঝাঁজটার পেছনে কুমি যেন অন্য গন্ধ পায়। খেপীকে যদি এতই অবজ্ঞা ঘৃণা করে মদন, তবে তার ওপর এত রাগ পুষে রেখেছে কেন! গোসা মানুষে করে কার উপুর ? যারে আপন ভাবে তার উপুরই গোসা হয়। এই ঘিন্না গোসার বাড়াবাড়িটা কুমির কাছে একটু অন্য রকম ঠ্যাকে।

—তোমার রকম-সকম দেইখ্যা হাস আসে।

—ক্যান ?

—খেপী তোমার পর আইলে তার উপুর এত গোসা কর ক্যান ?

মদন তাকায় কুমির দিকে। কুমির চোখে-মুখে গা-জ্বালানী কৌতুক।

—গোসা করুম কি কামে ? ওয়ারে মনিষ্যি বইল্যা ধরি না।

খুক খুক করে ঠোঁট চেপে হাসে কুমি। এ গাল থেকে ও গালে পান এনে বলে,—যাইক। আর চাপসী ত্যাওন থাইক। তোমার দুঃখুটা কি কও দেখি।

মদন বিষন্ন চোখে তাকায়।—দুঃখু যে এট্টু না অয়, কইব্যার পারি না।

—কিয়ের দুঃখু ?

—দল বানাইব্যার পারলাম না। এহ্যানে থাকনের আর কাম কি ?

কুমি বোঝে কথাটা মদনের অন্তরের কথা। যাত্রাগানের দল বানাবার সখটা মদনের ষোল আনা। অথচ ক্ষমতা এক আনাও নেই। কিন্তু খেপীর সঙ্গে যখন মদন সায়রের মেলা থেকে চলে এসেছিল, তখন কি দল বানাবার কথা ভেবে এসেছিল ? মনে হয় না। তা যদি হোত, তবে তখন থেকেই চেষ্টা করে নি কেন মদন ! তখন থেকেই বা এ সব কথা তার মুখে শোনে নি কেন ? দল বানাবার কথাটা তার মাথায় এল কবে থেকে ?

মনে মনে হাসি পায় কুমির। কথাটা বলতে গেলে সেই তার মাথায় ঢুকিয়েছিলো। বলেছিলো, এমন করে বসে বসে খেপীর ঘাড়ে খাওন-পরণ তার উচিত হয় না। কুমিই তাকে খেপীর কাছ থেকে সরিয়ে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কুমিই খলিফাকে বলে তাকে নেশা করিয়েছিল।

আজ মদনের এই বেদন-কাঁদনের মূলে কুমি নিজে। মদনের বোগদা মনের কোনো ঘাপ্‌চিতে কুমিই চিপিচুপিতে ত্যারছা ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার পরিণাম যে এমন হবে কুমি ভাবে নি। কুমির কাছে মদন এসেছে ঠিকই। সে তাকে টেনে নিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু যে মদনকে সে চেয়েছিল সে মদনকে পায় নি। এ যেন বাঁকাত্যাড়া এক অন্য মনিষ্যি।

কখন ভূতুমের মত মুখ কালো করে বসে থাকে, কখনো হামলা-হামলি করে। কখনো তেড়িবেড়ি করে কথা বলে ওঠে। মদন কেমন যেন ভেঙেচুরে দুমড়েমুচড়ে গেছে।

আস্ত সাই জোয়ান মানুষ—সোজা বুদ্ধি সোজা মনের মানুষ মদন আর নেই। সে মদনকে ও পায় নি।

কুমি মেয়েনামুষ। মিচ্‌কা শয়তানী বুদ্ধি তার কম নয়। তা নইলে পাঁচ মর্দার ভাত খেয়ে এমন আরামে জিরিয়ে থাকতে পারত না। ওর চোখা মাইয়ালী বোধে ও

পরিষ্কার বোঝে যে খেপীই জিতেছে। খেপীর কাছ থেকে আসল মদনকে সে কোটনামী করে সরিয়ে আনতে পারে নি।

আর একটা পান মুখে দেয় কুমি। মুখটা বিস্বাদ লাগে। তিতা লাগে। নিজেকেই নিজের তিতা লাগে কুমির। সত্যিই সে ছাইকপালী। কপাল ভাল তার কখনো হোল না।

মিছিমিছি মদনকে নষ্ট করল সে। মদনের তাজা সরেস মনখানা পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ভুস্যিনাশ করে দিল। নিজের নষ্ট পচা দুষ্টামীর জন্যে মদন পচে মরল। আই আই, ছি ছি, এডা সে কি কম্ম করে বসল।

এলো চুলে কালো মুখখানা ঘেমে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। চোখদুটো ওর লালচে বরাবরই। সব মিলিয়ে ওকে যেন জলে-ভেজা একটা শুশুকের মত দেখাচ্ছিল। নিজের চেহারা আন্দাজ করতে পারছিল কুমি। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে ত্যাকতেকে পচা পাঁকে হাবুডুবু খাওয়া একটা কুত্তার মত মনে হচ্ছিল নিজেকে।

বড় একটা নিশ্বাস ফেলে কুমি বলল,—তুমি খেপীর কাছে চইলা যাও আবার।

চোখ টান টান করে তাকাল মদন। কুমি বলে কি! সে আবার খেপীর কাছে যাবে? কুমির মাথা খারাপ হোল।

—খেপীরে আমি কইয়া দিমু অনে। তোমার কোন দোষ নাই। সগগল দোষ আমার।

কয় কি কথা! কিসের দোষ? কার দোষ! সে নিজে ইচ্ছে করে খেপীর কাছ থেকে চলে এসেছে। আর কি যাও বললেই যাওয়া যায়। খেপীই বা তাকে আর রাখবে কেন? খেপী কি জানে না যে সে কুমির সঙ্গে বসবাস করছে! এর-পরেও কি খেপী তাকে জায়গা দেবে?

মদনের গলায় ঝাঁজ দেখা দিল।—তয় আগে কইলা না ক্যান। অখন কও খেপীর কাছে যাইতে।

কুমির মুখটাও গম্ভীর। ঘামে তাপে চকচক করছে। বলে,—আগে আবার কমু কি!

—যখন আইলাম, তখন কইল্যা না ক্যা?

—তখন অত শত বুঝি নাই।

—বুঝনের কি আছে। তুমি কি কইব্যার চাও?

কুমি গরম হোল না। ক্লান্ত স্বরে বলল,—তখন বুঝি নাই। খেপীর কাছে থাকনেই তোমার মঙ্গল।

—আরে আমার মঙ্গলদেখুনীরে! গ্যাড়ে-খ্যাড়ে আগুন দিয়া পেত্নী বসে আলগোছ হইয়া। তর অই ভুটকোয়ারায় আমি ভুলুম না। আইছি যখন আইছি। আর যামু না।

কুমির গলাটা শুকনো কড়া। বলল,—আমি তোমারে থাইকবার দিমু না।

—তর ঘাড় দিব। বেশি চ্যাচাইস্ না কৈল। পিটাইয়া সপাট কইর‍্যা দিমু।

মদন টং হয়ে গেছে। একটুতেই ভীষণ রেগে যায়। আগুন হয়ে যায়। নইলে কি করে ও বলতে পারে কুমিকে পিটিয়ে সপাট করে দেবে। ও কি ভেবেছে। পিটিয়ে মেরে থাকবে কুমির কাছে? কুমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। না। সে মদন আর নেই। সেই শান্ত নম্র বলিষ্ঠ জোয়ান মদন কোথায় গেল। খেপী, রাক্ষসী তাকে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি দিয়ে নিজের কাছে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার কাছে মদনের প্রেতকে পাঠিয়েছে। খেপীই জিতেছে। সে চেষ্টা করেও জিততে পারে নি।

কুমির মুখখানা যেন আমচুর হয়ে গেল।

—পিটাইবা পিটাও। অখনই পিটাও।

ঘরের কোণ থেকে ঝাঁটাটা এনে ধরল মদনের সামনে।

—এই লও। পিছা দিয়া পিটাও।

মদন চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে কিছুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে চালতেবাগানে। তখন বিকেল হয়ে আসছে। চালতেগাছের আগায় ডালে পাতায় রোদ্দুরের শেষ ঝিলকানি তখনো আছে। তলায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ছায়া-ছায়া অন্ধকার। বাতাস ডালে পাতায় ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে এসে লাগছে।

একটা মাটির ঢিপির ওপর গিয়ে বসল মদন।

শান্ত স্তব্ধ বাগানে ঠাণ্ডা বাতাসে মেজাজটা যেন ঝিমিয়ে এল।

মনটা কি পাবার জন্যে যেন ছটফটিয়ে উঠছে মাঝে-মধ্যে। কি যেন হারিয়েছে মদন। এতক্ষণে নিস্তব্ধ বাগানের এই ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডায় বসে হঠাৎ ওর মনে হয় কি যেন হারিয়েছে ওর। ছাতিফাটা তেষ্টায় এক আঁজলা ঠাণ্ডা জল পাবার জন্যে যেন পরাণটা আইঢাই করে। তেমনি অবস্থাটা ও পরিষ্কার টের পাচ্ছে আজ।

চোখের সামনে ভেসে উঠছে বিদ্যাধরীর মুখখানা। দীঘির মত নিথর ছায়া-ছায়া বড় বড় দুটো চোখ। কাঁসার মত নিভাঁজ নিটোল দেহখানা। লাবণ্য উপচে পড়ছে অঙ্গে অঙ্গে।

সেই ফাঁকা মাঠের পশ্চিম কিনারার আকাশখানা কাকের ডিমের মত অন্ধকার। বকুলগাছের ডালপালার ঝপঝপানি। সাঁই সাঁই করে হাওয়া দিচ্ছে। উই মাঠের আল ধরে আসছে বিদ্যাধরী। মস্ত মেঘলা আকাশখানার মধ্যে যেন একটা নরম পাখীর

মত উড়াল দিয়ে আসছে। চুল উড়ছে। ফুলে উঠেছে শাড়ির আঁচল। টান টান দেহখানা ধনুকের মত বেঁকে গেছে। হাতখানা উঁচু করে একতারাটা তুলে ধরেছে।

ধু-ধু মাঠ আর আকাশে নিঃসীম মেঘের মাঝখানে বিদ্যাধরী—কি রূপের বাহার!

হায়রে রূপের কেরামতি! পিকিতি যেন বিদ্যাধরীর অঙ্গে-অঙ্গে রূপ জোগায়।

খেপীর আওয়াজ কানে লাগে :

ছলবল ছলবল নদীর জলে
তুফান ওঠে ভারি।
গুরগুরাইয়া কম্প ওঠে,
তুমি গো কাণ্ডারী।

হায়রে হায়! পরাণডা আখের মত মোচড়ায়। কি দেখেছিল মদন। কি পেয়েছিল। সবই কি তার হারিয়ে গেল। সব হারিয়ে গেল? বিদ্যাধরীকে সে বোঝে নাই। সে সর্বস্ব খুইয়ে বসে আসে। তার সব গেছে। সব হারিয়ে গেছে! মদনের বুকের ভেতরে মুচড়ে মুচড়ে রক্তাক্ত করে ফেলে।

উঠে পড়ে মদন। এখানে বসে থাকতেও ভাল লাগছে না।

হাটখোলায় যাবে মদন। অনেকদিন পর আজ হাটখোলায় যাবে। নেশা করবে। নেশা না করলে বাঁচতে পারবে না। বিদ্যাধরীকে ভুলতে পারবে না।

ওখান থেকে উঠে মাঠের পথে এগোয় মদন। খলিফার দোকানে যাবে মদন। খলিফাকে গিয়ে তুতিয়ে বুতিয়ে বলবে। সে কুমির ওখানে থাকতে চায় না। তাকে থাকবার একটু জায়গা যদি কেউ দিতে পারে, তবে সে কুমির কাছ থেকে চলে আসবে। খলিফা বলেছিল যাত্রাগানের দল খোলবার জন্যে সে তার বাড়ির বাইরের দিকের একটা ঘর ছেড়ে দেবে। যদি ঘরটা দেয়। সেখানেই থাকবে মদন। দল একটা খুলে বসবে। টাকার জোগাড় পরে ধীরে সুস্থে করে নিতে হবে। তার কাছে এখনো সামান্য কিছু টাকা আছে। সেই টাকায় দলের গোড়ার দিককার খরচ আর তার খাওয়া খরচ চলে যাবে। আর কারো [illegible] থাকবে না মদন। একা থাকবে। আর যদি একা থাকবার মত একটু আশ্রয়ও না মেলে তবে চলে যাবে দেশে। বেতুলগঞ্জে মুড়িয়াল গাঁও। তার নিজের গাঁও। নিজের ঘরে চলে যাবে। যদিও সেখানে তার বোন-ভায়েরা ছাড়া আর কেউ নেই তবু সেখানেই গিয়ে যা হোক কিছু করবার চেষ্টা করতে হবে।

কুমির ঘর থেকে সে চলে আসবে বললে খলিফা নিশ্চয় খুশি হবে। এখানে থাকতে

হলে খলিফাকে ভরসা করেই থাকতে হবে তার। মেয়েমানুষের ওপর আর ভরসা করবে না মদন। ওরা এক-একখানা ব্যাড়াজাল। একবার জালে পড়লে দাফানি সার। আর জালে পড়নের কাম নাই।

সব আলায় বেইমান! খেপী কুমি সগ্‌গলে বেইমান। কেউ তার পরাণ দেখল না। তার ভালমন্দ চাইল না। যে যার নিজের তল্‌পি গুছায়। খেপীর ওপর ভরসা করে চলে এল মদন এখানে। সায়রের মেলা থেকে সর্ব ত্যাগ করে চলে এল খেপীর টানে, খেপী তার কি মর্যাদা দিল। কি মান দিল তাকে? তার দিনরাত্তিরের খপর খেপী কি রাখে। কতটুকু জানে তার পরাণের বিত্তান্ত?

থাকবে না আর এখানে। চলে যাবে বেতুলগঞ্জে মুড়িয়াল গাঁওয়ে। সব আলায় বেইমান।

গোঁ ভরে হনহনিয়ে পা ফেলে চলে এল মদন হাটখোলায়—মাঠ ভেঙে যখন সড়লে উঠল মদন, কেমন যেন গা ছম্‌ছম্ করছিল। একটু ভয়-ভয় লাগল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মদন। ভাল করে লক্ষ্য করল হাটখোলার দিকে। প্রথম সারির দোকান-পাট সব বন্ধ! পরমানন্দর দোকানও বন্ধ। বাঁ দিকে শুধু মশলা-পাতির দোকানটার সামনে একটা লম্প জ্বলছে। ওটা খোলা থাকে অনেক রাত পর্যন্ত। কেরাসিন, বাতাসা, জিরে-মরিচ-হলুদ সওদা করতে আসে বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা। ওখান থেকে সিধে চোখ ছোট করে তাকাল মদন খলিফার দোকানের দিকে। বাতি যেন জ্বলে মনে হয়। খুব আবছা। ভাল করে বোঝা যায় না চাঁদের আলোয়।

চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে। সড়কে ধুলো সাদা আলোয় চিকচিক করছে। হাটখোলার মধ্যিখানে মস্ত ঝাঁকড়া পাকুড় গাছের পাতা আলোয় নড়েচড়ে ঝলমল করছে। নিচে ঘন ছায়ার অন্ধকারে টিনের মস্ত ছাপরা। এখানে সকালে অথবা হাটবারে মাছের কেনা-বেচা হয়।

মদনের কালো মস্ত বুকখানা ঠেলে একটা বড় নিশ্বাস বেরিয়ে এল। আরও একটা দিনের কথা মনে হয়। থমথমে রাতে সেদিন চাঁদের আলোর ঢল নেমেছিল, খেপীর ছাপরায় বসে স্পষ্ট দেখেছিল মদন খেপীর দেহখানা যেন চাঁদের আলো জমিয়ে জমিয়ে বানান। নরম আলো-আলো দেহখানা। মদনের বুকে তুফান উঠেছিল সেদিন। সে রাতের কথা ভোলনের নয়। সে কথা কাউরে কওনের না।

আরও একটা বড় নিশ্বাস ফেলে মদন।

ভাল লাগে না। ও বেশ বুঝতে পারে। খেপীর টান জবর টান। আলায় কাত্তিকে ভাইটাল স্রোতের টানের মত পা ধরে টানে। পরাণ ধরে টানে। এ টান সামাল দেওয়া তার কম্ম নয়। খেপী ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না। এই আলোয় এই সড়কে

যদি এখনি খেপী তার সঙ্গে থাকত, তবে এই পরাণটা এখনই ডগমগিয়ে উঠত। এই আলোয় ধুলোয় মাঠে বাতাসে খেপীর ছোঁয়ায় সব যেন জ্যান্ত হয়ে উঠত।

খেপী জ্যান্তে মরা। কিন্তু মরা জিয়োতে পারে। গাছের পাতাও যেন মুড়মুড়িয়ে ওঠে খেপীর গায়ের বাতাস পেলে। খেপী ভাইটাল স্রোতে টানে আর উজানে ভাসায়।

মদন ভুঁইয়া পায়ের কাছে সুড়-সুড়ানিতে চমকে তাকাল। ইরে শালা একটা সাপ! লাফিয়ে চার হাত সরে এল মদন। সাপটা সড় সড় করে সড়ক থেকে নেমে গেল।

মদন অবাক হোল। কি কাণ্ড! সে এতক্ষণ এই সড়কের মাথায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছিল! এত ভাবন-চিন্তন তার কোন কালে ছিল না। তার হোল কি? সাপটা কখন এসেছে, সে দেখতেও পায় নি? এমন বেভুল সে কখনো হয় না।

ভাবনের আর কাম নাই। চুলায় যাউক খেপী।

সায়রের মেলায় জল খেতে গিয়েছিল পুকুরে। সাপ দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল কুমি আর বিদ্যাধরী। এগিয়ে এসেছিল মদন। তখন সে যাত্রাদলের মদন ভুঁইয়া।

তারপর সেই রাতে তাকে খেপী কি গুণতুক করে ফেলল। মন্তরের বন্ধনে বাঁধন দিল। কুমি কিন্তু বলেছিল তাকে—খেপী কইল্ গুণতুক জানে।

সে বিশ্বাস করে নি। ও সব মাইগ্যা কথায় সে একটুও বিশ্বাস করে না। এখন যেন মনে লয়, কুমি বান ঠিকই কইছিলো। কথাখান আজ্ঞ পষ্ট লাগে। কেমন ভয়-ভয় করে। এমন ভয়-তরাস তো তার কখনো ছিল না!

ধেত্তেরি! আর ভাবন-চিন্তনের কাম নাই।

মদন গা ঝাড়া দিল। এ[illegible]য় চলল হাটখোলার দিকে।

তবু ভয়-তরাসের ধুকধুকানি যায় না।

কে জানে খলিফার দোকানে মনছুর আছে কিনা! থাকলে তাকে মেরে বসবে নাকি। পরমা হালুইকর, তার সঙ্গে মদনের শত্রুতা নেই। মনছুর যদি ধাপ্সি দিয়া তাইড়া আসে, পরমা নিশ্চয় তাকে আটকাবে। কিন্তু খলিফা? দাশু শেখ তো তার ওপর মোটেই খুশি নয়। দু'তিন রাত্রি কুমির ঘরে গিয়ে ফিরে এসেছে। কুমি তাকে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে, আর যেন তার ঘরে [illegible] না আসে। রাগটা তার কুমির ওপর যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি তার ওপর।

কেন যে দাশুর রাগ, বোঝে না মদন। কুমির ঘরে গিয়ে কি সুখ পায় দাশু। কোন টানে খলিফা চক্কর দিয়া দিয়া কুমির দুয়ারে যায়? রাম রাম। খলিফা কি মিনিষ্যি না কুত্তা? তাই কুত্তাডারে ডয়? না ভয় করবে না মদন। ও সব মনিষ্যি ভয়ের যুগ্যি না।

খলিফার দোকানের দরমার ঝাঁপ সরিয়ে ভেতরে তাকাল মদন। যা ভাবন গিয়েছিল ঠিক তাই। ছোট কলকের চক্কর চলছে। চাটাইয়ের ওপর বসে খলিফা। মনছুর আর পরমা। এক পাক দু'পাক ঘুরে এসে এখন পরমার হাতে কলকে। পরমা তাকাল মদনের দিকে। কলকের তলায় ত্যানার টুকরো ভালো করে এঁটে নিচ্ছিল !

তাকাল খলিফা—আরে বাইর‍্যার বাইর‍্যা। এতদিন আছিলা কোয়ানে ?

খলিফার মুখে হাসন দেখে মদন একটু অবাক হলো। খলিফার ঘুম-ঘুম চক্ষু দুইটা সামান্য লাল, হাসিতে ভরা। মুখের কোনখানে গোঁসার চিহ্ন নেই।

—আইয়, চক্করে বইয়া যাও।

অভ্যর্থনা জানাল খলিফা। পরমার গাল দুটো তখন বাটির মত গর্ত হয়ে গেছে। চোঁ চোঁ করে প্রাণপণে টানছে। ছোট কলকের মাথায় পদার্থটি গনগনে আগুনের মত লাল হয়ে উঠেছে। দুটো-চারটে ফুলকি উঠল।

খানিক ধোঁয়া গেলবার চেষ্টা করে খানিকটা ফুরফুর করে ঠোঁট ছুঁচোল করে বার করে দিল।

মদন গিয়ে বসল।

পরমা আর খলিফার মাঝখানে বসল। মনছুর তাকাল ওর দিকে। না। তেমন তেড়িবেড়ি করে তাকাল না। কেমন যেন মিনমিনে তাকানি। ভয়ে তয়ে তাকাল মনছুর।

কলকেটা মদনের দিকে বাড়িয়ে পরমা বলল—লও কত্তা তুমি আগে লও।

মদন মনছুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—উয়ারে দ্যাও।

মনছুর হলদে দাঁত বার করল একটুখানি। পিনপিনা স্বরে বলল—তুমিই লও মদন ভাই।

মদন অবাক হোল আর একবার। না। সে যা ভেবেছিল তা নয় ; মনছুর একটুও রাগ করে নি। বরং একটু ভয়-ডর দেখছে তার চোখে-মুখে। তাকে মান দিয়ে খুশি হতে চাইছে। ভাব-সাব বোঝন ভার। ও যা ভেবেছিল ত্যামন কিছুই নয়। কেউই তার ওপর ত্যামন টং হয়ে বসে নেই। কেউই তাকে ত্যামন তেড়িবেড়ি করে উঠল না।

কলকেটা নিল মদন।

মনখান বেশ খুশি খুশি ঠেকছে। ভালই হোল। বল-ভরসা করে ভাগ্যি সে এসেছিল। তাই খাঁমচা-খামচি, তক্কাতক্কি কিছুই হোল না ! সব যেন আপনি মিল-মিশ হয়ে গেল।

কয়েকটা পাক ঘুরল কলকেটা।

কালা মদনের চোখ দুটো তখন কামরাঙার মত লাল।

মদনের পরাণটা তখন নিশ্চয় টানটান। মনছুরের পিঠে একটা হাত রাখতে ওর একটুও ভয়-সঙ্কোচ এল না। ও ভোম হয়ে মনছুরের দিকে তাকাল।

মনছুরের অবস্থাও তেমনি।

আস্তে বলল মদন—গোসা কইরো না মনছুর ভাই।

মনছুর বলল—গোসা করুম কি কামে। তুমি নি কোন তাল-মাতাল না পাইয়া আমারে দুষি কইর‍্যা বইলা।

—না, তোমার আর দোষ কি?

মনছুর তাকাল খলিফার দিকে—কওছে কথা। ব্যাপারী মাছ খেলাইয়া মাছ তোলে। তাও নি বুঝল্যা তুমি?

মদন তাকিয়ে রইল। খলিফা ঘুমঘুম চোখে মিটিমিটি হাসছিল।

মনছুর বলল—ব্যাপারী কইল, আলীরে পেথম চোটে বড়শী আলগা দিলাম। পরে আর একবার আনবার কইস। এক্কারে গাইথ্যা ঘরে তুলুম।

হ, কথাখান মিথ্যা নয়। মদন বোঝবার চেষ্টা করে। প্রথমবারে ব্যাপারী বঁড়শী আলগা দিয়েছিল। মাছ খেলুক মাছের বিশ্বাস জন্মাক, তারপর গেঁথে ঘরে তুলবে। তখন আর বেশি জোরজার করতে হবে না। বেশি বাইড়া-বাইড়ি, হামলা-হামলি করতে হবে না। হ, কথাখান সরেস কথা।

—আবার লইয়া যামু?

—হ' নিচ্চয়। এবার আইলে আর ফিরত যাইব না। আলায় গুদাম ঘরে আটক পড়ব।

মনছুর বল[illegible] আবার।—এবার নিলে হাতে হাতে টাহা দিয়া দিমু।

মদন তবু বলল—ব্যাপারীর সাথে কি পাকা কথা অইছে?

হ, তবে আর কই কি? তেনা কইল আর একবার আনবার কইস।

মনছুর তো বলেই খালাস। কিন্তু খেপীকে আরও একবার কালাকান্দি ব্যাপারীর কাছে নিয়ে যাওয়া সহজ কম্ম নয়। এখন ও খেপীর কাছে থাকে না। খেপীও তার কাছে আসে না। এর ভেতর একদিন ঘাটে দেখা হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। খেপী ঘাটের উল্টো পাড়ে হাঁটুজলে নেমে কলমী শাক তুলছিল। স্নান করতে গিয়েছিল মদন। খেপীকে দেখল, নিচু হয়ে কলমী শাক তুলছে। শাড়িখান হাঁটুর কাছে ওঠা। পুষ্ট পা দুখানার দিকে তাকিয়ে ছিল একটু সময়। মুখের দিকে তাকায় নি। তাকাতে পারে নি।

স্নান করতে করতে ভেবেছিল, খেপী হয়তো একটা হাঁক তুলবে ওপাড় থেকে একবার হয়তো একটা ডাক তার কানে পেঁছিবে। কিন্তু কোন সাড়াশব্দই পেল না। খেপী তাকে পুরোপুরি গেরাজ্যির ভেতরে আনল না।

না কি তাকে দেখে নি খেপী? ও স্নান সেরে ফেরবার মুখে আরও একবার ত্যারছা চোখে তাকিয়েছিল। দেখেছিল। একমনে কোঁচড়ে কলমী শাক তুলছে খেপী। কোনদিকে নজর নেই।

হতে পারে তাকে হয়তো দেখে নি। ও আগেও দেখেছে, খেপী যখন যা করে, একমনে করে। গাছের দিকে নজর যদি থাকে, তবে সে নজর সড়কি ফলার মত ছুঁচলো হয়ে দ্যাখে গাছের দিকে। মেঘ দ্যাখে তো মেঘই দ্যাখে। চক্ষু তখন তারা-তারা। নজর ঘোরে না। চমকায় না। খেপীর নাও টাল-মাটাল হয় না।

কলমী শাক তুলছে তো তুলছে। মনখান ছড়ায় না। ছিটায় না।

তাকে বোধহয় দ্যাখে নি খেপী। দেখলেও কি কথা কইত? কইত না!

খেপী জানে। সে কুমির ঘরে এসে পাড়া গেড়েছে। তাই বোধহয় কুমির ঘরে আর একদিনও আসে নি খেপী। কুমির সঙ্গে ওরা দেখা হয় কি না কে জানে। কুমিকে কখনো জিজ্ঞেস করে নি মদন। জিজ্ঞেস করে কি আর লাভ। কুমিকে খেপীর কথা জিজ্ঞেস করতে ওরা কথা জিভের কাছে এসে আটকে গেছে। জিজ্ঞেস করতে পারে নি। কি ভাববে কুমি? ভাববে তার খেয়ে তার পরে এখনো মদন খেপীর খবর লয়।

আরও একবার তাকে ব্যাপারীর কাছে নিয়ে যাওয়া সহজ কম্ম নয়।

মনছুর ভাই যদি এ কথা বলত, তবে মদন হয়তো সেইদিনই পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে কুমির ঘরে চলে আসত না। দু দিন সবুর করত। আবার খেপীর মন ভিজিয়ে তাকে কালাকান্দি যেতে রাজী করাবার চেষ্টা করত। সেদিন মনছুর বলল না কেন? এখন খেপীকে কি করে আর নিয়ে যাবে?

—সেদিন কও নাই ক্যান?

—কি কইর‍্যা জান্নুম ব্যাপারীর মতলবখান! কও কথা। তোমার বোধভাস্যি ভেদা মাইর‍্যা গ্যাছে।

তাও তো বটে। কি করে জানবে মনছুর! পরে ব্যাপারীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছে। আর একবার নিয়ে আসুক বিদ্যাধরীকে। এবার বঁড়শীতে গেঁথে তুলবে ব্যাপারী।

একটু চাপ দিল মদন—এউগ্‌গা কাম কইরব্যার পার?

—কও।

—ব্যাপারীর কাছ থিক্যা অগাম কিছু টাহা আইনব্যার পার নি?

মনছুর লাল চোখ মেলে তাকায়।—কয়ডা?

—গোটা পঞ্চাশেক। কি কও খলিফা।

খলিফাকে সাক্ষী মানে মদন। খলিফা ঘুম-ঘুম চোখে বলে—হ, কথাখান ক্যালনা না। উচিত কথা কইছে মদন ভাই। আগাম টাহা না দিলে কি অমুন দব্য বার বার লওন যায়?

মনছুর আবার তাকাল মদনের দিকে।

—বেশ। কাইল দিমু টাহা। কথা কইল নড়চড় না হয়। কবে লইয়া যাইবা উন্নারে?

মদন একটু ভাবে।—কাইল টাহা দিলে হাটবারে লইয়া যামু।

মঙ্গলবার হাটবার। মঙ্গলবার বিদ্যাধরীকে আবার কালাকান্দিতে নিয়ে যাবে মদন। হ, কথার নড়চড় হবে না। টাকা পঞ্চাশটা হাতে পেলে দেহে বল আসবে। খেপীকে বশে আনতে বেগ পেতে হবে না। টাকায় কি না হয়। টাকা কিছু খরচা করলে কুমি খেপী সব কুত্তার নাগাল বশে। টাকা বড় জবর চিজ।

যাত্রার দল তাকে বানাতেই হবে। কিছুতেই ওই ভাবনাটা মদনের মাথা থেকে যায় না। টাকা তার চাই। পঞ্চাশ যদি কাল পায়। কুমির জমান টাকাটাও পাওয়া যাবে। তারপর ব্যাপারী যদি আর টাকা নাও দেয়, তবে খলিফার কাছ থেকে কিছু টাকা হাওলাত করে মোটামুটি একটা দল বানিয়ে ফেলবার চেষ্টা করবে মদন। দলের কত্তা মদন। যাত্রাদলের সব্বময় কত্তা।

ভাবতেই বুকখানা চিতিয়ে ওঠে; দেহখানা চনচন করে ওঠে।

মনছুর উঠল। মদনের টাকার চাপটা হজম করে একটু রুক্ষ স্বরে বলে উঠল—কথার যদি খ্যালাপ হয়—

কথাটা শেষ করল না মনছুর। শেষ করার দরকার কি? বোঝাই যায়। কথার যদি খেলাপ হয় তবে মনছুর সহজে ছাড়বে না। অথবা আবার একটা জবর হামলা-হামলি শুরু করবে।

চলে গেল মনছুর। পরমা হালুইকর একটা হাই তুলে উঠে পড়ল।

চুপ করে বসে রইল মদন। আবার সেই ভাবন-চিন্তন। কি করে খেপীকে আবার নেওয়া যাবে কালাকান্দির হাটে। খলিফা ঘুম-ঘুম চোখ মেলল এতক্ষণে। একটু মিচ্‌কি হেসে বলল,—অখন যাইবা কোয়ানে?

তাকাল মদন। খলিফা যেন কিছু একটা বলতে চায়।

—কোয়ানে যাইবা। কুমির ঘরে?

কথা বলল না মদন।

—কামখান কইল ভাল করলা না মদন ভাই।

খলিফার মুখের হাসিটা কঠিন হয়ে উঠল—আমারও কপাল। তোমারও কপাল। দেখা যাউক।

মদন কোন কথা বলতে পারল না। কওনের কি আছে ওর। সবাই সব জানে। এখানে আসবার আগেও ভেবেছিল খলিফাকেই কুমির ঘরে আবার যেতে বলবে। কিন্তু এখন আর বলতে পারল না।

—কাইল আবার আইবা ?

—আমুম।

বলে উঠে পড়ল মদন। খলিফার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চৌদ্দ

বকুলতলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মদন ভুঁইয়া।

চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে মাঠ জুড়ে। ঝাঁকড়া বকুলগাছটার নিচে অন্ধকার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চক্ষু মেলে তাকাল মদন। কান পাতল।

বাইল জোছনায় আবছা দেখা যাচ্ছে বিদ্যাধরীর ছায়া-ছায়া দেহখানা। বসে রয়েছে ঘরের সামনে।

পিরীত কেমুন জানলাম না।
মনদরদী খুইজ্যা পাইলাম না।

আপন মনেই বোধ হয় ঠাণ্ডা-নরম আওয়াজ তুলেছে খেপী। ফুরফুর হাওয়ায় আওয়াজটা যেন তিরতিরানি কাঁদনের মত মনে হয়। মদন থম ধরে দাঁড়ায়। কান পেতে থাকে। বকুলগাছে ডাল-পাতা নড়ে ওঠে। বোধ হয় পক্ষী আড়া দিল কয়েকটা বকুলতলার ডাল থেকে। মদনের বুকের ভেতর তিরতিরানি স্রোতের মত খেপীর আওয়াজ ওর দেহখানাকে অবশ করে দেয় যেন। ভাল লাগে না আর দাঁড়িয়ে থাকতে। একটু বসতে ইচ্ছে হয়, দু-দণ্ড জিরোতে ইচ্ছে হয়। এই বাইল জোছনায় ওই ঘরের সামনে মাটির ওপর যদি ও খেপীর পাশে দু-দণ্ড বসতে পারত। একটু জিরিয়ে সাতিয়ে নিতে পারত!

মদন ভেবে অবাক হয়। কালাকান্দির ব্যাপারী একটা বোগ্‌দা ছাতা। ওর আক্কেলখান কি ? খেপীর কাছে সে কি পাবার আশা করছে। খেপীর ওই দেহখান।

আরে রাম, রাম। খেপীর দেহখান পেলে খেপীর কাছে কিছুই পাওয়া হোল না। এই মম্মটুকও বোঝে না ব্যাপারী! খেপী অনেক বেশি দিতে পারে। মন পরান টইটুম্বুর করে ভরে দিতে পারে। সে যে কি মদন তা বলতে পারবে না।

খেপীর এই পাওয়াই জবর-পাওয়া। মদন পেয়েছে। দুটো-একটা দিন খেপী তার মন পরাণ ভরে দিয়েছে। খেপী বলে, রসে ভরে যায়। রস কি তা মদন জানে না। ও সব বাউলানী বোলের মম্ম জানে না। ও শুধু বুঝেছে দুটো একটা দিন তার পরাণটা থরথরিয়ে দিয়েছে খেপী। দেহখান শিরশির করে উঠেছে ফূর্তিতে। বুকখানা মনে হয়েছে মস্ত আকাশের মত। সেখানে কালি-ধুলার বালাই নেই।

এ যে কি, মদন বলতে পারবে না। খেপী বলে, রসের চাখা-চাখিতেই এমন হয়। তা হবে। আর এই রসের স্বাদখান যে পায় নি সে জানে না যে এয়ার কাছে মাইয়া-মানুষের দেহের লোভ কত তুচ্ছ হয়ে যায়। মদন জানে। তাই বোধহয় কুমির এমন কামার্ত যৌবন তার এত বিস্বাদ লাগে। মাঝে মাঝে এত খারাপ লাগে কুমিকে। কুমির দেহের আকর্ষণে ও কখনো খলিফার মত ছটফটাইয়া ওঠে না।

রসে-বশে থাকার কি সুখ, সে দুটো-একটা দিন জেনেছে। সে সুখের তুলনা খুঁজে পায় না মদন।

ব্যাপারী একটা আস্ত ম্যাড়া। খেপীকে যদি নেবেই তার কাছ এই রসের সন্ধান করুক। কি পাবে ব্যাপারী খেপীকে আটকে রেখে। তার দেহটার ওপর অত্যাচার করে? কিছুই পাবে না।

মদন বকুলতলার অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে।

ওই তো বিদ্যাধরীর ভিটে। ঘরখানের সুমুখে তখনও বসে রয়েছে বিদ্যাধরী। উবু হয়ে বসে।

আর একটু এগোয় মদন। ঘর-বাইর চান্দের আলোয় মাখামাখি।

মদন কেমন বল পায় না মনে। কি করতে কি করে যেন নিজেই বোঝে না।

গাঞ্জার নিশায় হোক বা না হোক, ও যেন একটা নাওয়ের গুণের টান অনুভব করে। গুণের সুতায় টান পড়ে মাস্তুলে। নাও চলে। মনে হয় যেন আপনা-আপনি চলে।

মদন এক পাও দুই পাও এগোয়। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে খেপীর পিছনে দাঁড়ায়।

তাকায় খেপীর দিকে। খেপীর চক্ষু দুইটা বকুলতলার পুকুরে জলের ওপর। চান্দের ছায়া পড়েছে জলে। খেপী সেই ছায়া দেখে। দেখছে তো দেখছেই। কোন তাল-তামাল নেই।

এমনি বিদ্যাধরী বরাবর। যা দেখে, তাই দেখতে দেখতে তন্ময়, যেন ভাব লেগে যায়।

চক্ষু দুইটা ওর জানি কাঁদন-কাঁদন ঠ্যাকে। ও পুষ্করিণীর জলের মত নিথর।

বুকের মধ্যে গুরগুরাইয়া ওঠে মদনের। কেমন যেন লাগে। ওকে কি নেশায় পেয়ে বসল? গাঞ্জার নেশা?

একখান শ্বাস পড়ে মদনের।

শ্বাসের ভোঁস শব্দেই বোধ হয় খেপী তাকায়। চমকায় না। চমকাতে জানে না খেপী।

তাকিয়ে দেখে মদন তার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখ দুটো মেলে তাকায়। চোখ দুটো পুষ্করিণীর জলের মত ভিজা ভিজা। জোছনায় ভিজা লাগে।

ফিক করে হাসে। হাসনটুক তেমনি আছে।

মদন কোন কথা বলতে পারে না। চোখ দুটো ওর গাঞ্জার নেশায় লাল। বুকের ভেতরে গুরগুরানি থামে না।

না। কিছু কইতে আসেনি মদন। এমনি এসেছে। কেন যে এসেছে মনে নেই। ঠিক জানে না।

বোধহয় ওর মনে হয়েছিল, খেপী বড় একা। একা শোয়। একা ওঠে, সাঁইয়ের নামে একা একা ঘুর্ণা দেয়। তারপর একা একা খাওন-বসন আর চক্ষু মেলে দেখন।

এত বেশি একা থেকে খেপী কি সুখ পায়? সুখ পায় কি? না কি দুঃখের বোঝা বয়ে মরে।

চিরকালই খেপী একা। মদন যখন ছিল এখানে, তখনো একা। মদন ওর সঙ্গে মিলে-মিশে দুই হতে কখনো পারে নি। আপন মনে তখনো বিদ্যাধরী একা-একাই থেকেছে। কে রইল আর কে গেল ওর কাছে যেন কিছুই কিছু নয়।

আপন মনে ফিসফিসিয়ে ওঠে খেপী—কালা মদন।

এ নামটা ওর দেয়া নাম। ওর মুখেই শোনে মদন। কোন কথা বলে না।

—এত রাইতে কোয়ানে গেছিলা?

মদন কথা বলে না। আস্তে আস্তে ওর পাশে বসে। ও চুপ করে ওর পাশে দু-দণ্ড বসতে চায়। একটু জিরোতে চায়। গণ্ডগোল ম্যামড়া-মেমড়ি থেকে একটু সময় সরে আসতে চায়। খেপীর দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকতে চায়। কেন ও জানে না। গাঁজার নেশার খেয়াল কি না কে জানে!

আবার হাসে বিদ্যাধরী।—মুখখান য্যান শুকাইয়া গ্যাছে?

মদনের মুখ শুকিয়ে গেছে! তা হবে।

মদনের বলতে ইচ্ছা হয়।—তোমারও।

কিন্তু বলতে পারে না। একটা কথা উচ্চারণ করতে ইচ্ছে হয় না। শুধু চুপ করে বসে থাকতে চায় একটু সময়।

বিদ্যাধরী তাকায় ওর দিকে।

কালা মদন কেন যে চলে গেল ঠিক বোঝে না। চলে গেলে ওর কি আসে যায়! ও জানে যাবে আর কোথায়? কালা মদন যে ভিতরের পৈঠায় সর্বদাই বসে রয়েছে। সে কালা মদনকে নিয়ে রসের ভিয়ান চড়িয়েছে। রসে রসে কালা মদন তার বুকের মধ্যে রসিক সুজন হয়ে জাগ্রত রয়েছে। মদন যাবে আর কোথায়। তারই বা দুঃখু কোথায়?

দুঃখু-কষ্ট যদি কিছু থাকে, তাতে তা মদনের দুঃখে দুঃখু।

কেন যে মদন সেদিন কালাকান্দিতে মনছুরের সঙ্গে মারপিট লাগাল। কেনই বা কালাকান্দি থেকে এসে নিজের প্যাটরাটা নিয়ে বিদ্যাধরীর চোখের সামনে দিয়ে হনহন করে চলে গেল কুমির ঘরের দিকে। বিদ্যাধরী বোঝে না। জানে না।

ও শুধু জানে মদন তার পিঞ্জরে ধরা পড়েছে। ত্রিবেণীর ঘাট থেকে তাকে তুলে এনেছে। পাঁচ বাণের কাম কারখানা চলেছে—সে বিভোর হয়ে রয়েছে রসের মাখামাখিতে। মদন তার অধর মানুষ।

সে আর যাবে কোথায়?

চলে যে গিয়েছিল, সে তার ভাবের মানুষ নয়। অন্য মানুষ।

—আছ কেমুন?

আস্তে আস্তে বলে বিদ্যাধরী। হাসি তার লেগেই আছে মুখে।

মদন তাকিয়েছিল ওর দিকে। আর একটা বড় শ্বাস ফেলল মদন। শ্বাসটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই বলে,—ভাল না।

বিদ্যাধরী চোখ মিলে রইল।

কি যেন খুঁজছিল মদনের চোখে-মুখে, কোন কথা বলল না।

মদন চোখ ফেরাল মাঠের দিকে। বকুলতলার উঁচু পাড় থেকে পিছলে নেমে ওর নজর ছড়িয়ে পড়ল সারা মাঠে! দূরে গাছ-গাছালী আগাছার জঙ্গলের কিনারায় একটা আলো জ্বলছে আর নিভছে। আবার খানিক দূরে জ্বলে উঠছে, আবার নিভছে। আলোটা যেন ঘুরেফিরে নেচে বেড়াচ্ছে। ওনারা না কি পথ ভোলান। পথের আগ দিয়ে জ্বলেন আর নেভেন। অন্য গাঁয়ের অচেনা মনিষ্যি ওনার আলোর নিশানায় যদি পথ চলতে থাকেন, তবে সমস্ত রাত ঘুরে মরতে হবে মাঠে আর বিলের ধারে। ওনারা শেষ রাত নাগাদ টেনে নেবেন ওনাদের কবলে।

তারপর সেই মনিষ্যির কলজে থেকে রক্তপান করবেন। ভোর বিয়ানে দেখবে সবাই মানুষটা পিন্‌সা রক্তশূন্য হয়ে মরে পড়ে রয়েছে মাঠের কিনারায়।

খেপীও কি এমনি মাঠের আলো ?

মদন চোখ ফেরায় খেপীর দিকে। মনখান চনমনিয়ে ওঠে আবার। খেপীর আশা যে করে তার জীবনের আশা নেই। ব্যাপারীর কপালে অনেক দুঃখু আছে। ব্যাপারী জানে কার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করছে।

খাবাশী দিয়া পিটাইয়া পিঠের চামড়া তুইলা ফালামু।

আরে বোগদা মাধাই। খেপীকে জান না। গুণতুক করে এমন করে রাখবে যে তোমার হাতের খাবাশী হাতেই থাকবো। শ্বাসের হাওয়া বইবে না। ব্যাপারীর কাজ-কারবারে ঘুণ ধরে যাবে। খেপীর কাছাকাছি বাতাসে এমন টান যে ও টানে পড়ে ব্যাপারী হাবুডুবু খাবে। মনছুর খাবাশী হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। নাকে শ্বাস পড়বে না। চোখের পাতা পড়বে না।

খেপীকে চেনে না। হাওয়ায় হাওয়ায় ফেরে খেপী। ওকে আটকায় সাধ্যি কার। ব্যাপারীর গুদামঘরে কুলোবে না। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যাধরী। গুদামঘর হাওয়ার চোটে খান খান।

ব্যাপারী জানে না, বিদ্যাধরী যখন বড় হয়, তখন ত্রিসংসারে স্থান কুলোয় না।

আশ্চর্য মাইয়ামানুষ বিদ্যাধরী !

মদন জানে, কিছু কিছু মম্ম জানে। তাই ব্যাপারীর ব্যাপার দেখে হাসি পায়।

দূর বাইরা ! এ সব কি অকথা-কুকথা ভাবছে মদন ! গাঞ্জার নিশাটা কি জমেছে বেশি !

মদন একটা চমক ভেঙে তাকায়।

বিদ্যাধরী হাসে, টুকরো টুকরো হাসির চাপা ফিনকি।

—এয়ানে আস না কি কামে ?

মদন বেশ পাল্টা প্রশ্ন করতে পারে—তুমি নি ডাকছ একবার ?

ফিক করে হাসে আবার বিদ্যাধরী,—আমার ডাক শুননের কন্ন নাই তোমার।

কথায় পারে কার সাধ্যি, ওর ডাক শোনবার কর্ণ নেই মদনের। সকলের ডাক শুনতে পায়, আর বিদ্যাধরীর ডাক শোনে নি।

খেপীর চক্ষু আনমনা।—কত ডাকি তোমারে সে ডাক ক্যান পৌছায় না তোমার কাছে ভাইবা মরি।

তাক লাগে মদনের।

হায়রে কথা বিদ্যাধরীর। এ কথার মম্ম কে জানে সংসারে ! মদন মানে বোঝে

কি বোঝে না। কথা শুনে পরাণে অন্য হাওয়া বয়। কি একটা আস্বাদ আছে এ কথার। মানে বলে দিতে হয় না। কত মানুষ দেখল মদন। মাইয়ামানুষ দেখল কম না। কিন্তু এমন আশ্চর্য মাইয়া নি দুইডা চোখে পড়ল।

কুমির কথা। কথার কথা।

বিদ্যাধরীর কথা মন নিয়া টানাটানি করে।

কিষ্টযাত্রার মদন ভুঁইয়া। গাওনায় কথায় তার বোধভাস্যি কিছু কম নয়।

ভাল লাগে মদনের। একটু হাসতে পারে এতটা সময় পরে। কয়টা দিন হাসন কাকে বলে জানত না মদন। মনটা যেন পাথর চাপা ছিল। ভার-ভারিক্কি একটা বোঝা হয়ে ছিল।

এখন এই চান্দভাঙা জোছনায় মদন সত্যি সত্যি হাসে।

—তুমি নি ছিরাধার নাগাল কইলা কথা।

শ্রীরাধাও এমনি কথাই বলত। ও জানে, কিষ্টযাত্রার মদন ভুঁইয়া জানে। ও সব বলন-কথন ওর মুখস্থ। সব পাট গড় গড় করে বলে দিতে পারে। আমার ডাক নি তোমার কানে পৌঁছায় না। তুমি নাকি ভগবান তুমি নাকি ভক্ত বোষ্টমের ডাক শুন। আমার পরাণের ডাক শুনতে পাওনা ক্যান। তুমি নি আমার বঁধু।

হ। এ সব কথার মম্ম জানে মদন।—

আই, আই, কি কথা কইলা!

বিদ্যাধরী মাথা নোয়ায়,—মানুষ ছিরাদা হইবার পারে না। ওনারা দ্যাবদেবী। ওয়াগো সাথে আমাগো তুলনা!

একটু থেমে বলে বিদ্যাধরী,—দ্যাখ ছিরাদা চাইছিল্যান ভগবান কিষ্টরে, আমি ভগবান লইয়া কি করুম। আমি আমার মানুষ চাই। আমার মনের মানুষ। আমার অদর মানুষ। কই কি কথা তোমারে, মানুষ খুইজ্যা যৌবন খোয়াইলাম, মানুষ খুইজ্যা পাই নাই এতকাল। যদি বা পাইলাম, এতকাল পরে, সাইয়ের দয়া হইল না। রসে বশে মিল্যা একাকার হইব্যার পাবলাম না। তবু হাল আমি ছাড়ি নাই।

কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। মদন তাকায় বিদ্যাধরীর দিকে।

—এউগ্‌গা কথা নি কমু?

—কও।

মদন বলে—চলো, দুইজনে সব ছাইড়া-ছুইড়া কোথাও চইল্যা যাই।

বিদ্যাধরী বড় বড় চোখদুটো মেলে তাকায়।

মদন ওর একটা হাত ধরে ওকে কাছে টানতে চায়। বুকের তাওয়ায় একটা চাপা আগুন গন্‌গনিয়ে ওঠে।

ওর হাতের গরমে যেন ছ্যাৎ করে ওঠে বিদ্যাধরী।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ে। ঘরে ঢুকে যায়। একটা কথাও বলে না। আর একবারও তাকায় না।

মদন টং হয়ে বসে থাকে। সে একটা কিছু করতে গিয়েছিল, টের পেয়েছে বিদ্যাধরী। কেন সে এমন হয়ে উঠল হঠাৎ। বিদ্যাধরীকে তার চেনা উচিত ছিল। কেন যে সে আবার একটা গোলমাল পাকিয়ে বসল।

তার ভুল হয়ে গিয়েছিল। কুমি আর বিদ্যাধবী এক নয়।

কেন ভুল হোল। গাঞ্জার নিশাটা তাকে যেন টাল-মাটাল করে দিয়েছে। তবু এই নেশা না হলে সে আজ এখানে এমন করে আসতেও পারত না। এত কথাও বলা হোত না। এমনি অবস্থায় বিদ্যাধরীর সামনে দাঁড়িয়ে সে তাকাতে পারত না। বিদ্যাধরীকে সে ভয় করে। ছদ্দা-ভক্তি করে।

চেতন ফিরে এসেছে মদনের। মনটা যেন ভেঙে পড়ছে আবার।

একটা বড় শ্বাস ফেলে ওখান থেকে উঠল মদন।

বাইরে বেরিয়ে এল। কুমির দিকে হাঁটা দিল।

চালতেতলায় এসে অন্ধকারে দাঁড়াল মদন।

ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে দিয়ে আলো এসে পড়েছে মাটির ওপব। যেন মস্ত একখানা জালের বড় বড় ছিদ্র। এক জালে এসে আটক পড়ল মদন। আলোছায়ার জাল।

কুমির ঘরের দিকে তাকাল, বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে অল্প আলো দেখা যাচ্ছে। ভেতরে কোন সাড়া শব্দ নেই।

আলোটা জালিয়ে রেখেছে কুমি। যদি মদন আসে!

এখনো কি জেগে আছে কুমি? মনে হয় না। দেহের বড় যত্ন তকজুত কুমির। বেশি বেলায় খেতে পারে না। বেশি রাত জাগতে পারে না। হাঁটাহাঁটি দাপাদাপি করতে পারে না মোটেই। ও নিশ্চয় এত রাত পর্যন্ত জেগে নেই। ওর কালো কুচকুচে নধর নরম দেহখানা নিয়ে মাটির ওপর একটা চট পেতে গা এলিয়েছে, নয়তো বা চৌকির ওপর ঢলে পড়ে আছে।

ভাবতেই মনে ঘিনঘিনানি আসে। ঠিক যেন একটা নরম নধর গ্যাদা মইষের মত মনে হয় কুমিকে। গলাটা মাংসল মোটা। ঠিক মইষের গর্দানের মতন। নিশ্চয় হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। লাল জিভ আর মাড়ি খানিকটা দেখা যায় ঘুমোলে, আর তামাক পাতা খাওয়া কালচে দাঁতের আগা গুলান।

ধামরধস্তি মাগী!

আপন মনেই বিড়বিড়িয়ে ওঠে মদন।

আস্তে আস্তে গিয়ে কুলগাছটার তলায় বসে।

ভাবনা ও কোনদিন করত না। কেন যে এখন এত ভাবন-চিন্তন। বসে বসে ভাবনের কম্মই যেন ভাল লাগে।

শুধু ঘুরে ঘুরে মরা, এক মুড়া থেকে অন্য মুড়া।

কপালটাই তার মন্দ। আভাইগা কপাল।

তাই যদি না হবে, তবে বেতুলগঞ্জ মুড়িয়াল গাঁওয়ের মদন আজ রাতে অন্ধকারে কোথায় কোন জাঙালে বসে আকাশ পাতাল ভাবছে। ছোটকালটাই ওর কেটেছে ভাল। ভাবন-চিন্তনের আপদবালাই ছিল না। ভাবনা কাকে বলে জানত না মদন। জমি-জিরাত ছিল। চাষ-আবাদ ছিল। ভাত ডাল ডাটা খড়কের চচ্চড়ি। এর অভাব কাকে বলে জানত না।

বেতুলগঞ্জ, কালাকান্দির চেয়ে কম বড় গঞ্জ নয়। এ গঞ্জে গুড় আর ডালের চালান ছিল বেশি। বেতুলগঞ্জের মটরের ডাল এক ডাকে এ ফুটানিতে মানষে চেনে। ডাল একটা ফুটানি খেলে ম ম গন্ধ ছাড়ে। ডালের এমন সোঁদা গন্ধ আর কোথায় পায় নি মদন। বেতুলগঞ্জের ফাটা ফাটা ঘন মটবের ডাল ঘৃত সোম্বার দিয়ে রেঁধে দিলে তাই দিয়েই ভাত খাওয়া যায় এক বগি। একটা খাওনের মত সামগ্রী।

এ গঞ্জে মটর ডাল আর গুড় চালান যায় গোয়ালন্দে। তারপর সেখান থেকে সারা বঙ্গদেশে।

বেতুলগঞ্জে নেমে খাল বেয়ে নৌকো করে চল, দু পাশে মাঠ খেত, ডোবা পুষ্করণী, গাছ-গাছালী। চল পশ্চিম দিকে নৌকোয় লগি মেরে মেরে। কোথায় নৌকো আটকালে হাঁটু জলে নেমে হেইগো সে ঠ্যালা দাও গলুই ধরে। নাও নিয়ে এস বুক জলে, লাফিয়ে নৌকোয় উঠে আবার লগি ধরো।

কি মজাই যে লাগত! মাঝে মধ্যে ডোঙ্গা নাও নিয়ে একটা লগি হাতে বেরিয়ে পড়ত, মদন আর হইর‍্যা। হরিরাম ছিল তার সমান বয়সী। হইর‍্যাকে নিয়ে টিনের ডোঙ্গায় টলমল করতে করতে এগিয়ে চলেছিল ওরা গঞ্জের দিকে। মুড়িয়াল গাঁও ছাড়িয়ে সনকাপুরের কাছ বরাবর এসে ঢুকে পড়ল এক ঘুটঘুটা অন্ধকার জঙ্গলে। বড় মানষের কোমর জল। কিন্তু ওদের গলা জল। কোথাও বা নাক ডুবে যেতেও পারে। সেই জলের দুধারে বাঁশের ঘন ঝাড়। বাঁশ কঞ্চি কোথাও জলের ওপর নুয়ে পড়ে জলের ওপর কোন ফাঁক রাখে নি। ডোঙ্গা যাবে কোথা দিয়ে?

এত ঘন বুনানির বাঁশঝাড় আর কখনো দেখে নি মদন। বিঘত অন্তর অন্তর বাঁশ উঠেছে, আর তার সঙ্গে আছে বেত ঝাড় আর পাঁচমিশালী আগাছা। দশ-বারো হাত পর পর আম তেঁতুল আর কুলগাছের সারবন্দি জাঙাল।

হায় রে, হায়! সেবারে জীবনখান বুঝি যায়! লগির ঠ্যালায় ডোঙ্গা চালায় কার সাধ্যি। কোথাও এমন ঘুপচি-ঘাপচি নেই যে তার মধ্যে দিয়ে ডোঙ্গা খানাকে বার করে নিতে পারবে আবার সেই খালে। খাল থেকে কি করে যে এসে ঢুকে পড়ল ডোঙ্গাখানা। শালার ডোঙ্গা আটকে গেল কঞ্চি-বাঁশের জালে, আউগায় না, পাইছায় না, এমুন ফাঁপরে মানষে পড়ে!

অরে অই হইর‍্যা। ঘুটঘুট্টি আন্ধার কইর‍্যা আইলো রে।

বর্ষাকাল। মেঘ করেছে কিনা কে জানে। কিছুই ভাল করে দেখা যায় না এমন অন্ধকার।

উপুব দিষ্টে চাইয়া গ্যাখ, সুয্যি দেখা যায়।

হইর‍্যা ঠিকই বলেছিল, হইর‍্যা ছিল তার চেয়েও জোয়ান, আর তেজী। জলে নেমে ডোঙ্গার গলুই ধরে টানাটানি শুরু করেছিল। দুলে দুলে নড়ে উঠল ডোঙ্গাখান। ওদিকের গলুই যেন চড়ে উঠে গেল।

ডোঙ্গা কাইত অইল ক্যান রে?

নাইমা পড়ছি জলে। তুই নাইম্যা পড়।

নামতে ভরসা পাচ্ছিল না মদন। কে জানে এই অন্ধকার জঙ্গলের জলে বিষাক্ত সাপ কিলবিল করে বেড়ায় কিনা! একখান কামুড় দিলে ওই খানেই ঢইল্যা পইড়া মিত্যু। কেউ জানবে না, শুনবে না, কে আর তাদের খবর করতে আসবে এই জঙ্গলে।

তার চেয়ে একটু বুদ্ধি করা যায়।

নোয়ান একটা বাঁশ ধরে ঝুলে পড়ল মদন, পা দিয়ে ডোঙ্গাতে মারল ঠ্যালা। ডোঙ্গাখান হরিরামের হাতের ঠ্যালায় আর ওর পায়ের ঠ্যালায় হাল্কা হয়ে সুড়ুত করে সরে এল একটু খসখোলাসা জায়গায়।

কিন্তু মদন তখন বাঁশ ধরে ঝুলছে।

পায়ের তলায় ডোঙ্গা নেই। ডোঙ্গা সরে গেছে অনেকটা। বাঁশটা দু হাতে ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল পায়ের তলায় অন্ধকার ঘোলা জল। তাও এক মানুষ নিচে।

খাইছে! ঝুপ্‌ পুত কইরা জলে পড়লে অন্ধকারে হাত পা ছুঁড়তে হবে, কোথায় বা হরিরাম আর কোথায় বা ডোঙ্গা। শালা ডোঙ্গা বর্ষার স্রোতে এতক্ষণ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কে জানে!

হইর‍্যা রে, অ হইর‍্যা।

কিছুদূর থেকে হরিরামের আওয়াজ আসে,—তুই কোয়ানে?

বাঁশ ঝুইল্যা রইছি।

আরে বাইরা, কোন বাঁশে ?

কোন বাঁশে সেটা কি করে বলবে মদন। দশ পঁচিশ লক্ষ বাঁশের মধ্যে কোন বাঁশে মদন বাদুড় ঝোলা হয়ে ঝুলে রয়েছে, তা কখনো বলা যায়। হইর‍্যা তা একেবারে বোগদা! ধিন কেষ্ট গদাধর।

কোন বাশে আছস রে ?

আরে ডুরু আলায়, বাশের কি নাম কওন যায়! সক্কালে আয়, পইড়া গ্যালাম কইল।

ফাল দিয়া নাইম্যা পড়। আউগাইয়া আয়।

আর বাঁশ ধরে ঝুলে থাকতে পারছিল না মদন। হাত অবশ হয়ে আসছিল। হইর‍্যাটার মাথায় গোবর, ডোঙ্গাখান যেখানে ছিল, সেখানে ঠেলে নিয়ে এলেই হয়, কিন্তু সেখানে নিয়ে এলে আবার বার করবে কি করে ?

ঝুপ্ করে জলে পড়ল মদন। জলে কাদায় ভিজে একাকার।

হইর‍্যা রে !

হরিরাম হাঁক মারল। ওর আওয়াজ ধরে এগোতে এগোতে মদন এসে পড়ল একটু ফাঁকা জায়গায়। একটা ভিটের কাছে। ভিটেটার ওপর একটা ভাঙা ছনের ঘর। মনিষ্যি নাই।

বর্ষায় জল উঠছে দেখে বোধ হয় অন্য কোথাও চলে গেছে। বর্ষা কমলে জল কমলে আবার আসবে, এসে ঘরটা আবার বেঁধে নেবে। এমন হয়েই থাকে।

ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে মদন ডাক পাড়ল—হইর‍্যা !

হরিরামের উত্তরটা শোনা গেল। এই দিকেই আসছে বোধ হয়।

ভিটের ওপর গোটা পাঁচ-সাত মস্ত মস্ত পেয়ারা গাছ। পেয়ারা ভর্তি হয়ে রয়েছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

হইর‍্যা রে !

বলতে বলতে তরতর করে একটা পেয়ারা গাছে উঠে পড়ল মদন। টকাটক গোটা পাঁচ-সাত পেয়ারা ছিঁড়ে ছোট ধুতির কোঁচড়ে নিল। একটা পেয়ারায় কামড় বসাল। আঃ! কি খাসা পেয়ারা! ভেতরটা লাল, বিচি নেই বললেই চলে।

গাছের আগ ডালে উঠে তাকাল। না. বেশি দূরে আসে নি। ওই তো খাল দেখা যায়, আর ওই হরিরাম লগি ঠেলে ডোঙ্গা নিয়ে আসছে। এই ভিটের দিকেই আসছে।

যাক, নিষ্টাণ্ঠা! কোঁচড়ে ভর্তি করে নিল এক কোঁচড় পেয়ারা।

হরিরাম ভিটের কাছে এসে পড়েছে। মদন গাছ থেকে নেমে ভিটের কিনারায় দাঁড়াল। মনটা তখন বেশ খুশি তাজা।

একটু আগেই ভাবছিল, হরিরামের পিঠে গোটাকতক কিল বসাবে। রাগ হয়েছিল হরিরামের ওপর, কিন্তু এখন তার জল-কাদা মেখে কোঁচড় ভর্তি পেয়ারা নিয়ে লাফিয়ে উঠল ডোঙ্গায়।

হরিরাম এতক্ষণে ওর কোঁচড়ে নজর করল।

কি খাস রে ?

সবরি আম।

গোটা চারেক সবরি আম তুলে দিল হইর‍্যার হাত্তে।

হরিরাম পেয়ারায় কামড় দিয়ে দাঁত বার করল,—ইয়ে! কি মিঠা!

ব্যস্, এতক্ষণের ফাঁদাফাঁদি, ডাকচিক্কুর সব ঠাণ্ডা। পর পর ছ-সাত গণ্ডা পেয়ারা চিবোতে চিবোতে জলে কাদায় ভিজে দু'জন এসে ডোঙ্গাখানা জায়গা মত রেখে ঘরে ফিরে এল।

সন্ধ্যেয় বেগুন সেদ্ধ ফ্যানা ভাতা খেয়ে ঘুম, আর এক ঘুমে বিয়ান।

ছোটকালের মত কাল নাই। মন গুম্‌মানি নাই, ভাবন নাই, সব ফসখোলাসা!

কুমির ঘরের পাশে চালতেতলায় বসে বসে বেতুলগঞ্জ মুড়িয়াল গাঁওয়ের কথা ভাবতে ভাবতে মদনের চোখ দুটো চিক চিক করে ওঠে। দিনের পর দিন শুধু কালাকালি করে কেটেছে।

দুর্গাপূজোর ঢাকের আওয়াজে বুকটা যেন গুরগুরাইয়া উঠত।

মুড়িয়াল গাঁওয়ের পূজাখান ছিল বাহারের। পিতিমার রঙ হলুদ নয়, লালে হলুদে মেশান। অমন পিতিমা অন্য কোনখানে দেখেনি মদন। ডাকের সাজ পরান হোল পঞ্চমীর রাত্তিরে। শোলার ওপর জমির কাম করা, ঠাকুরের ঝলমলানিতে কি বাহার! চোখ ঝলসে যেত। বুকের ভেতরটা নৃত্য করে উঠত ঢাকের বাজনার তালে।

গাঁও ভেঙে পড়ত, শুধু কি এই গাঁও, আশেপাশের পাঁচ-দশ গাঁওয়ের মানুষ ভেঙে পড়ত। শেখ মুসলমানেরাও আসত। তারাও নতুন কাপড় পেত বাবুদের বাড়ি থেকে। নাছের চাচা, মোবারক ভাই, রহিম ভাই, সবাই আসত।

নাছের চাচা ওদের বড় ভালবাসত।

নাছের চাচার কাছে গিয়ে ওরা নেচে নেচে বলত—

> এক্ মাগী সিংগের পরে,
> অসুরের টিহি ধরে,
> বুকে মারে খোচ্‌চা, ঠাকুর দেখলাম চাচ্চা।

হাসত নাছের চাচা। ওদের কোলের কাছে টেনে নিত। নাছের চাচার শাদা মোলায়েম দাড়িতে হাত বোলাত ওরা। নাছের চাচা ছিল বাবুদের নফর, বরকন্দাজের

কাম করত। বাবুরা ছিল এখানকার মস্ত জোতদার আর ব্যাপারী। নাছের চাচার ছেলে ছিল দারোগা। এই নাছের চাচার কোন অংখার ছিল না। এমন ভাল একটা মনিষ্যি কখনো দ্যাখেনি মদন।

নাছের চাচার নাতি হাবিবের সঙ্গে ওরা কচ্ছপের বাচ্চা ধরতে যেত পুকুরের ধারে গর্তে, কচ্ছপের ডিম পেত কখনো কখনো, কখনো বা কচ্ছপ বা মুঁদি গলা বাড়াত। গলাও বাড়ান আর সঙ্গে হাবিবের দড়ির ফাঁদটা লেগে যেত ওর গলায়। গলাটা ভেতরে টেনে নিলে আর কি হবে। হাবিবের দড়ির ফান্দে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সেই দড়ি ধরে টেনে গর্ত থেকে বার করত কচ্ছপটাকে। কিছুতেই বেরোতে চায় না। টেনে হিঁচড়ে বার করত হাবিব।

সাবধান কইলাম, আলায় কামুড় বসাইলে আর ছাড়ে না।

ছাড়ে। ম্যাগের ডাক শুনলে ছাড়ে।

ওরা বরাবরই শুনেছে। কচ্ছপ একবার কামড়ালে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না। সাবধান। ওর পায়ে ফান্দ পরাও। দড়ির ফান্দে পা বাঁধা হোত, তারপর পা ধরে টানত কেউ, কেউ বা গলার দড়ির ফান্দ ধরে। টানাটানি হ্যাঁচড়া-হ্যাঁচড়ি করে খেলা চলত কিছু সময়। তার পর গলাটা লম্বা করে টেনে ধরে হাবিব ছুরি বার করে জবাই করে ফেলত। বাড়ি নিয়ে যেত, মাংস খাবে।

কালী কাউটা পেলে মদন নিয়ে আসত। কালী কাউঠার মাংস খেতে বড় ভাল।

বেতুলগঞ্জ মুড়িয়াল-গাঁওয়ের পূজোর বাহার ছিল বড় চমৎকার।

ষষ্ঠীর দিন বিয়ানে নতুন ছোট্ট ধুতি পরত আর একটা নতুন পিরান। ওই পূজোর কটা দিনই পিরান গায়ে দিত মদন, আর সারা বছর উদলা গায়ে, গাঁয়ে আবার পিরান পরে কেডা। শীতের জাড় বেশি মনে লয়, কোছার খুটখান গায়ে দাও। কোছার খুটের মত ওম্ পিরানেও হয় না।

ষষ্ঠীর দিন ভোর বিয়ানে কিন্তু পরতেই হবে। আয়ু বাড়ে। মা বলত, নতুন সুতায় আয়ু বাড়ে।

বেশ বাবু-বাবু লাগত ওই কটা দিন।

সেবার পাশের ঘরের রূপচান্দের মাইয়া প৹.াম্নি তার নতুন পিরানটা ছিঁড়ে দিল। ইচ্ছে করে ছেঁড়ে নি। বৃষ্টিতে পা পিছলে পড়ে যেতে গিয়ে তার পিরানটা ধরেছিল খামচে। ব্যস্, এক্কারে পড়পড়াইয়া ছিঁড়ে গেল বোতাম ঘরের কাছ থেকে। দিয়েছিল সেদিন বেদম পিট্টি পলাম্নিকে, পিট্টি খেয়ে মেয়েটা পরদিন জ্বরে পড়ে গেল।

এখনো বেশ মনে পড়ে মদনের রূপচান্দ দফাদারের মাইয়া পালাম্নির কথা।

মেয়েটার গায়ের রঙ ছিল কুচকুচে কালো, কাজললতার নাগাল, চোখ দুটো ছিল

ছোট ছোট, করমচার মত লালচে। গাল দুটো ট্যাবা ট্যাবা, মাইয়াটা বড় নিস্তেজী ছিল, নরম নরম গাখান ছিল ওর মানকচুর ডগার মত। সব মিলিয়ে কুমির চেহারার সঙ্গে পলান্নির চেহারার বড় মিল ছিল।

বেদম পিট্টি খেল মাইয়াটা চুপ করে। করমচার মত রাঙা ছোট ছোট চক্ষু দুইটা রাঙা হোল আরও, জল পড়তে লাগল ট্যাবা ট্যাবা গাল বেয়ে, কিন্তু আচ্চয্য তামসা! পলান্নি মার খেয়ে জ্বরে পড়ল, কাউকে বলল না, মদন তাকে পিট্টি দিয়েছে।

পলান্নির জ্বর হয়েছে শুনে সেবারে পূজোয় মনখান মদনের ভাল ছিল না। সপ্তমী, অষ্টমীতেও পলান্নির সন্ধান করেছিল। ঢেপী বলল, পলান্নির জ্বর। ধুম জ্বরে পড়েছে পলান্নি।

ঢেপী পলান্নির সখী, পদ্মপাতা পাতিয়েছিল ওর সঙ্গে।

আচ্চয্য তামসা! ঢেপীও জানত না, যে মদন মেরেছিল পলান্নিকে।

মনডা ভাল ছিল না।

পনেরো দিন কি কুড়ি দিন অত মনে নেই, পলান্নি মরে গেল।

সেই জ্বরেই দিনকতক পরে মরে গেল পলান্নি।

জন্ম মৃত্যু ভগবানের হাত, তবু মাঝে মধ্যে মদনের মনে হয়, সে পিট্টি না দিলে বোধ হয় পলান্নি মরত না।

কুমির চেহারাখান অবিকল পলান্নির মত।

কুমির জন্যে বুকে একটা টনটনানি লাগে মদনের।

ঘুটঘুটি অন্ধকার হয়ে আসে। চাঁদটা বোধ হয় নেমে পড়েছেন অনেকটা। জোছনা যে কখন মুছে গেছে চালতে বাগানের মাটিতে বুঝতে পারে নি মদন। গাঁজার নেশায় বেভুল হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়।

একটা পাখী ডাকছে মস্ত তেঁতুলগাছটার আগায় বসে। কি বিচ্ছিরি চিক্কার পাখীটার। যেন কাঁদনের মত ডেকে চলেছে একটানা। হাওয়ায় তালপাতা নাড়ার ঝির ঝির শব্দ। একটু যেন ঠাণ্ডা লাগে। রাইতখান কাবার হইল নাকি জানে কেডা?

কুমির কথাটা মনে পড়তেই উঠে পড়ে মদন। পলান্নির ভাবনের সাথে কুমির ভাবন মিলেমিশে যায়।

ঘরের কাছটায় এসে দাঁড়ায় মদন।

ই রে, দেখছ তামসা! অখনো ঘরের মধ্যে লণ্ঠনটা জ্বলছে বোধ হয়।

মদন দোরে ঘা মারে। দু'বার তিন-বার।

কুমির জাগনের কোন লক্ষণ নেই। ঘুমোলে কুমি মরা। চ্যাৎ-ভ্যাৎ থাকে না। এই এক ধন্দের মাইয়ামানুষ।

এবারে বেশ জোরে ধাক্কা মারে দোরে। বেড়াসুদ্ধ কাঁপে।

মদনের ঘুম পেয়েছে। আর ভাল লাগছে না খাড়িয়ে থাকতে বা বসে থাকতে।

হ, উঠেছে এতক্ষণে। দোরটা খুলে দেয় কুমি। ক্ষুদে ক্ষুদে লাল চোখদুটো হাতের তালুর উল্টো পিঠে ডলে। শাড়িখান খ্যাখদের লুঙ্গির মত পরা। আঁচলটা মাটিতে গড়াগড়ি খায়। একটা মস্ত হাই তোলে কুমি। দুটো ঠোঁটের মাঝখানে সুতোর মত লালার আঠা লেগে থাকে।

—রাইত দুফুরে ছিলা কোয়ানে?

কথার জবাব দেয় না মদন। দরজা ধমাস করে বন্ধ করে দেয়। তারপর সোজা এসে চৌকিটার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে।

কুমির চটক ভাঙে। লণ্ঠনটা দপ দপ করছিল। তেল আছে কিনা কে জানে! এগিয়ে এসে কুমি লণ্ঠনের সলতা নামিয়ে দেয় একটু। তবু দপদপানি কমে না। বুকের মধ্যেও কুমির দপ-দপ করছে। হঠাৎ আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে বুকখান ওমনি করে।

এগিয়ে এসে চৌকির একটা ধারে বসে।—খাও নাই কিছু?

—খামু কোয়ানে?

কথা বলে মদন। কুমি নাক কোঁচকায়।—ই রে, গাঞ্জার গন্ধ বাইরয়, গাঞ্জা খাইছ?

নেশাপত্তরের গন্ধ কুমির সবই জানা। ঠিক ধরেছে কুমি। ও যে ধরবে মদন জানত। মদন বুঝে উঠতে পারে না সে নেশা করলে কুমি অমন বিরক্ত হয় ক্যান। ওর ঘরে নেশা না করে কি থাকা যায়। যারা আসত, তারা কি নেশা করত না? এ ঘরে শাদা চোখে শাদা মনে কোন্ শালায় আসতে পারে!

ইচ্ছে করে কুমিকে দুটো ধাব্‌কি দিয়ে সজুত করে। কিন্তু পারল না।

—হাটখোলায় গেছিলাম।

—কি কামে গেছিলা?

মদন কথা বলে না। চালের বাতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—খলিফার ওখানে যাওনের কি কাম আছিল। ওডা আমার দুই চক্ষুর বিষ।

মদন ফিরে তাকায় একবার। একটু সময় তাকিয়ে থাকে কুমির দিকে। কুমির ঘুম-ঘুম মুখখানা লণ্ঠনের দপদপানিতে চিকচিক করে উঠছে। যেন কালোয় আগুন।

মদন তাকিয়ে থাকে। না তার আর কাউকে চটান চলবে না। খলিফাকে তার চাই। কুমিকে চাই। খেপীকে চাই। এমন কি মনছুরকেও তার চাই-ই চাই। যাত্রাদল তাকে বানাতেই হবে। অনেকদিন থেকে সে স্বপ্ন দেখছে, তার একমাত্র সুখের স্বপ্ন। সে এক যাত্রাদলের কর্তা হবে। তার দলের নাম ছড়িয়ে পড়বে পঞ্চাশ

একশ' গাঁওয়ে। বাইরে থেকে ডাক আসবে। দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়বে বড় বড় জমিদারবাড়ি রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। সেখানে মেডেল আর পুরস্কার কুড়িয়ে আনবে গাদা গাদা। মনিষ্যির জাঙালে ভরে যাবে তার আসর। মদন ভুঁইয়ার দল। একডাকে লোক সম্ভ্রমে চোখ কপালে তুলবে। যাত্রাদল তার চাই।

—খলিফা মানুষডা খারাপ না কইলাম।

—রাখো তোমার গাও জ্বালুনি কথা। ওয়ারে আমার ভালমতে জানা আছে। নেশার ডিপো একখান।

—তা হউক, নেশা করলে মান্‌ষে খারাপ অয় কইল কেডা?

—আমি কই।

—তোমার এয়ানে কোন মিয়া নেশা না কইর‍্যা আসে কও দেখি?

কুমি ঠিক এমন একটা সত্যি কথা আশা করে নি মদনের কাছ থেকে। কথাখান সত্য। কিন্তু কুমির আঁতে ঘা লাগান কথা। কুমির ঘরে নেশা না করে লোক আসে না সত্যি। কিন্তু তাই বলে কুমি কি নেশা করাকে অপছন্দ করতেও পারে না? লোকগুলোকে অপচ্ছন্দ করতে পাবে না!

পারে। অপছন্দ করলেও তাকে দেখাতে হয় যে সে খুশি হয়েছে। মুখে প্যাঁজ আর দিশী মদের গন্ধ পেয়ে নাক কোঁচকালে তার ভাত জুটবে না। তাই হাসতে হয়। কথা কইতে হয় মুখের কাছে মুখ নিয়ে। মদন কি বুঝবে যে কুমিকে কতখানি সহ্য করতে হয়। গা শির শির করে ঝিন্নায়, পিত্তি জ্বলে যায়, তবু তারই ট্যাঁক থেকে গোটাকতক টাকা খসিয়ে আনবার জন্যে তাকে হেসে ঢলে পড়তে হয়।

আর সওন যায় না।

কুমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল মদনের দিকে।

আজ কদ্দিন হয়ে গেল মানুষজন আসন বন্ধ হয়ে গেছে। তার ঘরে কেউ আসে না। সে আসতে দিতেও চায় না। তার যা খুদকুড়া জমা আছে, তাই দিয়েই নাড়াচাড়া করে চালাচ্ছে। মাঝেমধ্যে ডর লাগে। এমুন করে চলবে কি না! জমা টাকা আছে কয়েক গণ্ডা। সেটায় হাত না দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছে কুমি। তবু মদনকেও ছাড়তে চায় নি। ছাড়তে পারে নি।

এতকাল পরে একটা মান্‌ষের মত মানুষ পেয়েছে কুমি। তাকে ছাড়তে ও পারবে না। মদন যে তার কতখানি মদন জানে না। তার এতকালের রোজগারপাতি সব বন্ধ হয়ে গেছে মদনের জন্যেই। হউক। তবু মদনকে ছাড়বার কথা সে ভাবতেও পারে নি। বরং প্রথম দিকে খেপীর কাছ থেকে মদনকে ফুসলাইয়া তুতুবুতু কইর‍্যা ধরে রাখবার চেষ্টা করে চলেছে।

এরপর না খেয়ে যদি মরতে হয়। তাও মরবে। মদনকে ভিক্ষে করে খাওয়াবে কুমি। নিজে না খেয়ে থাকবে। তবু মদনকে ছাড়নের কথা ভাবতেও পারে নি কুমি।

আজই প্রথম মদনকে ছাড়নের কথা ভেবেছে।

দিনের পর দিন কাটবার পর বুঝতে পারছে, মদনের কাছ থেকে যেটুকু ও পেরেছে, টালিবালি দিয়ে পেয়েছে। কিন্তু টালিবালি বেশিদিন খাটে না।

ওর আছে কি যে মদনকে বন্ধ কইর‍্যা রাখতে পারে। কামড়ান-খামচান একখান দেহ আর কিছু তাপ-উত্তাপ। মদনরে এ দিয়া বন্ধ করা যায় না। মদন মানষের মত মানুস। আর গুলান তো পশু জানোয়ার। খলিফা কি মানুষ। না পরমা মানুষ। না কি কবিরাজমশয় মানষের মধ্যে গণ্য হয়। মোদকের নিশা করে কবিরাজমশয়ের আওন-যাওন বন্ধ করে দিয়েছে কুমি।

ও বেশ বুঝতে পারছে। এই পশুগুলান যা চায়। মদন তা চায় না। মদন যা চায়—তা ওর তফিলে নাই।

কুমি বোগ্‌দা হলেও মাইয়ামানুষ।

এ কথাখান কুমি বেশ বুঝতে পারে যে মনিষ্যি জনম লইয়া ও কুত্তা বিলাইয়ের নাগাল জীবন কাটিয়ে গেল। মানুষ হইবার পারল না। নষ্ট হইল। পইচা থ্যাতাভ্যাতা হইয়া গেল।

মানুষ হইবার পারল না।

ঘরে মানুস রাখতে পারল না।

কুমির করমচার মত রাঙা চক্ষুদুইটা জলে ভরে ওঠে।

লণ্ঠনটা দুই-চারবার দপদপ করে নিভে যায় এবার। ঘরখান আন্ধার হয়ে যায়।

ভালই হইল। কুমি চক্ষুদুইটা মুদে নেয়। শুকনা মোটা ঠোঁট জিভ দিয়া চাটে। বড় তিষ্টা পাইছে। পাউক। গলা শুকিয়ে কাঠ হইয়া যাউক! কাম নাই আর জলস্পর্শ করনের।

—তুমি নি মদ-ভাঙ খাইছ?

মদনের গলায় তামসার সুর।

কুমির গলাখান ভার।—না, খাই নাই।

—কও কি কথা! নিশা-ভাঙ করো নাই।

তামসা করছে মদন। করুক। কুমি তো তামসা করনের বস্তু।

মদন অন্ধকারে বলে,—টাহা পামু খলিফার কাছে। যাত্রাদলের জন্যে টাহা দিব কইছে। বুঝলা নি?

খলিফা দেবে যাত্রাদলের টাকা! বিশ্বাস হয় না কুমির। তবু কোন কথা বলে না।

—যদি কম-সম পড়ে। তোমার কাছে টাহা আছে নি?

—আছে।

—দিবা কইছিলা। কবে তক দিবার পারবা?

—তোমার যখন ইচ্ছা লইও।

—খ্যাযে?

—খ্যাযে কি?

—তোমার খাওন চলব কি কইর‍্যা?

—না চলে না চলব।

মদন খুশি হয় বোধহয় একটু। হাসে। হাসনের খুক-খুক শব্দ শোনে কুমি।

মদন বলে,—ভয় নাই। দল বানাইবার পারলে টাহার ভাবনা নাই। দুই-তিন আসর বায়না হইলে তোমার টাহা দিয়া দিবার পারুম। আর তোমার খাওন-পরনের ভাবনাও থাকব না।

কুমির মনে মনে হাসি পায়। মদন কি তাকে পাঁচ বছইরা মাইয়া ভাবছে। তার খাওন-পরন চালাইব মদন আর তখন কুমির কাছে থাকবে মদন। এ কথা বিশ্বাস করতে হবে।

হাস আসে কুমির। তবু হাসে না।

বলে,—আমার খাওন-পরনের কথা ভাবি না। ভাবি তোমার কথা।

—অবিশ্যি একখান কথা কই। মনে কিছু কইরো না।

—কি কও?

—ঘরে তুমি মানুষ আনলে আমার আপত্তি নাই। আমি খলিফার বাড়ি একখান ঘর পামু। সেয়ানে থাইকবার পারুম। আসুম তোমার কাছে। বিয়ানে চা খামু। মুড়ি খামু। দুইডা সুখ-দুঃখুর কথা কমু।

হায়রে কপাল! তখন মদন তার কাছে যে থাকবে না, এ তো তার জানা। কথাখান আর কওনের কি কাম আছিল। মদন তাকে কি ভাবে? সে কি একটা খড়-মাটির পুতুল। না কি কুত্তা বিলাই! সে কি কিছু বোঝে না? কুমি কি জানে না মদন কি চায়। কাকে চায়। মদনের সুখের ঘর কোথায়?

যাত্রাদল করুক মদন। তার কাছে আসনের কাম নাই। তার কোন আপত্তি নাই। শুধু দাশু খলিফা মদনের সর্বনাশ করে না বসে। এইটেই চায় কুমি। মদন ভাল থাকুক। মদন সুখে থাকুক। এইটেই চায় কুমি।

তার টাকা যদি মদন নেয়, নিক। যাত্রাদল করুক। সুখে থাকুক। তার টাকা সে ফেরত চায় না। তার নিজের ভাবনা সে ভাবে না। তার মনখান তিতা হইয়া গ্যাছে গা। মুখের থুতু-লালা তিতা লাগে। গলা পর্যন্ত তিতা।

তার খাওন-পরনের ভাবনা সে আর ভাবে না। গভীর অন্ধকার রাত্তিরে অন্ধকার ঘরে বসে স্পষ্ট বুঝতে পারে কুমি। এরপরে ঘরে আর কোন মানুষ আনতে সে পারবে না। আর না। মদনের পরে আর অন্য কোন মানুষকে তার ঘরে সে সহ্য করতে পারবে না। অন্য কোন মানুষের চক্ষুর তাকানি জিল্‌কানি সহ্য করে সে আর হাসতে পারবে না। গায়ে ঢ'লে পড়তে পারবে না। কাম নাই তার খাওনের-পরনের।

একখান পরাণধারণের জন্য অত ভাবনের কি আছে? তেমন প্রয়োজন হয়, সে বাবুদের বাড়ির মাইলানীর কাম করবে। নয় তো দাসীর কাম করবে। পাঁজা-পাঁজা বাসন নিয়ে পচা পুকুরে মাজতে বসবে। তবু পচা পুকুরে পাঁকে আর সে ডুববে না। কাম করবে। দু-বেলা দুই মুঠা ভাত সেদ্ধ করে খাবে।

মদন তার বুকের হাওয়া উজানে বাওয়াইয়া দিছে।

এতকাল পরে কুমি জানল, উজানী হাওয়া কারে কয়। খেপীর কথা মনে লয়। উজান ভাইটাল হাওয়ার খপর এতকাল জানত না কুমি। খেপী কইত। সে হাস দিত। ভাবত খেপীর খ্যাপামী।

এখন মম্মে তার জলুনি ধরে। বুকের হাওয়া কারে কয় বুঝতে পারে কুমি।

কখন কখন মদনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুকের হাওয়া পাক খায়। শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়।

খেপীর কথা মনে লয় কুমির।

একটা হাই তোলে মদন।—ঘুমাইব না?

—ঘুম আহে না।

—লও, শুইয়া পড়ো।

কুমি ওঠে না। চুপ করে বসে থাকে চৌকির কোণে মদনের শিয়রের কাছে। ওর মাথায় ভাবনের পোকা ঢুকেছে। ও ভাবে আর ভাবে। মনটা ভাল ঠ্যাকে না। ভার-ভার লাগে।

গলার মধ্যেটা থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে এসেছে। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বড়ই তিষ্টা পাইছে। তাপ-উত্তাপ বাড়ে। দেহখান জানি ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। জিভে আঠা আঠা লালা।

জল খেলে হোত একটু। না। থাক। আবার ওঠা। লণ্ঠন জ্বালা। জল

গড়িয়ে খাওয়া। ভাল লাগছে না। কুমিরও আর ভাল লাগছে না। আস্তে আস্তে একটু সরে বসল কুমি।

মদনের ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল আবার। মনটা ভাল নেই। বাইল জোছনায় খেপীর উঠানের উপুর বসনের ভঙ্গীখান এখনো ষ্যান মনডার মধ্যে পটের মত গেঁথে রয়েছে। খেপীর চোখ দু'খান আকাশের মাঠের সবটুক আলো লইমা রইছে। জমাট আলোর মত একটি পট।

হায়রে, এই আন্ধার বন্ধ ঘরে আর মন ট্যাকে। পরাণখান উধাও হইয়া যায় সেই আলোয় ধোয়া-মোছা উঠানখানের কাছে। বড় টান খেপী বিদ্যাধরীর। এ টানের দড়া ছিঁড়তে পারে এমুন মরদ সংসারে নি আছে?

ইস্ কুমির পিঠখান তার হাতের ডানায় ঠেকল। কাছিমের পিঠের মত পিছলা পিঠ। কুমির বুকে-পিঠে নি আঁচল নাই। তার পাশে শুয়ে পড়ল না কি?

সরে শুতে যেতেই নাকে এল কুমির গায়ের ঘামের কাদা কাদা সোন্দা গন্ধ। ইরে ঘিন্না লাগে মদনের। কুমির দেহের গন্ধটাই যেন সহ্য করতে পারে না মদন।

উঠে বসে পড়ল মদন। কুমির গলায় ফিসফিসানি শুনল।—কি অইল?

—মাটিতে নাইমা শুই।

কুমি উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি,—না। কও কি কথা। তুমি শোও এয়ানে।

গুটিগুটি চৌকি থেকে নেমে গেল কুমি।

মদন যেন বাঁচল।

আবার হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল চৌকির ওপর।

মদন জানলও না। কুমি মুখ আর ঠোঁট বালিশে জোর করে গুঁজে রেখেছে। পাছে শব্দ হয়। কান্নার শব্দ।

চোখের জলে বালিশটা বোধ হয় ভিজে গেল।

পনেরো

বিয়ান থেকে আজ টিপটিপানি বৃষ্টি আর মধ্যে মধ্যে দমকা বাতাস। হাওয়ার ঠেলায় ঘরের বাতা নড়ে খুঁটি নড়ে। দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিয়ে জল চোয়ায়। উঠানে কাদা। পথে কাদা। মাঠে কাদা। কাদায় কাদায় ভরে গেছে চারদিক। ঝুরঝুরাইয়া গুঁড়া গুঁড়া বৃষ্টি পড়ছে। কামাই নাই। থামন নাই। আকাশখান ঝাজরা হইয়া গেছে।

দেহ ভার মন ভার। সগ্‌গলের। বাইর হওন যায় না। হাটবাজারে বেচাকেনা বন্ধ থাকে। দুটা চারটা চাষী ছেলে তরিতরকারি মাছ যা নিয়ে আসে, তাতে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় বাবুগো মধ্যে। সেখানে আউগায় সাধ্যি কার। ঘরের মধ্যে বসে থাক। কুমড়াবঠি আর ভাত খাও। আবার কান্থা মুড়ি দিয়া ঘুমাও।

কাউয়াগুলান গাছের পাতার আড়ালে বসে বসে ভিজছে। ছোট ছোট ব্যাঙ লাফালাফি করছে ভিজে ঘাস মাটিতে। কচুপাতায় জল জমে জমে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে। কচুপাতা ভেজে না। আর ভেজে না পদ্মপাতা।

বিয়ানে ওঠা হোল না। উঁ'তে একটু বেলা হয়ে গেল। সূয্যের সাক্ষাৎ নেই। তিনি এখন কদ্দুর ওপরে উঠে বসেছেন কে জানে! উঠল কুমি। উঠে তাকাল চৌকির দিকে। মদন ঘুমোচ্ছে তখন। হাত পা ছড়িয়ে অটাল মেরে।

থাকুক মদন। ঘুমোক। কুমি ঘরের স্যাঁতসেতে ভিজে মাটির মেজে ঝাঁটপাট দিল শুধু। আজ আর গোবরছড়া দিয়ে নিকান যাবে না। একেই ভিজা। তার উপুর আরও জলবুলানি!

দেহখান জ্বালা-জ্বালা করছে কুমির। মাথার চাঁদিটা আর কান দুইটা দিয়া যেন আখার হলকা বেরয়। উনুনের আঁচের তাপ। জ্বালা-জ্বালা করছে। সেই রাত্তিরের তেষ্টাটা এখনও যায় নি। এ তেষ্টা আর যাওনের কাম নাই। ভোর বিয়ানে এখন জল খাওয়া চলবে না। চান না করে কিছু করা যাবে না। বরাবরের অভ্যাস।

মাথায় এক থাবলা তেল দিয়ে, গায়ে হাতে একটু তেল বুলিয়ে গামছা নিয়ে চলল কুমি বকুলতলার দিকে। রোজই যায়। কোন কোনদিন দেখাও হয় খেপীর সাথে। খেপী দেখা হলেই ফিক করে হাসে।

কুমি হাসনের কোন জবাব দেয় না। ভারী নিতম্বে একটা জোরালো দোলা দিয়ে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসে। কথা বলে না খেপীর সঙ্গে। কিন্তু কেন? কেন

কে জানে। বোধ হয় খেপীর সামনে টানটান হয়ে দাঁড়াতে ওর ডর লাগে। খেপীর চোখের ওপর চোখ রাখতে পারে না। কেমন যেন ভয়ও লাগে। রাগও হয়। এ যেন চোরের গোঁসা গেরস্থর ওপর। তার দ্রব্যটি নিয়েছি বেশ করেছি। তাই বলে তুই আমায় চোর ভাববি কেন?

মদনকে কুমি চুরিই করেছে। টালিবালি দিয়া ঢাপসি-ঢুপসী দিয়া নিয়ে এসেছে। কিন্তু রাখতে পারল কই?

রাজার ঘরের রাজপুত্তুর চুরি ক'রে তাকে শেষে রক্ষা করা দায়।

কাম নাই ও সগল ঘুপি-ঘাপিতে। কাল রাত্তিরের পরে আর কুমি মদনকে ঘরে রাখতে চায় না। ধরে রাখা যাবে না ও জানে। তাই সেই বৃথা চেষ্টা আর করতে চায় না।

বকুলতলার পুকুরের পাড় পিছল। টিপটিপানি বৃষ্টিতে কাদায়।

পা টিপে টিপে নামে কুমি জলে। জলের উপুর ঝুর ঝুর বালু ঝরার মত জল পড়ছে। গায়ে মাথায় জল লাগে। তবু উদলা গায়ে পুকুরে ডুব না দিলে যেন দেহ ঠাণ্ডা হয় না। পরাণ ঠাণ্ডা হয় না।

খুব করে অনেকগুলান ডুব দেয় কুমি। ডুব দিয়ে পুকুর পাড়ে উঠে আর গামছা চিপড়ানর দরকার নাই। কাপড় চিপড়ানর কাম নাই। যেতে যেতেই ভিজে যাবে আবার।

আঁচল সাপটে নিয়ে পা বাড়াবে যেমনি—অমনি ভেসে এল আওয়াজ।

হোই গো খেপী আওয়াজ তুলেছে। ঘরে বসে আওয়াজ তুলেছে।

জল পড়ে টাপুসটুপুস
বক্ষে জুয়ার আইল রে।
সুজন কাণ্ডারী তুমি কই গ্যালা রে!
কই গ্যালা রে সুজন কই গ্যালা রে—
সুজন কাণ্ডারী তুমি কই গ্যালা রে!

কুমির পা থমকে গেল। চক্ষু দুইটা থর নিথর। ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজতে লাগল কুমি।

ম্যাঘে ম্যাঘে জিলকানি দ্যায়,
তুফান ওঠে ভারী।
আর এ তুফানে কই গো সুজন নায়ের কাণ্ডারী।
কই গ্যালা রে সুজন, কই গ্যালা রে,
সুজন কাণ্ডারী তুমি কই গ্যালা রে।

বুকের ভিতর কম্প দিল। চক্ষু দুইটা বৃষ্টির জলে ভিজল, না চোখের জলে? কুমি খাড়িয়ে রইল। বুকের কম্প থামে না। বুকের হাওয়ায় তুফান তুলে দিয়েছে খেপী। শূন্য আকাশে তুফানে উথাল-পাথাল।

ঘরে মানুষ রয়েছে। কিন্তু বক্ষে মানুষ। বক্ষের সুজন কোথায় কে জানে!

মদনের বক্ষে কুমির স্থান নাই। কুমির বক্ষে মদন নাই। তাই নি এই উথাল-পাথাল।

চক্ষু দুইটা লাল হয়ে গেছে। চান করার পরে বৃষ্টির জলে চক্ষু লাল হইল নি। কে জানে! ভারী ভারী গরম শ্বাস পড়ে। আস্তে আস্তে এগোয় কুমি। খেপীর ঘরের দিকে এগোয়। বকুলতলার পিছল কাদার পথে পা টিপে টিপে এগোয়। ঘুরে এসে ওঠে খেপীর চালার সামনে।

—খেপী আছস নি?

—কেডা?

বিদ্যাধরী বেরিয়ে আসে বাইরে। কুমিকে দেখে হাসে। টলটলে মুখখানা একইরকম। হাসিতে ভরপুর। দুঃখ-ভাবনা নাই। জ্বালা-যন্ত্রণা নাই। খেপী যেন এক স্রোতে ভাসে। স্রোতেব আউগান-পাউছান নাই। জুয়ার ভাইটাল নাই।

কুমিকে ভিজে কাপড়ে দেখে বলে উঠল—এ কি লো! চান করবার আইছিলি নি? ভিজ্যা দেখি জুব্বুব হইছস। আয় ভিতরে আয়।

—না ভিতরে আর যামু না। ভিজ্যা কাপড়ে তর ঘরের মাইজ্যা পিছল হইব।

বিদ্যাধরী হাসে।

—তর সাথে তুই একখান কথা কওনের আছিল।

—ক, কি কথা?

বিদ্যাধরী ঘরের দরজার ঝাঁপের ভেতরে। কুমি ঝাঁপের বাইরে দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছে। ভাল লাগল না বিদ্যাধরীর। ও বলল,—আমার একখান শুকনা কাপড় দিমু?

—দে'। তয় তুই দণ্ড বইসা যাই।

বিদ্যাধরী ঘর থেকে একখান শুকনো কাপড় বার করে দিল। কুমি গামছায় গা মাথা মুছে ভেতরে ঢুকে শুকনো শাড়িখানা পরে ভিজে শাড়িখানা ঝাঁপের ধারে রেখে দিল।

বিদ্যাধরী হাসে।—বিষ্টিবাদলের দিনে চান করনের কি কাম আছিল?

কুমি শুকনো শাড়িটা পরে মেজের চাটাইটার ওপর বসে,—মাথাডা নি জইলা যাইবার নিছিল। ভাবলাম, চান করলে কইমা যাইব।

একটা কৈফিয়ৎ দিল কুমি।

চান করতে আসার কৈফিয়ৎ! মাথাটা জ্বলে যাচ্ছিল কুমির।

বিদ্যাধরী ওর পাশে বসে ওর দিকে বড় বড় চোখদুটো মেলে তাকায়। মাথা জ্বলে যাচ্ছিল কেন? কি হোল কুমির? কুমির মাথা তো সহজে জ্বলে না। ঠাণ্ডা কালো পাথরের মত দেহটি। আয়াসে আরামে কুমি সব সময় ঠাণ্ডা। তার আবার জ্বালা কিসের?

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল বিদ্যাধরী।—কুমির মুখখানা আগের চেয়ে শুকিয়ে গেছে। দেহ কিছু রোগা হয়েছে। কি হয়েছে কুমির? কোন অসুখ করে নি তো? কুমিকে যেন ওর কেমন কেমন লাগে। দেখলে কেমন মায়া-মায়া লাগে।

কুমি কিন্তু বিদ্যাধরীর দিকে তাকাতে পারছিল না। তাকিয়েছিল চাটাইয়ের একটা ছেঁড়া জায়গায়। ওর তাকাতে যেন কেমন একটা ডর-সঙ্কোচ লাগছিল। কতদিন ও আসে নি খেপীর কাছে। কতদিন খেপীর ঘরে বসে নি। দুয়ারে বসে নি। খেপীর আওয়াজ শুনে কান পাতে নি। কেন যে আসে নি তা কুমি জানে। কিন্তু জেনেও কোন লাভ হোল না। লোকসান বাড়ল।

চোখ তুলে কোন মতে একটা ঢোঁক গিলে বলল কুমি,—তর কালা মদন কোয়ানে জানস নি?

বিদ্যাধরী তাকায় ওর দিকে। এ যেন কৌতুকের কথা। তামসার কথা। ফিক করে হাসে। বলে,—জানি।

কুমি আস্তে আস্তে বলে,—জাইনা-শুইনা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল দিলি কি কামে?

বিদ্যাধরী হাসে ফিক ফিক করে। ওর যেন মজা লাগছে। আস্তে আস্তে বলে,—নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারে সগ্‌গলেই। আমার কুড়াল নাই। মারণ-ধরণের পথ নাই।

কুমি মুখটা নিচু করল। কথাখান কুমির বুকের ভেতর বিঁধল। ও তক্ষুণি কোন জবাব দিতে পারল না।

বিদ্যাধরী ওর হাঁটুতে একখানা হাত রাখল।

কুমি সঙ্কুচিত হোল। তাকাল। লাল বর্ণ চোখ দুটো ওর জলে ভরা। বুকের হাওয়া ঠেলে উঠেছে কণ্ঠে। আওয়াজ বেরোতে চায় না গলা দিয়ে।

ধরা গলায় বললে,—ছুইস না আমারে। আমি নি পাপীতাপী মানুষ।

চোখদুটো দিয়ে টসটস করে জল পড়ল কালো মসৃণ গালের ওপর।

বিদ্যাধরীর মস্ত চক্ষু দুইখান মায়ায় ভরে এল। নরম স্বরে ওর একখানা হাত ধরে বললে বিদ্যাধরী,—কাদন আসে ক্যান লো কুমি? কি অইল তর?

কুমির চোখ বেয়ে দরদর করে জল নামে।

বিদ্যাধরী হাসল তবু।—বুজছি। উজানের হাওয়া উঠছে তর মনে। পাপ-তাপ সগ্‌গল উড়াইয়া লইয়া যাইব। তুই মইর‍্যা গ্যাছস্ কুমি। এমুন কইর‍্যা মরলি কবে?

হ্যাঁ, কুমি মরেছে। মদনের দ'য়ে ডুবে মরতে বসেছে। উজানের হাওয়া তাই বোধ হয় ওর বুকে উথাল-পাথাল। ঠিকই ধরেছে খেপী। ভিতরের খবর খেপী সব জানতে পারে। বাইরের খবরের সন্ধান লয় না। নেবার প্রয়োজন করে না। কুমি মরল কবে?

—হ' মইলাম। জ্বইলা-পুইড়া মইলাম তর কালা মদনরে নিয়া।

ধরা গলায় বলল কুমি।

ঝুপ ঝুপ করে আবার ঝেঁপে বৃষ্টি এল। বিদ্যাধরী উঠে ঝাঁপের কাছে যেতেই একটা কুকুর ভিজতে ভিজতে ঘরের ভেতর ঢুকতে চাইল। খেপী তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,—আয় আয়, কুত্তাডাও ভিজ্যা মইল। আয় ঘরে আয়।

কুকুরটা অসহায় চোখে বিদ্যাধরীর দিকে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গা ঝাড়া দিল।

—ইরে! গাও ঝাড়া দিস না।

গা ঝাড়া দিলে গা থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির জলের ছিটে আসে। কুকুরটা এক কোণে গিয়ে বসল। বিদ্যাধরী তাকাল বাইরে। ইরে বাইরে! ঝমঝমানি বৃষ্টিতে বাইরে কি সব ঝাপসা। বকুলগাছটা যেন আনন্দে নৃত্য করতে করতে স্নান করছে। ডালপালার কি নাচন। মাঠে ত্যারছা হয়ে পড়ছে বৃষ্টির ধারা। পুকুরের জল যেন ফুলে ফেঁপে উঠতে চাইছে।

ঝাঁপ বন্ধ করল বিদ্যাধরী।

এসে বসল আবার কুমির কাছে। দেখল কুমি চোখ মুছে মুখখানা নিচু করে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে।

অল্প হেসে বলল খেপী—আইজ আর সাইয়ের নামে ঘুরনা হাওয়া অইল না।

তার মানে ভিক্ষাও জুটবে না। ঘরে তার সঞ্চয় কিছু থাকে কি না কে জানে।

কুমি বলল—খাবি কি?

—কি কইর‍্যা কই?

—ভাণ্ডারে নি কিছু আছে?

বিদ্যাধরী কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল,—বুটকড়াই ভাজা আছে।

কুমির একবার ইচ্ছে হোল বলে, আমার ঘরে চল। ডাইলে চাউলে ফুটাইয়া লইয়া খামু অনে। কিন্তু না। বলে কোন লাভ নেই। ও বিদ্যাধরী খাবে না।

জানে, বিদ্যাধরী তার অন্ন গ্রহণ করবে না। সে নষ্ট মেয়েমানুষ বলে নয়। বিদ্যাধরী কারো অন্ন গ্রহণ করে না। ভিক্ষা যা মেলে, তাই খায়। না মিললে খায় না। তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন খিদে বলে কিছু নেই ওর।

বরাবরই খেপী এমনতর। আগে ভাবত এও বুঝি ওর এক খ্যাপামী। কিন্তু এখন কুমি বোঝে। কিছু কিছু যেন পষ্ট দেখতে পায়। তার মনের জ্বালা যত বাড়ে খিদের জ্বালা বাড়ে তত। মনখান যদি খুশিতে টইটুম্বুর থাকে, তবে কোথায় খিদে: কোথায় তেষ্টা!

কুমি বিদ্যাধরীর দিকে তাকায়। বলে,—তুই তর কালা মদনের লইয়া আয়।

—আমি আনবার যামু কোন দুঃখে।

অবাক হয়ে তাকায় কুমি। কথার মত কথা বলে খেপী। এমুন বাক্যি খেপীর মুখেই মানায়। মনখান যেন ওর শীতলপাটি। আইস। বইস। চলে যাও তো চলে যাও। তাপ উত্তাপ নেই।

কুমি আস্তে বলল,—আমিও মইলাম। কালা মদনও মইল।

খেপী তাকাল। চোখে শুধু কৌতুক আর হাসি।

—তর জন্যে দাফাইয়া মইল কালা মদন।

খেপী একটু সময় তাকিয়ে রইল,—তুই বুঝলি কি কইর‍্যা?

কুমি ধরা পড়বার ভয়ে চোখ নিচু করল,—শুধু বলল,—আমি বুঝি।

কি করে বোঝে? মন দিয়া মন বোঝে। কুমির বোঝবার কথা নয়। কুমি যদি বুঝেই থাকে, তবে কুমি মরেছে। একারে মইর‍্যা গেছে কুমি। হায় রে, সংসারের আজব কারখানা! কুমির উপরেও সাঁইয়ের দয়া হইল। প্রেমের উজান হাওয়ায় কুমি এখন আকুপাকু। চক্ষু দুইডা তারা তারা।

—আমার বড় হাস আসে রে কুমি।

—তর সগল তাতেই হাসন! মদনরে তর পাঠাইয়া দিমু।

—ইচ্ছা করে পাঠাইয়া দিবার পারস।

বাইরে মেঘের ডাক শোনা গেল। বৃষ্টিটা বুঝি ধরে এল। হ্যাঁ, বৃষ্টি থেমে এসেছে।

কুমি উঠল। ওর শাড়িটা ছেড়ে ভিজে শাড়িটা জড়িয়ে নিল গায়ে। ঝাঁপ খুলল। হ্যাঁ, বৃষ্টি ধরে এসেছে। এখন চলে যাওয়া যায়। চলে যেতে গিয়ে খেপীর দিকে একবার তাকাল কুমি। ওর চোখ ভরা জল।

আনন্দে খিল খিল করে হেসে উঠল বিদ্যাধরী।

ষোল

আকাশখান পশ্চিমে ঘোলা ঘোলা। বৃষ্টিটা থেমে গেছে। সূর্য নিচের দিকে নেমে চলেছেন। দূরে গাছ-গাছালীর আবছা ছায়ার ওপর সিঁদুরে আভা।

ইরে। রামধনু উঠেছে। বাহারের রঙে রঙে আকাশের পশ্চিমটা হেসে উঠেছে। আকাশের হাসন ছ্যাখে কে! এই কাঁদন এই হাসন। এই মেঘে মেঘে কালো। আবার হাসনের আলো রঙীন। সূর্য লুকিয়ে আছেন। এক-আধবার তার মুখে ঝিলকানি দেখা যায়। মেঘের ফাঁকে আলো ফেটে বেরোয়।

হায়রে সাইয়ের ছিষ্টি! দেখে বুক উথলাইয়া ওঠে। খেপী বিদ্যাধরী চোখ দুটো মেলেই থাকে। চক্ষে আর পলক পড়ে না। শ্বাস আর বয় না।

ভেবেছিল, বিকেলে খলিঝুলনী নিয়ে একতারা নিয়ে ঘুরনা দিতে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু তা বুঝি আর হোল না। সারাটা দিন বৃষ্টি দেখে কাটল। এখন আবার ম্যাঘ-রোদ্দুরের খেলা। দেইখ্যা আর আশ মেটে না।

দিনভর পেটে কিছু পড়ে নি। বুটকলাই দুটিখানি চিবোবে ভেবেছিল। তাও হয়ে ওঠেনি। এবেলা কি হবে কে জানে। কে অত ভাবে? ভাবনের কাম তার নয়। তার ভাবনা সাইয়ের কাঁধে। খেপী ভাবনা-চিন্তা সব সাইয়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। তোমার ছিষ্টি। তোমার ভাবন তুমি ভাব। আমি খামু-দামু, বেড়ামু, হাসুম, চক্ষু মেইল্যা তোমার কারখানা দেখুম

—বলে, অ খেপী, কি করস?

—বিদ্যাধরী চোখ ফিরিয়ে তাকায়। ওমা এ যে দাশু খলিফা। খলিফার এখানে কি কাম? এখানে তো পিরান বানানের কাম নাই। গাঞ্জা, মদ মিলে না। খলিফা ঘুম-ঘুম চোখে তাকিয়ে রয়েছে। মুখে আর ঠোঁটে চাপা একখান হাসি। দেখলেই মনে হয় বজ্জাতির হাসি।

ঘুম-ঘুম চোখদুটোর দিকে তাকালে খেপী বুঝতে পারে। চোখের দৃষ্টিতে জিলাপী চক্কর। কাউয়ার নাগাল শেয়ানা। হ' ঠিক কাকের মত।

—বলে, অ খেপী, করস কি?

বলে তার দুয়ারের পাশে ছোট পেয়ারা গাছটায় ঘুম-ঘুম চোখে পা দিয়ে একটা ঠোক্কর মারল খলিফা। বিদ্যাধরী তাকাল।

সে কি করে তা দিয়া খলিফার কি কাম? খলিফা তো কখনো তার সন্ধান নিতে

আসে না। হঠাৎ আজ এত দরদ উথলে উঠল কেন? কৌতুক লাগে বিদ্যাধরীর। ফিক ফিক করে হাসির ঝিলিক ওঠে। খলিফার কাম কুমির ঘরে। এ ঘরে খলিফার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

তবু খলিফার আলগা কথাখানের উত্তর দিতে গিয়ে ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী —তুমি দেখি আকাম করো।

—কি আকাম করলাম?

—সবরি আম গাছটারে দিলা শ্যাষ কইর‍্যা।

সত্যিই খলিফা ততক্ষণে পেয়ারা গাছের ছোট চারাটাকে পায়ের ঠ্যালায় কাত করে দিয়েছে।

ঘুম-ঘুম চোখে হাসে খলিফা।—আরে দূর। কষ্টা সবরি আমের চারা। এডা উঠাইয়া ফ্যালাও। এই বড় বড় সবরি আম গাছের চারা দিমু কত চাও।

এ সব কথার কথা। কত দেবে খলিফা জানা আছে। বড় বড় পেয়ারা গাছের চারা দেবে খলিফা! এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে? বিদ্যাধরীর মজা লাগে। হাসে ফিক ফিক করে।

—গা দেখি। একখান নাম শুনা। তর গাওয়া শুনি না কতকাল।

খলিফা টুক টুক করে এগিয়ে এসে দুয়ারের ঝাঁপের পাশে শুকনো মাটি দেখে বসে। বেশ জুত করে বসে। বিদ্যাধরী বসেই ছিল একখানা চটের ওপর। চটখানা ওর দিকে এগিয়ে দেয়।

—থাউক, থাউক, ঠাণ্ডা মাটিতে বইতে ভালই লাগে।

হাসে আবার বিদ্যাধরী—ক্যান ভিতরে বুঝি আথার আচ উঠছে?

খলিফা সরেস মানুষ। মিচকি হাসি হেসে বলে,—তরে দেইখ্যা আচ ওঠা আচ্চয্য না।

বাইরা কথা কয় খলিফা। খেপীরে দেখে গরম লাগছে ওর। কিন্তু সে গরমে জ্বালায় পুড়ে মরতে হবে। লাভ নাই কিছু। বিদ্যাধরী যদি উনুনের আঁচ, খলিফা তবে পোকা-মাকড়।

—আথার আচে পুইড়া মর তয়।

একটা নিশ্বাস ফেলে খলিফা।—পুইড়া অনেক মিয়াই মইল। নাটা জুড়ান মইল। তর বাপে মইল। মদন আলা মইল। অখন মদন তরে মাইরা মরব।

খিল খিল করে হেসে ওঠে বিদ্যাধরী। —কও কি কথা!

—হ। ঠিক কথাই কই। খপর নি জানস?

ফিক ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী।—পাচ খপরে আমার কাম কি খলিফা ভাই। এউগ্‌গা খপর জানতেই জন্ম কাইটা গ্যাল গা।

—কিসের খপরের কথা কস ?

—রসের খপর পাইলাম না। রসিক সুজনের খপর পাইলাম না।

দাশু খলিফা জুত করে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে। ঘুম-ঘুম চোখে মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসে। শুরু হোল বাউলীর খ্যাপামী। রসের খপর চায়। নাটা জুড়ান মরল। মদন গেল। কেউ তো বাউলীর ঘরে টেকে না। বাউলী রসের খপর পাবে কোথা থেকে। ঘর সংসার করুক। মানুষ ঘরে আসুক। তবে তো রসের খপর জানবে ? খেপীর কাছে এগোনর সাধ্যি নেই কোন ব্যাটা-মানুষের। অথচ কেমন করে খেপী রসের খপর চায় ?

ঘুম-ঘুম চোখে মিটিমিটি তাকায় দাশু খলিফা। বাউলীর যৌবনের বাহার আছে। অঙ্গ থেকে চোখ ফেরান যায় না। এমন সোনার যৌবন কবর দিয়ে দিল খেপী বিদ্যাধরী। এর দিকে তাকালে কুমি যেন চোখেই লাগে না। এমন অটুট অঙ্গের শোভা কুমি পাবে কোথায় ?

নাঃ! মদন আলার পছন্দ আছে। ব্যাপারীরও পছন্দ আছে।

পছন্দ কারই বা নেই। কিন্তু কাছে এগোয় কার সাধ্যি! কাছে এগোতে গেলে ব্যাঁকাত্যাড়া কথা কয়। ফোঁস করে ওঠে। আলায় জাত সর্প। ল্যাজে হাত দিলে তেড়িবেড়ি করে ওঠে।

খেপী বিদ্যাধরীকে ভোলান অত সহজ নয়।

নাটা জুড়ান মরল। খেপার বাপ মরল। মদন আলাও মরবে।

ফিক ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী।—এ কথান কথা ভুল কইলা খলিফা ভাই।

—কি কথা ?

—যে যার নিজের আগুনে পুইড়্যা মরে। অন্যের আগুনে কেউ পোড়ে না।

খাসা কথা কয় খেপী। কথাখান অস্বীকার করনের উপায় নাই। সত্যি তাই। আগুন জ্বলে নিজের মধ্যে। আগুন যে জ্বলে টের পাওয়া যায়। সে আগুন মাঝেমধ্যে মাথায় চড়ে বসলে মাথা গরম হয়ে যায়। মানুষ যা মন ল্যায় তাই করতে পারে।

তবু খলিফা বলে,—মিথ্যা কিছু কই নাই রে। তরে আগুনে পুড়ানের চেষ্টা করতেছে মদন।

—উঁহুঁ। হইবার পারে না। মদনের সাধ্যি নাই আমারে পুড়ায়।

—ভয় শোন বিত্তান্ত।

—কিয়ের বিত্তান্ত? কোন বিত্তান্ত শুননের আমার কাম নাই।

—তর তেড়িবেড়ি জারিজুরি ভাইঙ্গা যাইব.দেখিস অনে।

বিদ্যাধরী তাকায় খলিফার দিকে। কি বলতে চায় খলিফা। কি বিত্তান্ত তাকে শোনাতে চায়? তার কি আছে? বাইরের খপর শোনবার কোন ইচ্ছা তার নেই। নিজেকে জানা হোল না। আর বাইরেব জানা। ঘরের খপর না নিয়ে গাঁয়ের খপর নিতে যায় কে? ঘর গুছান পড়ে রইল বাইবের খপরে বেলা কাটিয়ে লাভ কি তার। শুনতে চায় না সে। হাবিজাবি বিত্তান্ত শুনতে জানতে চায় না।

বিদ্যাধরী বলল,—সাইয়ের নামে বাইর হমু ভাবছিলাম।

বিদ্যাধরী বলতে চাইল, সে এখন নাম করে ঘুরতে বেরোবে। ভিক্ষায় বেরোবে। এখন খলিফা ইচ্ছা কবলে চলে যেতে পারে। ভাল লাগছিল না ওর। বিয়ানে কুমি এসেছিল। সে কিছু বিত্তান্ত শুনিয়ে গেছে। যে সব কথা শুনতে সে চায় না। জানতে চায় না। তবু কুমি শুনিয়ে গেছে। তর কালা মদনরে তুই লইয়া আয়।

সে আনতে চায় না। বার কবে দিতেও চায় না। বাইবে তার আবাহনও নেই। বিসর্জনও নেই। সে ভেতরে তার স্বজনের সন্ধান চায়। কালা মদনকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে রসে প্রেমে তার বুকের পৈঠায়। বাইবেব জাল যদি ভেতরে ঢোকে, তবে সে জালে সে নিজেই জড়িয়ে পড়বে। অধর মানুষ সে জালে ধরা পড়বে না।

কালা মদনকে সে ভালবাসে। প্রেমেব রসে ভিজিয়ে নিয়েছে সে মদনেব ভাবনা। মদন তাব মনের মানুষ। কিন্তু মনেব মানুষকে সে বাইরে টেনে এনে সংসারের জালে হারাতে চায় না।

মানুষের সাধন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনে। এ সাধনে সে কোন বিঘ্ন চায় না।

মদন ভাল থাক। তার কালা মদন যাতে সুখ পায়, যেখানে সুখী হয়, তাই করুক। তার তাতে কিছুই আসে যায় না। তার ভাল সে চায়। তার সুখ সে চায়। এই পর্যন্তই তার চাওয়া।

পিঞ্জরের পক্ষীকে সে যদি বাইরে আনে তবে ফড়ুৎ করে উড়াল দিয়ে চলে যাবে। আর তাকে পিঞ্জরে আনা যাবে না। কেন এই সহজ কথাটা এরা বোঝে না? কেন এরা সহজ হতে পারে না? সহজ হতে চায় না? মানুষ কি সহজ হতে ভুলে গেল?

—বিপদ-আপদ মানষের আসতে কতক্ষণ!

—খলিফা বলে,—তাই কই, বিপদ-আপদের কথা আগে শুইনা রাখন ভাল।

একটা নিশ্বাস ফেলে খলিফা বেশ বড় করে।—তরে নি কতকাল ধইর‍্যা জানি। খপরটা শুইনা মনডা খারাপ হইয়া গ্যাল। তরে জানাইবার আইলাম।

বিদ্যাধরী মাঠের সীমানায় আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। মেঘ সরে সরে যাচ্ছে। সূর্য বোধ হয় নেমে গেছেন। রঙের আভা নাই। আকাশের রঙিল বাহার নাই। ঘোর-ঘোর অন্ধকার হয়ে আসছে। বাতাস বইছে বেশ জোরে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ আসছে ভেসে। বড় মিঠা গন্ধ। ভিজে মাটি আর ভিজে গাছ-পাতার গন্ধ।

—কালাকান্দির ব্যাপারীরে চিনস ?

খেপী তাকায় খলিফার দিকে।

হাসে, বলে,—সে খপরে তোমার কি কাম ?

—বিত্তান্তখান শুইন্যা ল। আগেই তেড়িবেড়ি করিস না। কালাকান্দির ব্যাপারীর কাছে মদন তরে লইয়া গেছিল ? ওয়ানে মনছুরেব সঙ্গে প্যান্দা-পেন্দি করছিল নি ?

অবাক হয়ে তাকায় বিদ্যাধরী। খলিফা ঘুম-ঘুম চোখে মিচ্‌কি হাসছে। খলিফা কি করে জানল এ সব কথা। কালাকান্দির ব্যাপারীর কাছে মদন তাকে সত্যিই নিয়ে গিয়েছিল। মনছুর ভাইয়ের সঙ্গে মারামারিও হয়েছিল। এ সব কথা তো খলিফার জানার কথা নয়।

—তরে নিছিল ক্যান জানস !

খেপী তাকায় ফ্যাল্ ফ্যাল করে। শিশুর মত অবোধ দুটো চোখ মেলে।

—নদীর পাড়ে ব্যাড়াইবার গেছিলাম।

—না, তরে চাপসী দিয়া নিয়া গেছিল। ব্যাপারীর সাথে আগে কথা আছিল। তরে ব্যাপারীর কাছে নিয়া যাইব। তার গুদামে রাইখ্যা আসনের কথা আছিল।

খেপীর চোখদুটো শিশুর মত।—ক্যান ! কি কামে ?

খলিফা হাসে।—তুই এট্টা আবোধা ছাই। ক্যান নিছিল। এয়াও নি ভাইঙ্গা কওনের কথা !

বিদ্যাধরী তাকিয়ে থাকে খলিফার দিকে। সে চাউনীতে ভয়-ডর নেই শঙ্কা-আশঙ্কা নেই। টলটলা চাউনী যেন নিথর দীঘির জল। ময়লা আবর্জনা নেই। টলটলে পরিষ্কার।

কৌতুক যদি বা কিছু থাকে। কৌতূহল নেই।

আস্তে আস্তে বলে খেপী—ব্যাপারী মানুষডা ভাল।

—তর মাথা ! ব্যাপারী তরে টাহা দিয়া কিনবার চাইছিল।

কথাটা যেন ভারি মজার। খিল খিল করে হেসে উঠল খেপী।—কও কি কথা। আমার নি দাম আছে ?

খলিফা হাসে। মিচ্‌কি হেসে বলে,—মদইনা আলার টাহার বড় টান পড়ছে।

—ক্যান ?

অ আলায় কিষ্টযাত্রার দল বানাইবার চায়। তরে ব্যাপারীর হাতে তুইল্যা শত দুয়েক টাহা পাওনের কথা আছিল। ওই টাহা দিয়া দল বানাইব ভাবছিল।

বিত্তান্ত সব খুলেই বলল খলিফা। কিছু গোপন করল না।

—অয়, ফিরা্যা আবার তরে নিয়া যাইব।

—আবার নিয়া যাইব ?

—অয়। কথাবাত্তা পাকাপাকি হইয়া গ্যাছে গা। মনছুরের কাছে আগাম টাহা নিব মদইনা।

বিদ্যাধরী ফিক ফিক করে হাসছিল। মাঝে মাঝে শিশুর মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিল। এ সকল বড় মজার বিত্তান্ত। সংসারে সাইয়ের লীলা বোঝা ভার।

তার কালা মদন তাকে অন্য মানুষের কাছে বিক্রি করতে চায়। কিন্তু বিক্রি করতে চায় কি ? এই খাঁচাটা। এই পিঞ্জরটা। এয়া লইয়া কি করবে ব্যাপারী। কিছুই পাবে না। খাঁচার ভেতর যে খেপী পক্ষীটা আছে। সেটা ব্যাপারী ধরবে কেমন করে ? সে পাখী থেকে থেকে উধাও। আকাশে-বাতাসে উজানে। সে পক্ষীর সন্ধান ব্যাপারী পাবে না। খাঁচাটা নিয়ে সে ঠকবে। মদন ব্যাপারীকে ঠকাবে। নিজেও ঠকবে।

মদন তার খাঁচাটা দেখল। পক্ষী দেখল না।

যদি দেখত। মদন দেখতে পেত। সে পক্ষী মদনের ভাবনায় রসে-বশে বেসামাল। তাকে বশে আনতে পারে মদন আর কেউ নয়। মদন জানল না যে মদন তার সবটুকু পেয়েছে। তা যদি জানত। তবে তার জ্বালা-যন্ত্রণা থাকত না। রসের ছোঁয়ায় রসিয়ে উঠত।

সাইয়ের লীলা বোঝা ভার।

খলিফার দিকে তাকিয়ে বড় কৌতুক লাগল খেপীর। খলিফার ঘুম-ঘুম চোখ আর মিচকি হাসি।

—একখান কথা জিগাই।—বলল খেপী।

—কও।

—তোমার মতলবখান কি ? তুমি এ সগল কথায় কি লাভের সন্ধান করো ?

খলিফা উস্‌খুস্ করে উঠল। বড় জবর প্রশ্ন করেছে খেপী। ও যে এমন একটা

কথা জিজ্ঞেস করতে পারে খলিফা ভাবতেও পারে নি। একটু ভেবে বলল—কিছুই না। আমার আর কি? ডরে নি ছোটকাল থিক্যা দেখত্যাছি। তাই সাবধান কইর‍্যা দিয়া গ্যালাম। অখন উঠি।

গুটিগুটি উঠে পড়ল খলিফা।

ভাবল। এইবার মদন আলা জব্দ হবে। কুমির ঘরে বসবাস করার ফল পাবে। খেপীকে ব্যাপারীর হাতে তুলে দিতে পারবে না। মনছুরের কাছে মার খাবে। বেদম মার খাবে।

দাগু খলিফার পরাণটা নেচে উঠল। খুব জব্দ হবে এবার মদন। এতদিন পরে সে মদনের উপর তার জমা করা রাগের শোধ নেবে। মদনকে বিদ্যাধরী খেদিয়ে দেবে। মনছুরের কাছে টাকা আগাম নিলে মনছুর ধরে মার দেবে। মনছুরবাবুদের বাড়ির বরকন্দাজ। হতে পারে হয়তো তার লাঠির একখান বাড়িতে মদইনা আলার মাথাখান দু-ফাঁক হয়ে যেতে পারে। হয়তো বিলে নিয়ে পুঁতে ফেলবে মদনকে।

এ দ্যাশের মানুষ মদন চিনে না। এ দ্যাশের শ্যাখের লাঠি বড় জোরালো।

খলিফা বিদ্যাধরীর দুয়ার থেকে উঠে বেরিয়ে এল।

সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। বকুলতলার পুকুরে আর ডোবায়-ঘোপায় অনবরত ব্যাঙ ডেকে চলেছে। একসঙ্গে যেন শত শত ব্যাঙ ডাকছে। হাওয়া দিচ্ছে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা।

খলিফা এগোল। কুমির ঘরের দিকে একবার গেলে কেমন হয়। অনেকদিন কুমিকে দেখা হয় নি। একবার দেখে আসতে পারত। মদনের সঙ্গে দুটো কথা বলে মদনকে চেতিয়ে আসতে পারত।

কুমির ঘরের দিকেই এগিয়ে চলল খলিফা।

ওই তো চালতেতলা। গাছ গাছালীর ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। বাঁ পাশে পায়ে-চলা সরু রাস্তাটা চলে গেছে পচা পুকুর পর্যন্ত। সন্ধ্যের মুখে চতুর্দিকে ব্যাঙের লাফা-লাফি। আকাশ এখনও ঘোলা-ঘোলা। আরও বৃষ্টি হবে কি না কে জানে! হতে পারে রাত্তিরের দিকে। ঘরের চৌকিখানা আজ সরিয়ে নিতে হবে। পায়ের কাছটাতে টিনের চাল বেয়ে জল পড়ে টপ্‌ টপ্‌ করে। দুপুরে জল পড়ল তো পড়ল। রাত্তিরে চৌকিখানা সরাতে হবে। কে জানে যদি ঝমঝমাইয়া বৃষ্টি আসে। মন্দ লাগে না। টিনের চালার ওপর বৃষ্টির ঝম্‌ঝমা শব্দ আর চৌকির ওপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুম।

চালতে বাগানে ঢুকল খলিফা।

অন্ধকারে দু-তিনটে ব্যাঙের বাচ্চা মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করে ফেলল। পায়ে কাদা। কি মাড়াচ্ছে আর কি মাড়াচ্ছে না ভাল করে বোঝাই যায় না। দু-তিনটে কুল

কাঁটাও যদি বিঁধে থাকে দিন চারেক। কিছু বোঝবার উপায় নেই। ধুলো আর কাদার একটা মোটা আস্তরণ সর্বদাই থাকে পায়ের নীচে।

কেঁচো আর ব্যাঙের বাচ্চার জাঙাল এ দিকটায়। মাছ ধরতে যায়। পচা পুকুরের ধার থেকে নারকেলের মালাইয়ে কেঁচো ভর্তি করে নিয়ে যায়। বঁড়শীতে কেঁচো গেঁথে জলে ফ্যাল, টপাটপ উঠবে গোলশা ট্যাংরা আর সরপুটি। থালই ভর্তিও হয়ে যেতে পারে যদি কার্তিক মাসের টাসের দিনে বঁড়শী ফেলে বসা যায়। বর্ষায় মাছ পালায়। জলে থৈ-থৈ বিল পুকুরে তাদের পাত্তা পাওয়া যায় না।

গাঞ্জার দমটা এই সব দিনে জমে ভাল।

কুমির ঘরের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ায় খলিফা। কথা কয় কেডা? বেশ জোরেই কথা কইছে।

মদইনা আলার গলার জোরটা বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

—যামু না আমি। তুই আমারে কি কইরবার পারস?

কুমির গলা যেন ঢেঁকির চিপির কিচ্ কিচ্ আওয়াজ।

—এয়ানে থাকলে ধম্মকম্ম তোমার সগ্‌গল নষ্ট অইব।

—হউক। ধম্মেকম্মে আমাব কাম নাই। দল বানাইয়া ঘুইর‍্যা বেড়ামু।

—গোঁসা কর কি কামে। কথা কই শোন। দল বানানের কাম নাই। নিশা-ভাঙ কইরা দল লইয়া থাইক না। খেপীব ঘরে যাইয়া সুখে দিন কাটাও গা।

—খেপীর সাথে আমার সপ্পে-নেউলে। ওয়ার ভাবগতি কিছু বুঝবার পারি না। চ্যাত-ভ্যাত নাই।

দাশু খলিফা খুক্ খুক্ করে প্রায় হেসে ফেলেছিল।

অতি কষ্টে হাসি চেপে কান পাতল আবার। আলা মদন জবর জাতা খাচ্ছে। কুমির কাছ থেকে খাচ্ছে গুঁতো। খেপীর কাছে গেলেও গুঁতো খাবে। জানে না বাইরা, খেপীরে খ্যাপাইয়া দিয়া এসেছে খলিফা। ঘরের দুয়ারে গেলে পিছা নিয়া তাড়া করবে।

এ দিকেও পিছার বাঁড়ি—ও দিকেও পিছার বাড়ি।

ঝাঁটা খেতে খেতে এধার ওধার ছুটোছুটি করবে আলা মদইন্যা। ওর কপালে সব্বদিকে ঝাঁটার বাড়ি। জয় মা বেম্মময়ী! এ্যাদ্দিনে মদনকে জব্বর জব্দ করা গেল।

কুমি যেন ওকে খেদিয়ে দেয় মা। তার চোখের সামনে পিছার বাড়ি দিতে দিতে খেদিয়ে দেয়। চক্ষু দুটো সার্থক করবে দাশু খলিফা। কালাকান্দির করালী তান্ত্রিককে চারটে লাল আলখাল্লা বানিয়ে দেবে। একটা পুরো বোতল দিয়ে আসবে মায়ের পূজোর জন্যে। জয় মা বেম্মময়ী।

কুমির গলা শোনা গেল,—এয়ানে থাইকা কি করবা তুমি ?

—কইলাম, দল বানামু, তরে নিয়া থাকুম।

—আমি তোমার সাথে থাকুম না।

—হে কথা আগে কইলি না ক্যান ?

—আগে অত তলাইয়া বুঝি নাই।

—আরে আমার তলানি বুঝুনি ! তরে জোর কইরা রাখুম।

কুমির চিৎকার শোনা গেল—আমি তোমারে একনি খ্যাদাইয়া দিমু। দিন-রাইত ঘরে বইয়া বুলবুলানি খিচখিচানি। তোমার নি ঘিন্না-পিত্তি নাই, আমার নাগাল নষ্ট পচা মাইয়া মানুষের সাথে রইছ। আমি অইলে কোনদিন লাথি দিয়া চইলা যাইতাম।

—কি কইলি, খ্যাদাইয়া দিমু ?

—দিমু একশবার দিমু।

দাশু খলিফা মুখে হাত চাপা দিয়ে বাইরে অন্ধকারে বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে হাসি চাপে।

জয় মা বেম্মময়ী ! লাগিয়ে দিয়েছ। এবার আলা মদইন্যারে পার করে পথে দাঁড় করাও মা। ঘুম-ঘুম চোখদুটো খলিফার সজল হয়ে ওঠে।

কুমি কেঁদে ফেলেছে। ফোঁপানির শব্দ !—ঘিন্না নাই। এট্টা জাইর্যা মাইয়ার ঘরে রইছ। তার ভাত খাইয়া দিন-রাইত পোয়াইত্যাছ ! তুমি যে এমুন হইবা আমি ভাবি নাই।

কুমির কাঁদনের আওয়াজটা বড় বেশি কানে ঠ্যাকে। এয়ার মধ্যে আবার কাঁদনের কি হোল ? খলিফা একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আলা মদনের জন্য ওর এত দরদ কিয়ের ?

—তুমি নষ্ট হইবার পারবা না। কিছুতেই তোমারে নষ্ট হইবার দিমু না।

মদনের গলার আওয়াজটাও যেন ভার ভার শোনায়।

—আমি নষ্ট অইলে তর দুঃখুডা কিয়ের ?

কুমির কোন জবাব শোনা যায় না। শুধু কান্নার শব্দ শোনা যায়।

খলিফা পা ঝাড়ে। পায়ের হাঁটুর কাছে কি একটা উঠেছে মনে হচ্ছে। চুলকোতে গিয়ে হাতে লাগল। আর একবার হাত দিয়ে চুলকোল খলিফা। ওরে বাপুরে, তিন-চারটে জোঁক উঠেছে হাঁটুর কাছে। চামড়া কামড়ে ধরে রয়েছে। জোর করে টেনে ছাড়ান যায় না।

জোঁক ক'টা ছাড়িয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল খলিফা। কিন্তু ওখান থেকে সরে যেতে পারল না। আবার কান পেতে সেখানেই অন্ধকারে কাদায় দাঁড়িয়ে রইল।

মদনের গলা শোনা গেল।—খেপীর ওয়ানে গ্যালে তুই সইবার পারবি ?

—ক্যান পারুম না।

মদনেয় গলা ভার ভার।—সত্যি কথা ক। তুই আমারে এয়ানে তর কাছে টাইনা আনছিলি।

কান্নার শব্দটা আর শোনা যায় না।

কুমির বিষণ্ণ গলার আওয়াজ শোনা যায়।—হ' কথা মিথ্যা না। তয় কামডা ভাল করি নাই।

—অখন তুই আমারে যাইবার কস ?

—হ' যা হওনের অইয়া গ্যাছে। অখন ভালয় ভালয় চইল্যা যাও।

মদনের ভারি গম্‌গমা গলার আওয়াজ শোনা যায়।—যামু, তুই যখন কইতাছস, যামু আমি। তয় আমি নিচ্চয় কইবাব পারি। খেপীর সাথে থাকন আমার অইব না। খেপী যদি খ্যাদাইয়া ত্যায় !

—খ্যাদাইয়া দিব না।

কুমি মদনকে আশ্বস্ত করে। বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাশু খলিফার ঘুম-ঘুম চোখ কৌতুকে ভরে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে হাসি চাপতে হয়। কথাখান মদন ঠিকই কয়েছে। খেপী তাকে খেদিয়ে দেবে। তার ব্যবস্থা সে সবই করে এসেছে। খেপী যতই ভাবনে, ততই রেগে টং হয়ে যাবে। মদন একবার খেপীর ঘরে গেলে বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল।

—যাওয়ার আগে একখান কথা শুনাই। মিথ্যা ভাবিস না।

একটু চুপচাপ। কুমির কোন উত্তর শোনা যায় না।

—এয়ানে তুই ছাড়া আমার আপন আর কেউ নাই।

মদনের গলার গমগমানি কম। যেন একটু ভিজা ভিজা। আওয়াজ য্যান ভিজা গামছার সপ্‌সপানি।

কুমির কোন উত্তর শোনা যায় না। সামান্য কান্নার শব্দ কানে আসে।

এই অন্ধকার রাত্রে চালতে বাগানের চালায় এক জাইরা মেয়েমানুষের প্রেম-পীরিতের গাওনা শুনতে ভালই লাগে। দাশু খলিফার ঘুম-ঘুম চোখদুটো একটু বিষণ্ণ মনে হয়। কুমির কাঁদনের জন্যে, না কি এই নির্জন স্তব্ধ রাত্রে এই পালাগানের একমাত্র শ্রোতা বলে।—ঠিক বোঝে না খলিফা। মনডা য্যান একটু জোলোজোলো মনে হয়। ব্যাপারখান কি ?

মদন চালাঘরের দুয়ার খুলল। লণ্ঠনের আলো পড়ল বাইরে। আবছা আলোয় দেখল। মদন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটু। চারদিকে তাকাল।

দাশু খলিফা চমকে ঘরের পেছনে সরে গেল। পেছনে আরও ঘন অন্ধকার। গোটা তিনেক বিশাল চালতেগাছ ডালে ডালে জড়াজড়ি করে নিচের মাটিকে অন্ধকার করে রেখেছে দিনরাত। মাটি আরও ভিজে। পা চাপলে নরম মাটিতে পা নেমে যায়।

চুপ করে দাঁড়াল খলিফা। দেখল মদন বাগানে নামল। তারপর হনহন করে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল। কোনদিকে গেল? বোধহয় খেপীর চালার দিকে। যাউক আলা মদইনা!

খলিফা আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বেড়া ঘুরে দুয়ারের দাওয়ার কাছে এল। না। দুয়ার বন্ধ হয় নি। লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে বাইরে। খোলা দুয়ার দিয়ে ভেতরে কিছুই দেখা যায়না।

দাওয়ার ওপর উঠল খলিফা। চালতে নিম কুল গাছের পাতার ঝিরঝির শব্দ। হাওয়া দিচ্ছে বোধহয় জোরে। জোরালো হাওয়া থাকলে আর বৃষ্টি হবে না। আকাশটা তবু ঘোলা ঘোলা। মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে হাওয়ায়। রাত্রে বোধহয় তারা উঠবে আকাশে। মেঘ কেটে গেলে একফালি চন্দ্রও উঠতে পারেন।

গাঞ্জায় দম দিয়ে এলে জমত আজ। মুখটা যেন বিস্বাদ লাগছে। মাথাটা খালি খালি।

কুমির দেহখানা ঘুম-ঘুম চোখে কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করতেই মুখখানা আবার মিচকি হাসিতে ভরে উঠল। কুমির সঙ্গে একটু কথা কওনের কাম। তারপর দোকানে গিয়ে খানিকটা দিশী মদ গলায় ঢেলে আন্ধারে আন্ধারে চলে আসবে এই চালায়। ফিরবে ভোব বিয়ানে।

মদইনা আলা খেপীর ঝাঁটা খেয়ে পড়ে থাকবে কোন গাছতলায়। থাক, শালা গাছতলায় পড়ে থাক। যেমন কম্ম তেমনি ফল। দাশু খলিফার পেছনে লাগার প্রতিফল পাবে এইবার।

খলিফা দুয়ারের ভেতরে ঢুকল।

লণ্ঠনটা জ্বলছে চৌকির এক কোণে। ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মাটির ওপর চাটাই বিছিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে কুমি। পিঃ ় আঁচল নাই। কালো কুচকুচা পিছল পিঠখানা টান টান হয়ে রয়েছে।

আরও একটু এগোল খলিফা। কুমি নি ফোঁপায়।

হ'। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কুমি। এত কাঁদনের কি হোল ওর। একি কারখানা!

আর একটু এগোল খলিফা। কুমির জন্য ওর মনটা টনটন করে। আহা, মদন

চলে যাবার পর বোধহয় ভাবছে, ও অসহায়। ওর কেউ নেই। আর কেউ না থাউক। খলিফা আছে।

—অ, কুমি। কুমি!

এক ডাকেই উঠে বসল কুমি। চোখ-মুখ চোখের জলে ভিজা। চকচকা।

—কেডা? তুমি এয়ানে কি কামে?

খলিফা নরম গলায় বলল,—মদইনা আলা গেল গিয়া।

কুমির চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ। রুক্ষস্বরে বলে উঠল,—তাতে তোমার কি? তোমার এয়ানে কি কাম?

—আইলাম, তর কাছে থাকুম। অখন তর কেউ নাই।

কুমি উঠে দাঁড়াল। দুয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল।—বাইরও। বাইরও এয়ান থিকা।

খলিফা অবাক। বলে কি কুমি। তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে! কেন, এখন তো মদন নেই। এখন তো কুমি তার সঙ্গে দিব্যি থাকতে পারে।

—বাইরও। পিছা দিয়া বাইড়িয়া খ্যাদামু তোমারে। সক্কলে বাইরিয়া যাও।

হতভম্ভ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল খলিফা।

হারামজাদীর আস্পদ্দা কম না। তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবে।

মেজাজ গরম হয়ে গেল খলিফার।—কামডা কইল্ ভাল করলি না।

বলে ঘর থেকে খ্যাদান কুকুরের মত বেরিয়ে অন্ধকার বাগানে নেমে সোজা হাটের পথ ধরল।

দুয়ার বন্ধ করে কুমি আবার উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল।

সতেরো

বিদ্যাধরীর চোখের কোলদুটো ফুলো ফুলো। দুপুরে একটু গড়িয়ে উঠে একতারার তার বাঁধছে। বং বং শব্দ উঠছে একতারা থেকে। পরশু রাত্রে মদন তার ঘরে এসেছে। হঠাৎ মদন যে তার ঘরে এসে উপস্থিত হবে ভাবতে পারে নি বিদ্যাধরী। অবশ্য ভাবন-চিন্তন নাই ওর। আইল আইল গেল গেল। কিছুতেই কিছু আসে যায় না ওর।

পরশু দিনটা বড় অদ্ভুত। সকালে ঝমঝম বৃষ্টি। আইল কুমি। তারপর উপস্থিত দাশু খলিফা। তার চার দণ্ড পরে মদন। দিনটা যেন মানুষ আসনের দিন। জুয়ারের পানি যখন আসে, তখন এমনিই আসে।

সব মিলিয়ে একটা গেরো পড়েছে। গেরোটা পরিষ্কার দেখতে পায়। মনের সঙ্গে মনের গেরো। কুমি খলিফা মদন। তিন-সুতায় গেরো পড়েছে।

এ বড় জবর গেরো। ছিড়নের সাধ্যি নাই। প্রাণ টনটন করে।

বিদ্যাধরীর জট পাকায় না। জড়িয়ে পড়ে না। গেরো পড়ে না ওর মনের সুতায়। অথচ আইস-বইস, সবই আলগা আলগা। মনখানাকে বাইরে টেনে আনে না। তাই বাইরের সংসারের অসংখ্য সুতার জালে জড়ায় না। নিজের মধ্যে নিজের সন্ধান। এ সন্ধানে সব মেলে। কে তার খপর রাখে।

আজ দু'দিন হোল রয়েছে মদন।

মদন সন্ধ্যার পরে যখন এল, ও একটু অবাক হয়েছিল বই কি। খুশি হয়েছিল। মানুষজন আসন-যাওন। কার না খুশি লাগে! আসনেও খুশি। যাওনেও খুশি।

বিদ্যাধরী তখন ভিজে কাঠে ফুঁ দিয়ে জ্বালাতে জ্বালাতে খানিকটা মটর কলাই সেদ্ধ করে নিচ্ছিল। সঙ্গে দু'টুকরো কুমড়ো সেদ্ধ। গোটা চারেক কাঁচা লঙ্কা একটু লবণ। রাত্রে এই আহারের ব্যবস্থা ছিল। খলিফা এল। ঝুলি নিয়ে ঘুরণা দেওয়া হোল না। পাঁচ দুয়ারে না গেলে মিলবে কি! ঘরে আর কিই বা থাকে!

মদন এসে হাজির। এসে চুপচাপ বসল রাঁধনের ছাপরার সামনে উবু হয়ে। কথাবার্তা নেই। চক্ষু দুটো উদ্‌ভ্রান্ত। তারা তারা তাকানি। একটু যেন ভয় সঙ্কোচ।

—আউগাইয়া বইও।

এগিয়ে বসতে বলল বিদ্যাধরী। কেন এসেছে, কোথা থেকে এসেছে, কোন কথাই জিজ্ঞেস করল না। জিজ্ঞেস করা ওর স্বভাব নয়। কোন কারখানায় কোন কৌতূহল ওর নেই। মদন এসেছে। এসে বসেছে। এইটেই সত্য। এইটেই ঘটনা। যে কোন ঘটনায় খুশি না হয়ে তার উপায় কি? মন যে তার জুয়ারে বাঁধা। খুশির জুয়ার।

মদন এগিয়ে বসল না। আস্তে আস্তে বলল—তোমার কাছে আইলাম।

—ভালই করছ।

ব্যস্। ওইটুকুই কথার মত কথা। মদনও আর কোন কথা বলল না। কেন এল। কৈফিয়ত দেয়া বা তাই নিয়ে বেশ গবেষণা করে বিশ-তিরিশটা কথা বলা—কিছু নয়। খেপীর কাছে ও সব কথার কোন মূল্য নেই। মদন জানে।

একটু সময় চুপ করে বসে থেকে আর একবার বলল,—বাক্‌সডা ও ঘরে রাখছি।

—ভালই করছ।

আবার বলল বিদ্যাধরী। যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। চলে গিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। এইটুকুই ঘটনা। এইটুকুই সত্য। বাকী আর সব কথা অবান্তর। ও কথা শোনবার বলবার কোন প্রয়োজন নেই। মটর কলাই সেদ্ধ একটা খুন্তি দিয়ে নাড়তে নাড়তে বিদ্যাধরী তাকাল মদনের দিকে। বরাবরের মত ফিক ফিক করে হাসল। কাঠে ফুঁ দিয়ে মুখ তুলল।

—কি পাক করো?

হেসেই বলল বিদ্যাধরী।—মটর কলাই সিদ্ধ। কুমড়া সিদ্ধ। রাইতের খাওন।

রাত্রের খাওয়ার বিবরণটা খুব মনঃপূত হোল না মদনের। ও বুঝল, ঘরে চাল নেই। ও জানে চাল না থাকলে সেদ্ধ-টেদ্ধ খেয়েই দিন কাটায় রাত কাটায় খেপী। উপায় কি। পাবেই বা কোথায়? বর্ষা-বাদলের দিনে খেপীর কষ্ট বেশি।

মদনদেরও তাই ছিল। বর্ষার পুরো তিনটে মাস কোথাও যাত্রাগান হবে না। তিন মাস যে যার দেশে ঘরে চলে যেত। মদনও যেত তার দেশে। বেতুলগঞ্জ, মুড়িয়ালগাঁও। বিষ্টির ঝিরঝিরানি। টিপটিপানি। উঠানে কাদা। বাগানে হাঁটু জল। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যেতে গেলে ডোঙায় চড়ে যেতে হয়। জলে জলাক্কার। ঘরে বসে থাক; তামুক খাও। ডাঁটা বা কুমড়ো ছেঁচকি ভাত খাও। ব্যস্। কোন কর্ম নেই। কোথাও বেরোবার উপায় নেই। এখানে তবু জল কম। মুড়িয়ালগাঁওয়ে জল জমত আরও বেশী। পাশেই ছিল সোনামুখী নদী। খাল বিল মাঠ জলে ভাসিয়ে দিত।

তিন মাস পরে আশ্বিনের প্রথম দিকেই আবার চলে যেতে হোত যাত্রাগানের দলে। ব্যস্ পুজোর মরশুমে শীতে-গরমে পুরোদমে চলত গাওনা। আবার রাতের পর রাত জেগে পাঁচ গাঁওয়ের মানুষকে মুগ্ধ করে রাখা। এ এক নেশা। কিষ্ট যাত্রার পালা গাইলে মূল গায়েন থাকত মদন ভুঁইয়া।

সেই মদন ভুঁইয়া। এক ডাকে যাকে পাঁচ গাঁওয়ের মানুষ চিনত। সে আজ এক বাউলানীর ছাপড়ায় উবু হয়ে বসে মটর সিদ্ধ করা দেখছে। সবই অদৃষ্ট!

—বলি খেপী, আছস না কি লো? আলো অ খেপী!

মদন গলা শুনেই বোঝে, পদ্মদিদি এসেছে।

গয়লা পদ্মভূষণ কোমর দুলিয়ে কাঁধের বাঁক নামাল। হাতখানাকে বেঁকিয়ে মেয়েলীহস্তে কপালের ঘাম মুছল। মদনের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হোল।

—তুমি উদয় হইলা কখন? কুমির ঘরে নি আছিলা?

মদন একটু সঙ্কুচিত হোল। কথাটা ঘুরিয়ে বলল।—ভাণ্ডে নি কিছু আছে?

—ক্ষীর আছে পোয়াটাক। বিষ্টি বাদলে ক্ষীর খাইব কেডা?

—আমি খামু। দিয়া যাও ক্ষীরটুক।

হাসল পদ্মদিদি। ধুতির আঁচল ঘুরিয়ে গায়ে তুলে একটা জঙধরা টিনের কৌটা থেকে বিড়ি বার করল। নিজে একটা নিল। মদনকে একটা দিল।

—এট্টু আগুন দ্যাও।

কাঠের উনুন থেকে একখানা কাঠ টেনে বার করল মদন। পদ্মদিদি বিড়ি ধরাল। মদনও ধরাল।

—খপর শুনছ নি?

বিদ্যাধরী ফুটন্ত মটর কলাইয়ের হাঁড়ি থেকে চোখ ফেরাল।

পদ্মদিদি বিদ্যাধরীর দিকে তাকিয়ে বলল।—হুনাহুন কথাডা কানে আইল।

মদন বিড়িতে একটা জোর টান দিয়ে বলল।—কি কথা?

—আলো ধড়ে আমার প্রাণ নাই। শুনলাম মোল্লারা ঘোপে-ঘাপে সব একত্তর অইয়া মিটিন্ কইরত্যাছে। কলকাতায় নি শ্যাখে গো কাইট্যা কুচিকুচি করছে লো?

মদন বিদ্যাধরী দু'জনেই অবাক হয়ে তাকাল, জানি না তো। দু'জনের চোখেই বিস্ময়।

কলকাতায় শেখ ভাইদের কেটে ফেলেছে। এ খপর তারা জানবে কোত্থেকে? কোথায় কি হচ্ছে, অত খপর কে রাখে। খপর অত পাবার উপায়ই বা কি! কলকাতা থেকে মাঝে মধ্যে এক-আধজন মানুষ বাবুদের বাড়ি আসে। তারাই হয়তো খবর এনেছে। আর মদন জানে, খবরের এক রকম কাগজ বেরোয়। তাতে সব খপর ছাপা থাকে। সে কাগজ যদি বাবুদের বাড়ি এসে থাকে।

—খপর শুইন্যা মোল্লারা চেইতা গ্যাছে গা। অখন এয়ানে কাইজা করনের ফন্দী করত্যাছে।

—কও কি কথা? কিসের কাইজা?

বিদ্যাধরী গালে হাত দিয়ে চোখ বড় করল। এ আবার কি কথা! মারামারি। কার সঙ্গে মারামারি? কিসের মারামারি। এমন কথা তো জন্মে শোনে নি তারা। জমিদারে জমিদারে কাইজা হয়। চর দখল নিয়ে রামদা শড়কি নিয়ে মারামারি হয়। দু-চার দশটা খুন-জখম হয়ে যায়। কিন্তু সে মারামারিতে শ্যাখ হিন্দু একই সঙ্গে রামদা ঘোরায়। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

—হ, খপর শুইনা ধড়ে আর পরাণ নাই। কলকাতায় কাইজা লাগছে।

এয়ানে তার কি সম্পর্ক ? হুনাহুন কানে আইল। কইলকাত্তার থিকা ছুরাবদ্দী ছায়েব মানুষ পাঠাইছে মোল্লাগো কাছে।

কি যে হাবর-জাবর কথা বলে পদ্মদিদি!

মদন বিড়িতে টান দিয়ে হাসে।—কেউ নি তোমারে চাপর্স্রি দিছে। এয়াও কি হইবার পারে ?

—আলো, নিজ কর্ণে শুইনা আইলাম।

মদন বলে,—ও হগল কথা ছাড়ান ছাও। ক্ষীরটুক বাইর করো।

বিড়িতে শেষটান দিয়ে পদ্মদিদি কোমর বেঁকিয়ে উঠে বসল।—হ, রাইত বেশি করুম না। লও, ক্ষীরটুক দিয়া যাই।

—কয় পইসা ?

মদনের কথায় পদ্মদিদি হাসল এতক্ষণে।—খেপার ঘরে জিনিষ দিয়া দাম লই না।

বিদ্যাধরী হাসল।

মদন ওঘরে চলে গেল। একটা কলাইয়ের বাটি নিয়ে এল। মাটির হাঁড়ি থেকে এক বাটি ক্ষীর ঢেলে দিল পদ্মদিদি। তারপর বাঁকটা কাঁধে উঠিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

মদন ক্ষীরটা পাশে রেখে পোড়া বিড়িটা আবার ধরাল। খাওয়াটা আজ ভালই হবে। মটর কলাই সেদ্ধ, কুমড়ো সেদ্ধ, ক্ষীর। ভাতের আর দরকারটা কি ? পয়সা নিল না পদ্মদিদি। খেপীর ঘরে জিনিষ দিয়ে পয়সা নেয় না। খেপী বিদ্যাধরীর একি মর্যাদা না ভালবাসা ? বিদ্যাধরী যেন সংসারটাকে বশ করে রেখেছে! কুমির সঙ্গে বিদ্যাধরীর কোন তুলনাই হয় না।

কুমির হাতে লঙ্কাবাটা দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে পুটি মাছের ঝাল। আর খেপীর ঘরে মটর সেদ্ধ। যেন আকাশ-পাতাল তফাত। ও খাওয়ায় বুক পেট জ্বলে। দেহটা গরম হয়ে ওঠে। আর এখানে এই সামান্য আয়োজন। কিন্তু তার স্বাদ যেন পরাণটাকে ঠাণ্ডা করে দেয়।

খেপীর আলো-আলো দেহখানা যেন চন্দ্র দিয়ে মাজা। চন্দ্রর আলো নিয়ে মেজে দিয়েছে ওর দেহখানা। ঠাণ্ডা। নরম। রসে টইটম্বুর। খেপী বিদ্যাধরীর তুলনা নেই।

মদন পোড়া বিড়ি দুটো টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বিদ্যাধরীর হাসি হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। কাঠের উনুনের আগুনে চোখদুটো জলে ভরা। মুখখানা লাল আভা। আরও ঝকঝকে কাঁসার থালার মত। মদন তাকিয়ে থাকে। দেখতে দেখতে ওর মনের ভাবনা-চিন্তার ওঠাপড়া যেন স্থির হয়ে আসে।

আস্তে বলে মদন—একখান কথা জিগামু?

বিদ্যাধরী তাকায়।

—তোমার মনে কোন দুঃখ-যন্ত্রণা নাই?

ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী। সেই হাসি। আকাশের চন্দ্রর মত হাসি। পাকা ধানের শীষের দোলানী হাসি। পাঁচ বছরের মাইয়ার ট্যাবা গালের হাসি।

উত্তর দিতে হয় না। বিদ্যাধরীর হাসিই জানান দেয়। দুঃখ-কষ্ট তার মনের ত্রিসীমানায় নেই। দুঃখ-কষ্ট কাকে বলে জানে না বিদ্যাধরী। ওর ভাবগতিক মদন ঠিক ঠিক ধরতে পারে না।

কি পায় বিদ্যাধরী? কি আছে ওর? কিছুই তো নেই। চাল-চুলো নেই। ধান-কুলো নেই। জমিজিরাত নেই। সব না পাওয়ার কোন দুঃখই নেই। কিছুই নেই। তাই কি দুঃখ নেই!

বিদ্যাধরী মটর সেদ্ধ নামাল।—তোমারই বা কষ্টডা কিয়ের?

—কি কও কথা! আমি কি আছিলাম, কি অইছি। কিষ্টযাত্রার কিষ্ট আছিলাম। পাঁচখান গাওয়ের মানুষ চিনবার পারত। আমার এট্টা মান আছিল। কি হইয়া গেছি আমি!

বিদ্যাধরী খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসন আর থামে না। এ য্যান একখান হাসনের কথা। তামাসার কথা। হায়রে কপাল। খোলস লইয়া মইল। ভিতরের মানুষ চিনল না।

এত অকারণ হাসি ভাল লাগে না মদনের। এই খেপীর পাগলামী! কিছুর ভেতর কিছু নয়। বেদম হাসতে শুরু করেছে। হাসনের কি হল ভাল করে বোঝে না মদন।

হাসতে হাসতে বলে বিদ্যাধরী।—তোমার বড় অংখার আছিল।

অহঙ্কার! হ্যাঁ, একে অহঙ্কার বলা যায়। এ অহঙ্কার কি য্যামন-ত্যামন! কত মান-সম্মানের!

—সাইয়ের দয়ায় অংখার ধুলায় মিশ্যা গ্যাছে। এয়াতে দুঃখুর কি?

মদন অবাক হয়ে তাকায়। কথার ভাবগতিক বোঝে। এই জন্যেই খেপীর সঙ্গে বনে না ওর। তার অহঙ্কার ধুলোয় মিশে গ্যাছে। কথাটা কি ভাল বলা হল।

—সাইয়ের ইচ্ছা অইলে আবার হইব।

—হ, এ কথাখান বেশ। সাইয়ের দয়া হলে আবার সব হবে। আবার তার দল হবে। আবার তার মান সম্মান হবে। পাঁচ গাঁওয়ের মানুষ একডাকে চিনবে। সে হবে দলের অধিকারী।

মনছুরের টাকা দেবার কথা কাল। আগাম টাকা দেবে।

মনে পড়ল মদনের।

কলাকান্দির ব্যাপারীর কাছে নিয়ে যেতে হবে খেপীকে। এবারে হাতে হাতে টাকা। তারপর দলের ডেছ্, বাকস্। গাওনাদার ছ্যামড়া জোগাড় করা। মাস দুয়েক দিন-রাত খেটে একখান জবর পালা তৈরী করে ফেলতে হবে। পূজোর সপ্তমীতে প্রথমবার পালাগান শুরু হবে। প্রথম গান গাইবে বিনে পয়সায় এখানকার বাবুদের বাড়িতে।

স্বপ্ন দেখে মদন। বিদ্যাধরী খাবার জোগাড় করে।

পুরো দুটো দিন কেটে গেছে।

মদন এসেছে বিদ্যাধরীর ঘরে। মদন ভাবে, এক কাজে দু'কাজ হয়েছে। কুমির কথা রাখা হয়েছে। বিদ্যাধরীকে কালাকান্দি নিয়ে যাবার সুবিধেও হয়েছে। এখন বিদ্যাধরীকে কালাকান্দির নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া খুব অসুবিধে হবে না। পুচ্‌পুক্কা পর্যন্ত হে'টে গিয়ে একটা নৌকো করে যাবে ওরা। কালাকান্দি পর্যন্ত পুরো পথ এই বর্ষায় হেঁটে যাওয়া যাবে না। খানিকটা হেঁটে, খানিকটা নৌকোয়।

নৌকোর ব্যবস্থা মদন কাল রাত্রে করে এসেছে।

হাটখোলায় গিয়েছিল কাল। মনছুর ভাইয়ের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে নিয়েছে। টাকাটা গোপনে সন্তর্পণে বাক্সে রেখেছে। খেপীকে নিয়ে যাবার কথা আছে আসছে কাল।

একটা কাণ্ড লক্ষ্য করেছে মদন। কাল রাত্রে হাটখোলাটা যেন থমথমা। দোকান সব বন্ধ ছিল। একমাত্র খলিফার দোকানের একটা ঝাঁপ খোলা ছিল। ব্যাপারখানা কি? মনছুর এলো। মুখখানা যেন ব্যাজার। চক্ষু দুটো এমনিতেই ওর লাল। কাল যেন আরও রুক্ষ চাউনী। তাকানির ভাবগতিক ভাল না।

মনছুর আসামাত্র পরমা হালুইকর বলল,—আলা কাদের রে কইস্। আলা আমারে ডম্‌কাই দ্যাখাইবার আইছিল। রামদাওয়ের একুক কোপে দুইখান কইরা ক্যালামু।

মনছুরের হলদে দাঁত বেরোল একটুখানি।—আস্তে বলল,- সাবধানে কথা কইও। হাওয়া কইল্ ভাল না। কাদের একা না। কাদেরের পেছনে মাইজার মোল্লা রইছে। সম্‌জিয়া কথা কইও।

পরমার ছোট ছোট চোখে বাঁকা হাসি।—তর দেখি কাদেরের উপুর বড় পরাণের টান।

আর কোন কথা বলে নি মনছুর।

ভাবগতিক ভাল লাগল না মদনের। হাটখোলার হাওয়াটা যেন থমথমা। ঘন অন্ধকার চারদিকে। ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে শেয়ালের ডাক। দূর থেকে অস্পষ্ট। দু-চারজন মনিষ্যি যা দেখা যাচ্ছে। সকলের চোখে-মুখে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা। কারো বা চোখে-মুখে উত্তেজনা।

মাটির ভাঁড়ে সবাই ঝাঁজ জলীয় দ্রব্য খেয়ে টঙ্ হোল।

—লও ইচা মাছের ঝাল খাও।

একটা বাটিতে করে সরষেবাটা চিংড়ি মাছের ঝাল বার করল খলিফা। খলিফার ঘুম-ঘুম চোখদুটো একটু যেন সতর্ক। এক-একবার টান টান করবার চেষ্টা করছে।

মদন খেল না। দিশী পচাই খেল না। ইচা মাছের ঝালও খেল না।

বলে মদনভাই বৈরাগী হইলা নি?

টিপ্পনি কাটল খলিফা। চোখে-মুখে একটা কঠিন ছুঁচোল ভাব। যেন বিঁধতে চাইছে।

মদন কথা বলল না। চুপ করে রইল। ও ভেবেছিল নেশা সে এখন দিন-কতক করবে না। বিদ্যাধরীকে ব্যাপারীর হাতে তুলে দিয়ে দল বানাবার বিধি-ব্যবস্থা যখন শুরু করবে, তখন নেশা জমবে। দুটো পয়সার মুখও দেখবে হয়তো।

এক-আধদিন সে এদের সবাইকে খাইয়ে দেবে। প্রাণ খুলে খাওয়াবে। দেখাবে যে তার পরাণডা ইন্দুরের মত ছোট পরাণ না। সে খেতে জানে খাওয়াতে জানে। গুণী-মানী হওনের পথ কেমুন, সে জানে।

মনছুর টাকাটা দিল মদনের হাতে। ওদের সামনেই।

—তোমরা সাক্ষী রইলা। হক্ কথা শুইনা নিলা!

সাক্ষী রাখল মনছুর পরমা আর খলিফাকে। পরমা ভাল করে তাকাল না মনছুরের দিকে। কেমন যেন একটা আড়াআড়ি ভাব বলে মনে হোল। মদন টাকা নিল। কিন্তু টাকা নেবার পর থেকেই তার বুকের ভেতরটা যেন উথাল-পাথাল!

পেট কোমরে গেরো দিয়ে টাকা বান্ধা রয়েছে। টাকার ছোঁয়াতেই যেন দেহটা গরম হয়ে উঠল। মাথায় নানা রাজ্যির ভাবন-চিন্তন। বিদ্যাধরীকে নিতেই হবে কালাকান্দিতে। আর কোন উপায় নেই। টাকা নিয়েছে।

বিদ্যাধরী যদি না যেতে চায়?

তুষিয়ে-বুষিয়ে যদি না নিতে পারে, বেঁধে নিতে হবে। মেরে নিতে হবে। যেমন করে হোক নিতে হবে। বিদ্যাধরী গেল না বললে আর কেউ শুনবে না। ওর ভারবাত্তি দেহটাকে নিয়ে যেমন করে হোক ব্যাপারীর গুদামে পেঁছে দিতে হবে। ওই দেহটাই তো সওদা করেছে ব্যাপারী। যেমন পাটের বোঝা সওদা করে।

ভন্ করে মাথাটার ভেতর কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। হাটখোলা থেকে ফেরার পথে মাঠে নেমে অকস্মাৎ অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মদনের মাথাটা যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, খেপীর দেহটাকে সওদা করেছে ব্যাপারী। দেহের মধ্যে ঘুপটি মেরে বসে খেপী ফিক ফিক করে হাসছে। সেই হাসন আশমানের চন্দ্র যেমুন আলো-আলো হাসে। ম্যাঘ নাই। জিলিক নাই। রাজ্যি ভরা খেপীর আলোয় ভরা।

মাথাটা জানি কেমুন করে। সে নিশা-ভাঙ করে নাই। তয় এমুন হইল ক্যান ?

কয়েকবার মাথাটা ঝাঁকায় মদন। জোরে জোরে পা ফেলে। ওর কালা মস্ত মস্ত কাদাভরা পা-ছ'খান টালমাটাল। হাই হাই করে হেঁটে চলেছে মদন।

বকুলতলা থেকে সোজা এসে চালাঘরে ঢোকে। তার সেই গোলাপফুল আঁকা রঙচটা বাক্সটা খোলে। টাকা ক'টা রাখে ত্যানার ভাঁজে। ভাল করে বন্ধ করে বাক্সটা। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে বুকে-পিঠে। বাঁশের মাচাটার ওপর কাঁথা পাতা। তার শোওনের জায়গা।

বসে হাঁপায় মদন। মোষের মত হাঁপায়। ছ'দণ্ড জিরিয়ে নেয়।

হ্যাঁ। তার ভাত ডাইল ঢেকে রেখেছে বিদ্যাধরী ঘরে। কলাইয়ের থালাটা একটা চুবড়ি দিয়ে ঢাকা।

খেয়ে শুয়ে পড়বে মদন। খেপী শোবে পাক ঘরে। খেপী কি শোবে ? কে জানে। ও দেখেছে, খেপী গভীর রাত্রে ঘুমোয় না। সাধনের কাম করে। দমের কাজ। কি যে করে মদন জানে না। কিন্তু দেখেছে সকল রাজ্যি যখন ঘুমে, খেপী তখন ঘুমায় না।

যা মন নেয় করুক। ও জানে খেপী তার খপর নিতে আসবে না। সেও খেপীর খপর নিতে যাবে না। রাত কাটবে দিন কাটবে। একইভাবে কাটবে।

একভাবে কাটতে দেবে না মদন। আসছে কাল বিদ্যাধরীকে কালাকান্দি নিয়ে যেতেই হবে। যেমন করে হোক বিদ্যাধরীর ওই নধর দেহখান পৌঁছে দিতে হবে। টাকা তার চাই। দল তাকে বানাতেই হবে। দলের অধিকারী হবে মদন ভুঁইয়া।

বেলা পড়ে এসেছে। সূর্য গাছের আগা থেকে বেশ খানিকটা নেমেছেন। মাঝে মাঝে ছেঁড়া মেঘে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে রোদ্দুর।

বিদ্যাধরী ঘরের বাইরে একটা চ্যাটাইয়ের ওপর বসে একতারার তার বাঁধছে।

বঙ—বঙ—আওয়াজ উঠছে একতারায়।

পা ছড়িয়ে বসেছে বিদ্যাধরী। কলাগাছের খোড়ের মত পা দু'খানার ওপর এক-তারার লাউয়ের ডোলটা রয়েছে। তার বাঁধছে বিদ্যাধরী।

লাউয়ের ডোলটা বদলাতে হবে। পুরনো হলে বাজে ভাল। কিন্তু বোধহয় ভেতরে পোকা ধরেছে। ডোলটা দু'হাতে ধরে ঝাঁকায় বিদ্যাধরী। না। ভেতরে কোন শব্দ নেই।

তবে আওয়াজটা গুমগুমাইয়া ওঠে না ক্যান ?

কালা মদন বাজে না। এইবারে কালা মদনকে বাজাতেই হবে। একতারাটাকে কালা মদন ভেবে নিয়েছে বিদ্যাধরী। তার পাল্টাবে। মেরামত করবে। বাজাবে কালা মদনকে।

আপন মনেই ফিক ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী। চোখের কোলদুটো ফুলো ফুলো।

একতারাটা এতক্ষণে একটু পদে এসেছে। চাঁছা বাঁশের ঠোঁটে চাপ দেয় আঙুল দিয়ে। এক আঙুলে তারে ঘা দেয়—বঙা—বঙ—বঙা—বঙ—বঙা—বঙ—

আওয়াজ উঠেছে। এইবাবে বেজেছে কালা মদন।

"সাইয়ের নামে আওয়াজ তুইল্যা
ভাসরে মদন সংসারে।
মিঠা রসে মজবি যদি অন্তরে।
অ কালা মদনারে—মদন আমার—"

পিঠের ওপর একখানা হাতের ছোঁয়া পেয়ে খেপীর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকাল। ডান হাতে একটা বিড়ি ধরিয়ে মদন বাঁ হাতখানা ওর পিঠের ওপর রেখেছে। মদনের চোখে ট্যালা ট্যালা তাকানি। একটু যেন ভয়-সঙ্কোচ। বিদ্যাধরী হাসল।—সুমুখে আইস্।

মদন সামনে এল না। পেছনে বসে রইল। হাতখানা পিঠ থেকে নামাল না। পিঠের ওপর হাতের চাপ দিল। চাপটা অনুভব করল বিদ্যাধরী। মদন কখনো এমন করে তার গায়ে হাত দেয় নি। এমন করে কখনো তার হাতে পিঠে চাপ দেয় নি। এক-আধ সময় চলতে চলতে হয়তো তার হাতখানা ধরেছে। কিন্তু সে হাত ধরায় কোন সঙ্কোচ ছিল না। সহজ মানুষের স্পর্শ বলে মনে হয়েছিল।

আজকের এ স্পর্শ যেন বাঁকা-ত্যাড়া। পিঠের ওপর হাতের চাপ। দেহের ভেতরে যেন কিলবিল করে ওঠে। ওর হাতের ছোঁয়ার মধ্য দিয়ে মদন তার নিজের মনের কিলবিলানি ওর মনে ঢুকিয়ে দিতে চায়।

আলগা হাসি খেপীর মুখে।

তাকায় মদনের দিকে। আস্তে বলে,—কিছু কইবার চাও?

মদন বলতে কিছু চায় কি? না। মদন কিছু বলে না। কিছু বলতে চায় না। উত্তরে হাতখানা আর একটু নামিয়ে খেপীর কোমরটা জড়িয়ে ধরে কাছে টানতে চায়।

এদিক-ওদিক তাকায় মদন।

সামনে বকুলতলায় খোঁটায় একটা গরু বাঁধা রয়েছে। পুকুরপাড়ে জনমনিষ্যি নাই। বাঁ ধারে নিচু জমির মাঠ ধু-ধু। দূরে গাছ-গাছালীর ছায়ারেখা আর মস্ত আকাশখানা।

—কি চাও?

আরও একবার বলে খেপী বিদ্যাধরী।

ও জানে না। মদন এক অসম সাহসের মতলব করেছে আজ।

দুপুরে ঘুমোয় নি। শুয়ে শুয়ে শুধু ভেবেছে। ভেবেছে কেমন করে খেপীকে কালাকান্দির ব্যাপারীর কাছে নেয়া যায়! ভাবতে ভাবতে নিজের বোকামিতে হাসি পেয়েছে তার। সে একটা বোগ্‌দা মাধাই। নিজে সে একটা সাঁই যুয়ান পুরুষমানুষ। কখনো কি সে খেপীকে জোর করে ধরে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। খেপীকে জোর করে ঘরে টেনে নিয়ে এসেছে? কেন। কেন সে জোর করে নি। গায়ের জোর তার কম নয়। আর জুরিজারি তো করবে মর্দামানুষ। মাইয়ামানুষ তয় নি বশে আসবে। সে আজ পর্যন্ত খেপীকে বশে আনতে পারে নি। তার একমাত্র কারণ এইটেই।

সে একটা ভ্যাড়া। খেপী তার কাছ থেকে একটু জোর চায়। একটু আউগান চায়। সে না এগিয়ে গেলে খেপী এগোবে কেন? হাজার হোক বিদ্যাধরী মাইয়ামানুষ।

বড় ভুল করেছে মদন।

একটু জোর করলে এতদিনে খেপীকে সে পুরো দখলে আনতে পারত। তার কেনা বাঁদী হয়ে থাকত। সে যা বলত, তাই করত। তার কথার ওপর কথা বলতে সাহস পেত না।

কেন যে সে খেপীকে এতদিন ভয় করে চলেছে। নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। আরে রাম। রাম। ভয়-ডরের আছে কি। খেপী আস্ত একটা মাইয়ামানুষ। তাকে এত ভয়-ডর করাটা মোটেই উচিত কাম হয় নাই। একবার খেপীকে নষ্ট করে ফেলতে পারলে খেপীর ডম্‌ফাই বেরিয়ে যাবে। তখন সে যা বলবে, তাই শুনবে।

—কি চাও?

খেপী তারা-তারা চোখে তাকাল, মদনের হাতখানা নিজের কোমর থেকে ছাড়াবার কোন চেষ্টা করল না।

মদন মুখটা ওর কানের কাছে এনে বলল,—ঘরের মধ্যে আইস।

না। কথা অমান্য করল না বিদ্যাধরী।

একতারার ডোলটা কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মদন ওর হাতটা ধরে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে ঘরের ঝাঁপটা বন্ধ করে দিল।

বিদ্যাধরী বড় বড় চোখদুটো মেলে তাকাল মদনের দিকে। যেন কি একখান সর্বনাইশা কাণ্ড দেখছে বিদ্যাধরী। একটা বিভুৎষি কিছু প্রত্যক্ষ করছে। ও দেখছে। দেখছে তো দেখছে। ওর দেহে যেন ও নেই। ও দেহ থেকে আলাদা হয়ে দেখছে। ওর দেহটাকে জোর করে দু'হাতে নিজের বুকের কাছে টেনে নিল মদন।

মদনের চোখে আগুন। সর্বনাইশা আগুন। যে আগুনে সংসার পোড়ে। পরাণ জ্বলে। সব্বকম্ম ছারেখারে যায়। হায়রে। আগুনের নিশা।

তার কালা মদন তার চোখের সামনে আগুনে পুড়ে মরতে চাইছে। এ আগুন নিভানোর কম্ম বিদ্যাধরীর নাই। বিদ্যাধরী সে চেষ্টাও করল না। ও যেন বিবশ অবশ হয়ে গেল। দেহের মধ্যে ও উপুরের পৈঠায় উঠে ট্যালার মত তাকাল।

মদন উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

এতদিন সে ছিল বোগদা মাধাই। মাইয়ালোকেরে ঘাড়দানা দিয়া কাছে টানতে পারে নাই। আ রাম। রাম। সে কি পুরুষমানুষ আছিল? এইবার আর যাইব কোথায়? খেপীর নছর-বছর সব ভাইঙা যাইব।

মদনের গায়ে তখন অসুরের শক্তি। মদনরে আর বাধা দেওন যাবে না। আর আটকান যাবে না।

তার কালা মদন আগুনে পুইড়া মইল। বড় বড় চক্ষুদুইটা জলে ভরে উঠল খেপীর।

নরম গালের ওপর দিয়ে চোখের জলের ধারা নামল।

হায়রে আগুনের নিশা!

রুদ্ধস্বরে বিদ্যাধরী চেঁচিয়ে উঠল।—আগুন—আগুন!

মদন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোথায় আগুন?

কোথায় আগুন?

ভয়ে-তরাসে মদনের বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। একি কাণ্ড! খেপী চেঁচিয়ে উঠল, আগুন, আগুন!

টলমল জল-ভরা চোখদুটো মেলে তাকিয়ে আছে বিদ্যাধরী চালের বাতার দিকে। আগুন, আগুন!

সত্যিই চারদিকে আগুন দেখছে বিদ্যাধরী। মদনের চোখের আগুন ছড়িয়ে

পড়েছে চারিদিকে। কুমির ঘরে, তার ঘরে। থলিফার দোকানে। হাটে-মাঠে। সর্বত্র।

কেন যে এমন দেখছে খেপী জানে না।

টালিবালি চোখে তাকায় মদন। আগুন কোথায়?

—কোয়ানে? আগুন কোয়ানে?

আপনমনেই বলে বিদ্যাধরী।—সবখানে। আগুনে সব পুইড়া গ্যাল।

মদন ফ্যালফ্যাল করে তাকাল খেপীর দিকে। খাইছে! খেপীর মাথাই বুঝি গোলমাল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে এসে বাঁশের মাচার ওপর বসল মদন। খেপীও এতক্ষণে উঠে বসল।

মদনের দিকে তাকাল।—তুমি নিজের আগুনে নিজে পুইড়া মইলা।

বিদ্যাধরীর মস্ত ডাগর চোখদুটো দিয়ে টপটপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

মদন অবাক। এই প্রথম ও খেপী বিদ্যাধরীর চোখে জল দেখছে।

—তয় শোন কথা। এই গাওয়ে নাটা জুড়ান আছিল। আমার বাপে আছিল তখন।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মদন।

এতদিন রয়েছে বিদ্যাধরীর সঙ্গে। বিদ্যাধরী কোনদিন তার অতীতের কোন বিত্তান্ত তাকে বলে নি। কখনো কোন কারণে বিদ্যাধরীর মুখে এমন কথা শোনে নি মদন। যা হয়ে গ্যাছে, তা গ্যাছে। তা নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা কখনো ছ্যাখে নি। বিদ্যাধরী শোক করতে জানে না। কাঁদতে জানে না। মনের খুশিতে নাচে গায়। বেড়ায়। ভিক্ষে করে। খায় আর ফিকফিক করে হাসে।

এই নি বাউল-বাউলানীর ধর্ম! যা গ্যাছে, যাইবার ছ্যাও। দুঃখু কিসের। শোক কিসের? সাইয়ের সংসারে হাজার লীলা। শুধু চোখ মেলে ছ্যাখ আর মনের খুশিতে নাচ গাও ডুগডুগি বাজাও। বাউলীর কোন যন্তন্না থাকতে নাই। বাউলীর কাঁদন নাই। আফশোষ নাই।

আজ বড় দাগা দিয়েছ তুমি। আমার কালা মদন। তোমার দুঃখে দুঃখী হইয়া আমার চক্ষে জল আইছে। আমার কোন দুঃখ নাই।

তবে শোন কথা। আমার বাপ ছিল আর ছিল নাটা জুড়ান।

নাটা জুড়ানের বিত্তান্ত কেউ জানে না।

হ্যাঁ। এমনি করেই নাটা জুড়ান তাকে একদিন জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল। কেউ জানে না সে বিত্তান্ত। নাটা জুড়ানের চোখেও এমনি আগুন ছিল। সেদিন কিন্তু বিদ্যাধরী আগুন ছ্যাখে নি। পালিয়ে গিয়েছিল বকুলতলার দিকে। যেতে যেতে দেখেছিল

নাটা জুড়ানের জিবখানা একহাত বেরিয়ে গেছে। আর মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। সে স্পষ্ট দেখেছিল।

তিন রাত পোয়ালো না। নাটা জুড়ান মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে গেল। কেন যে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠল বিদ্যাধরী জানে না। সত্যি সে কিছুই জানে না। কিন্তু সে দেখেছিল। বকুলতলায় দৌড়ে যেতে যেতে পরিষ্কার দেখেছিল।

লোকে বলে, সে গণতুক জানে। লোকের অনিষ্ট করতে জানে। কিন্তু অনিষ্ট সে কারো কখনো করে নি। সে শুধু দেখেছিল। নাটা জুড়ান মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে গেল।

পিকিতি লইয়া সাধন করতে চাইছিল নাটা জুড়ান। চার চাঁদের সাধন। রজ বীজ মলমূত্র লইয়া সাধন। পাঁচ বাণের সাধন। মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, সম্মোহন। এ সাধন বড় কঠিন সাধন।

দমের জোরে পিকিতির কাছ থিকা রজ শোষণ কইরা লইয়া বীজে মিশান। নীরে-ক্ষীরে মিশাইয়া জাল দ্যাওনের কাম। রসের জাল হইলে ঘন হইব। তখন অমর্ত্য রস। এয়া কি নাটা জুড়ানের কাম? নাটা জুড়ান সাধন চায় নাই। চাইছিল বিদ্যাধরীর দেহখানা।

দ্যাখ, কই কথা শোন। বাউল-বাউলী যারা দেহের সুখে সুখের সন্ধান করে, বাইর দুয়ারে যাগো নজর, তাগো জন্যে এই পিকিতি সাধন। তারা পিকিতি লইয়া সাধন করতে করতে ধীরে ধীরে কামের দুয়ারে তালা লাগ্যাইয়া দেয়। তখন পদ্মে অলি বসে। কিন্তু মধু পান করেনা। কামের গন্ধ উইড়া যায়।

যাগো মনে কামের গন্ধ নাই, তাগো ও সাধনে কি কাম। তারা সাইয়ের নামে বাদাম তুইলা উজানে অক্লেশে পাড়ি দিব। তাগো দেহের সম্বন্ধ কামের গন্ধ কোন ডারই প্রয়োজন নাই।

কি বা কমু তোমারে। রসের সাধনে যে কি আনন্দ তা বলনের না, কওনের না।

বিভ্রান্ত শোন। তুমি আমার কালা মদন। তোমারে আমি বুকের পৈঠায় বসাইছি। তুমি আমি হইলে তবেই নি রসের সাধন। শুধু আমিত্তে সাধন হইব না। তুমি আমি, তবেই নি প্রেম, তবেই নি রস আর আনন্দ।

তাই বুইল্যা তোমার দেহেব সাথে সম্বন্ধ নাই। বাইব দুয়ারে কপাট দিছি অনেক কাল। অখন যা কিছু সব অন্তরে। বুঝলা নি বিভ্রান্ত। এ বিভ্রান্ত কওনের না, বলনের না। কইলে মানষে বিশ্বাস করব না।

তুমি আমার কালা মদন। তোমারে আটকানর ক্ষ্যামতা আমার নাই। তুমি

যদি আমার দেহখান চাও, দিবার পারি। তুমি চাইলে আমার না কওনের শক্তি নাই। কিন্তু তোমার পায়ে ধরি, আগুনে পুইড়া মইরো না। তুমি আমার প্রেমের মর্যাদা নষ্ট কইরো না।

ডাগর ডাগর চোখদুটো বেয়ে টপটপ করে জল ঝরছে। বিদ্যাধরী কাঁদছে।

মদন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছু বোঝে। কিছু বা বোঝে না। তবে এইটুকু বোঝে যেখানে কামের গন্ধ, সেখানে প্রেমের গন্ধ নাই। বাউল সাধনের এ তত্ত্ব বিত্তান্ত তার জানা ছিল না।

তুমি আমার কালা মদন। তুমি এই ত্রি-সংসারে আমার একমাত্র মানুষ, তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি। তুমি যা চাও, তা আমাকে দিতেই হবে। না বলার শক্তি নাই।

আমি অসহায় নিঃসম্বল এক বাউলী। তুমি আমাকে প্রেম ভিক্ষা দাও।

মদন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

তুমি আমার কালা মদন—আমার অন্তরের সব সম্পদ। এ সম্পদ তুমি কেড়ে নিও না।

মদনের চোখদুটো ভিজে ভিজে লাগে। বুকখানার ভেতরে মোচড়ায়। কিসের সাথে সে কি করতে গিয়েছিল—আকাশের চন্দ্রকে মাটির পচা পাঁকে টেনে নামিয়েছিল। ফুটন্ত পদ্ম—একে কুত্তার মুখে তুলে দিয়েছিল!

মদন থম ধরে রইল। মুখে আর রাও বাক্যি নেই।

আমার নি ভয় করে। সত্যি বুঝি আগুন লাগব সব্ব দিকে।

কে জানে। লাগতে পারে। খেপী বিদ্যাধরীর দর্শন মিথ্যা হয় না। কে জানে আগুন লাগবে কি না।

মদন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কখন যে সূর্য পচ্চিমে নেমে গেছেন, ওরা জানে না।

ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসে। মদন ব্যাড়ায় মাথা রেখে বসে বসে ভাবে। বিদ্যাধরী দু হাঁটু মুড়ে মুখ গুজে বসে থাকে। কথা নাই। আওয়াজ নাই। আন্ধার ঘরে দুটো সদ্য দগ্ধ পরাণ।

কিন্তু কালাকান্দির ব্যাপারী!

মদনের বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। কি জবাব দেবে সে মনছুরকে?

কালাকান্দিতে কাল বিদ্যাধরীকে নিয়ে যাবার কথা। ব্যাপারীর হাতে ওকে তুলে দেবার কথা। তারপর ওর কপালে কি হবে, সে ভগবানই জানে! ওই মনছুর হয়তো খাবাশী দিয়া বাইড়িয়া ওর পিঠের চামড়া তুলে দেবে। রক্তাক্ত পিঠখানা

নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে বিদ্যাধরী। পিটুনী খেয়ে মুখ দিয়ে হয়তো গ্যাজলা উঠবে।

উরে বাপুরে। সে ভাবতে পারছে না। ভাবতে ভাবতে তার দেহটা কাঁপছে। যেন তাকেই ধরে পিটুনী দিচ্ছে মনছুর। পারবে না। সে আর পারবে না। মনছুর আর ব্যাপারীর হাতে ওকে তুলে দিতে পারবে না।

এখন ইচ্ছে করলেই সে ওকে নিয়ে যেতে পারে কালাকান্দিতে।

তুমি যা কইবা, আমি তাই করুম। কথা অমান্ত করার সাধ্য নাই। না। বিদ্যাধরীকে তার কথা শুনতেই হবে। সে ব্যাপারীর গুদামে তাকে থাকতে বললে তাই থাকবে।

তুমি আমার কালা মাণিক। তুমি যা চাও, তাই দিমু।

ইস্ বুকটা আর মাথাটা যেন পাষাণের মত ভারী। মাথাটা নাড়ায় মদন। চুল এসে পড়ে কপালে চোখের ওপর। হাত দিয়ে সরায় না মদন। কাঁকড়া য্যান দাড়া বসিয়েছে তার বুকের স্থানে স্থানে। কি অসহ্য যন্ত্রণা! এ যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না।

ব্যাপারীর গুদামে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে খেপী। খেপীর নরম নধর পিঠখান খাবাশীর ঘায়ে রক্তাক্ত। ব্যাপারী হাসছে আর মনছুরকে বলছে চিৎকার করে।—লাগা পিট্টি। মাগীর রুস্কুস্ ভাইঙা দে। হাঁপাচ্ছে বিদ্যাধরী। হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে তাকাচ্ছে তার দিকে।

না। পারুম না। পারুম না আমি!

বিদ্যাধরী বাঁশের মাচার ওপর হু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ছিল। হঠাৎ মদনের ফিসফিসানিতে চমকে মুখ তুলল। তাকাল মদনের দিকে।

মদন আপন মনে বলছে,—আমি শালা কুত্তা। নরকের কুত্তা।

খেপীর হাঁটুদুখানার ওপর মাথা নামাল মদন।

হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

—আমি শালা নরকের কীট। আমারে পিটাইয়া মাইরা ফালাও। আমি তোমার সাতজন্মের শত্তুর।

হাঁটু নামাল খেপী। ওর কপালের ওপর মদনের মাথাটা টেনে নিল।

কি হল মদনের কিছু বুঝতে পারছে না। হঠাৎ এমন করে কেঁদে উঠল কেন? কাঁদনের কি হইল?

মদন ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। মাথা বুকের মধ্যে যে পাষাণ জমেছিল, সেটা যেন গলে গলে পড়তে লাগল চোখ বেয়ে।

—তুমি জান না। আমি তোমার শত্তুর।

খেপী বিদ্যাধরী বড় বড় চক্ষুদুটোয় অপার মমতা। মদনের মাথাটার ওপর হাত রাখল। কোন কথা বলতে পারল না। মদনেব কাঁদন দেখে ওর কান্না পাচ্ছিল। চোখদুটো য্যান আবার ভিজা ভিজা ঠ্যাকে। ওর ঠোঁটদুটো থর থর করে কাঁপছে।

—মদন খুব কাঁদল। তারপর মুখটা না তুলে বলল,—তুমি জান না, আমি তোমার কি সব্বনাশ কইরব্যার গিছিলাম।

বিদ্যাধরী কথা বলে না। ওর রুক্ষ চুল মাথার চাঁদির ওপর চুড়ার মত খোঁপা বাঁধা। মসৃণ কপালখানায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। ওষ্ঠ দুইটা তখনো থরথরাইয়া কাঁপে।

—তোমারে কালাকান্দির ব্যাপারীর হাতে তুইল্যা দিবার চাইছিলাম। তোমারে বেইচা দুইশত টাহা পাইতাম। কাইল টাহা দ্যাওনের কথা আছিল।

মদন আবার কেঁদে উঠল।

বিদ্যাধরী ওর মাথায় হাত বাখল। খুব আস্তে বলল,—আমি জানি।

—তুমি জান?

ওর কোলের ওপর থেকে উঠে পড়ল মদন। মদনের কালো মিশমিশে মুখখানা ভিজে। চোখের জলে আর ঘামে। ঠোঁটের ফাঁকে লালা। কপালের ওপর চুল। অবাক হয়ে গেছে মদন। বিদ্যাধরী জানে! ও জানে যে ওকে কালাকান্দির ব্যাপারীর কাছে দু'শত টাকায় বিক্রি করতে চেয়েছিল মদন। এ কথা জেনেও বিদ্যাধরী তার সঙ্গে হেসেছে। তাকে দু'দিন রেঁধে খাইয়েছে।

বিদ্যাধরী কি মনিষ্যি!

—হ', আমি জানি। ভয়ডর করি নাই। আমি জানতাম। ব্যাপারী আমাব কিছু কইরব্যার পারব না।

কথাটা অবিশ্বাস করা যায় না। ব্যাপারী যে ওর কিছু করতে পারবে না, এ কথা বিশ্বাস করা যায়। কিছু করতে পারেও নি। আগে যেদিন নিয়ে গিয়েছিল, সেদিন ব্যাপারী ওর গাওনা শুনে ওকে টাকা দিয়ে ছেড়ে দিল। কিছুই করতে পারল না। মদন নিজেও জানে। বিদ্যাধরীকে বশে আনা ব্যাপারীর কম্ম নয়। তবু সে চেষ্টা করেছিল।

বিদ্যাধরী আস্তে আস্তে উঠল।

মদনের দিকে তাকাল একবার। চোখদুটোয় অপাব মমতা ঝরে পড়ছে। আন্ধার ঘরেও সে চোখের আলো-আলো মমতা-মাখা দৃষ্টি চোখে পড়ে। মদন চোরের মত বসে রইল।

বিদ্যাধরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আন্ধার ঘরে বসে রইল মদন। একা একা বসে রইল।

না। এই কারখানার পর এ ঘরে আর তার থাকা চলে না। চলেই যাবে মদন। আর যাত্রাদল বানানের কাম নাই। টালিবালি করণের কাম নাই। চলে যাবে সে। কুমির সঙ্গে একবার দেখা করে চলে যাবে। কোথায় যাবে জানে না। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে। শুধু চলবে আর চলবে। পথে পথে চলতে চলতে দিন কাটাবে আর বিদ্যাধরীর বানান গান গাইবে।

মনছুরের টাকাটা ফেরত দিতে হবে।

মাচা থেকে নেমে বাক্স খুলে টাকাটা বার করল মদন।

বিদ্যাধরী কোথায় গেল কে জানে।

মদন ঘর থেকে বেরোল। কোনদিকে আর তাকাল না। সোজা পায়ে হাঁটা জংলা পথ ধরল। এই পথ গিয়ে শেষ হয়েছে চালতেবাগান ছাড়িয়ে পচা পুকুর ছাড়িয়ে বাবুদের বাড়ির পেছনে।

মদন হাঁটতে শুরু করল।

আঠারো

কাদামাখা শুকনো পাতার মচমচ শব্দ হোল চালতে বাগানে।

কুমি কান পাতল শুয়ে শুয়ে। কেডা আইল! আবার কি খলিফা এল? বড় ব্যাজার বিরক্ত হোল কুমি। আর সবাইকে এ ঘরের বার করে দিয়েছে। শুধু এই খলিফা এখনও তার পেছন ছাড়ে নি।

না, আর নয়। পচা আমের মত নষ্ট হয়ে গেছে কুমি। আর নয়। আর পচনের কাম নাই। এখন দু'দণ্ড রোদে 'াওয়ায় শুকিয়ে যদি ঝরঝরে হতে পারে, তবেই যথেষ্ট। একবার নষ্ট হলে আর ভাল হওন যায় না। তবু জলেপুড়ে শুকনো হওয়া যায়। পচনের জ্বালা আর থাকে না।

কুমি মদনকেও বিদেয় করে দিয়েছে। সবাইকে খেদিয়ে দিয়েছে। এবার যেমন করে হোক, দাসীবৃত্তি করেও নিজের দিন কাটাবে। তবু আর ওই নষ্টামী-ধষ্টামীর মধ্যে যাবে না।

উঃ! জ্বালাল এই খলিফা। আবার বাইরে শুকনো পাতার পা মড় মড় শব্দ। আজ বৃষ্টি হয় নি। কাদামাখা পাতাগুলান শুকিয়ে উঠেছে। পায়ের চাপের শব্দ। গরু-ছাগলের আসন-যাওনের শব্দ নয়।

দু'দিন কুমির যে কিভাবে কেটেছে ভগবান জানে। মদন চলে যাবার পরের

দিন ঘর থেকে বেরোয় নি কুমি। রাঁধন-বাড়ন করে নি। সমস্ত দিন কেঁদেছে আফুটি কেঁদেছে, তারপর বিকেলে উঠে দুটি মুড়ি চিবিয়ে খেয়েছে। কেমন যে লাগছে ওর, ও বলতে পারবে না কাউকে। বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করছে। ভিতরে যেন আগুন লেগে সব পুড়ে গেছে। খাঁ খাঁ শূন্য বুকখানা। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

মদনকে সে তাড়িয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে করেই তাড়িয়ে দিয়েছে। মদন জানে না যে মদন তার কতখানি। তার বুকখানা জুড়ে বসে ছিল মদন। এই ঘর এই বাগান সব যেন ভরাভরন্ত হয়ে ছিল। আজ সব শূন্য।

মাঝে মাঝে বড় বড় শ্বাস পড়ে কুমির। ভেতরটা যেন আথার আগুনের মত গরম লাগে। গায়ে আঁচল রাখতে পারে না।

ওই আবার মচ মচ শব্দ!

খলিফাকে একটু ধারকানি ছ্যাওনের কাম!

উঠে পড়ল কুমি। দরজাটা খুলে থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

খলিফা নয়। মদন। মদন এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে।

মাথার চুল আলুথালু। চোখদুটোয় ফ্যালফ্যালানি চাউনি। যেন চুপসে গেছে মানুষটা। কোথায় যেন বেদম পিট্টি খেয়ে এসেছে। মদনের চেহারা এমন কেন?

কুমির বুক থেকে একটা হাওয়ার ধমক গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠে।

ও কোনমতে বলে,—ভিতরে আইও।

ঘরের বাইর ভিটাটুক আন্ধার। ভিতরেও লণ্ঠন জ্বালায় নি কুমি।

অন্ধকার থমথমা বাতাসে মদন আস্তে বলে,—ভিতরে যামু না।

—তবে আইল্যা ক্যান?

—একবার ছাখা দিবার আইলাম।

কুমির গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল সেই ভিজা হাওয়ার কম্পন। চক্ষুদুইটা জলে ভরে উঠল। এগিয়ে এসে মদনের একখানা হাত ধরে টানল।—ঘরে আইসা কথা কও।

মদনকে ঘরে নিয়ে এসে চৌকিতে বসাল।

লণ্ঠন জ্বালান হোল না। নিজে মাটির ওপর কাঁদতে বসল। কান্না চাপতে পারছে না কুমি। কিছুতেই কান্না চাপতে পারছে না। লণ্ঠন জ্বালালে পাছে ওর কাঁদন মদন দেখে ফেলে, সেই ভয়ে ও লণ্ঠন জ্বালাল না।

অন্ধকার ঘরে চৌকির ওপর বসে মদন একটা বড় শ্বাস ফেলল। ওর গলার আওয়াজটা দুর্বল শোনাল।

—এ ছ্যাশে আর থাকুম না কুমি। চইল্যা যামু।

কুমি কোন জবাব দিল না, পাছে তার কান্না ধরা পড়ে।

—এই কথাখান কইবার আইলাম।

একটু সময় নিল কুমি। একটু সামলে নিয়ে বলল,—কার উপুর গোসা কইর‍্যা চইল্যা যাইবা ?

মদন কোন কথা বলল না।

ভিজা গলার আওয়াজ কুমির।—গোসা কইরো না। পরাণডা যদি ছিড়া দ্যাখাইবার পারতাম!

যেন ফিস ফিস আর্তনাদ করে উঠল কুমি।

অন্ধকার ঘরের থমধরা বাতাস কেঁপে উঠল। কথাখান যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল আনাচে-কানাচে।

পরাণডা যদি ছিড়া দ্যাখাইবার পারতাম!

কুমির এ 'আক্ষেপের কোন জবাব নেই। এ ক্ষোভ মোছবার শক্তি নেই মদনের। স্তব্ধ হয়ে অন্ধকার ঘরে বসে রইল মদন। কুমির আর কোন সাড়াশব্দ নেই। আন্ধার ঘরে একচ্যাপ অন্ধকার কালো মাংসপিণ্ড পড়ে রয়েছে মাটির ওপর। এ মাংস-পিণ্ডর কোন দাম নেই মদনের কাছে। মদন চায় না তবু কুমির অন্তরখানা যেন স্পষ্ট দেখতে পায় আজ।

না, অসহ্য এই অবস্থা। বিদ্যাধরী কুমি দু'জনের কাছ থেকেই তাকে পালাতে হবে। নইলে সে মরে যাবে। আগুন জ্বলে যাবে। হ্যাঁ, মদনও যেন দেখতে পেল আগুন জ্বলে যাবে। বিদ্যাধরীর কথাটাই সত্যি হবে শেষ পর্যন্ত। আগুন জ্বলে যাবে।

ঘরে বড় ভাপসানি গরম। আকাশটা কি মেঘে ঢাকা না কি বৃষ্টি নেই বলেই গরম পড়েছে ?

মদন উঠল চৌকি থেকে। আস্তে আস্তে দুয়ারের কাছে বেরিয়ে এল। ও আশঙ্কা করছিল কুমি হয়ত উঠে আসবে। তাকে ধরবে। তাকে যেতে দেবে না।

না। কিছুই করল না কুমি। অন্ধকার ঘরে যেমন ছিল, তেমনি রইল।

মদন দুয়ার পেরিয়ে নামল চালতে বাগানে। ভুতুম্ পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। ভুত-ভুভুম্ বোধহয় কোন চালতে-গাছের ওপব বসে একটানা ডেকে চলেছে। কাদামাখা পাতাগুলো শুকিয়ে গেছে। পায়ের নিচে মড় মড় আওয়াজ।

এখন তাকে যেতে হবে হাটখোলায়। রাত বেশি হয় নি। খলিফার দোকান নিশ্চয় খোলা আছে। আর সেখানে মনছুর পরমাকে নিয়ে গাঞ্জা অথবা মদ চলছে। নিদেনপক্ষে তামুক।

হাটখোলায় যাবে। মনছুরকে টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। খলিফা পরমার সামনেই টাকা ফেরত দেবে। নয়তো বলবে টাকা পায় নি। ওরা সাক্ষী ছিল।

মনছুর হয়তো মানতে চাইবে না। টাকা দিয়ে সে কি করবে। বিদ্যাধরীকে তার চাই। ব্যাপারীর কাছে তার কথার খেলাপ হবে। ব্যাপারীকে সে টাকা ফেরত দিতে গেলে ধারকি খাবে। টাকা ব্যাপারীর—অনেক আছে, টাকা সে কি করবে। যে দ্রব্যটি আনতে বলেছিল, সে দ্রব্যটি চাই।

না। পারবে না মদন স্পষ্ট বলে দেবে,—বিদ্যাধরীকে কালাকান্দি নিয়ে যেতে সে পারবে না। টাকা ফেরত নিতে হয় নাও, না নিতে হয় নিও না। বিদ্যাধরীকে পাবে না।

মনছুর রেগে যাবে, হয়তো মারপিট করতে আসবে। নয়তো শাসাবে। যা খুশি করুক। তাকে যদি মেরেও ফেলে তবু বিদ্যাধরীকে নিয়ে সে আর কালাকান্দি যেতে পারবে না। অসম্ভব।

মদন টাকা ফেরত দিয়ে খলিফার দোকানে আজ রাত কাটাবে। তারপর কাল ভোরে উঠে কোথাও চলে যাবে। এ দেশে আর থাকবে না।

মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে মদনের! পা-হাত যেন দুর্বল লাগছে। ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। যাত্রাদল করা আর হোল না। অধিকারী হওয়ার বাসনা এ জন্মের মত স্থগিত রইল। কিষ্টযাত্রার মদন তুঁইয়া খ্যাযম্যাষ ভিখারী অইল। লোকে যা মন ল্যায় তাই বলুক। কিছু আসে যায় না।

হাটখোলার দিকে এগিয়ে এল মদন।

মাঠ পেরিয়ে সড়ক পার হয়ে হাটখোলার ওপর উঠল।

খলিফার দোকানের সামনে অত গণ্ডগোল কিসের? চারদিকে ভাল করে তাকাল মদন। হাটখোলা আন্ধার। সব যেন টাপ্‌টুপ্‌ বল্লার টুপ্‌। একখান দোকানের ঝাঁপ খোলা নাই। জনমনিষ্যি নাই।

খলিফার দোকানের সুমুখে পাঁচ-সাতজন মানুষ। ফিসফিসানি। গজ-গজানি।

এগোল মদন। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল।

হায় রে। ইকি বীভৎস কাণ্ড! জন পাঁচেক খ্যাখ। কাউর হাতে নড়ি, কাউর হাতে লাঠি। হ' খলিফাও নি রইছে। কি ত্যাখে ওরা?

আরও এগিয়ে এল মদন।

ইরে। রক্তে বালুমাটি লাল হয়ে গেছে। কাদের মিয়ার গলার পাশ দিয়ে কান্ধের উপুর একখান কোপ বসাইছে। এক্কু কোপে এক বিঘত কেটে গিয়ে কাদের মিয়ার একখান হাত ঝুলে পড়েছে। কি সর্বনাশ। এ কম্ম করলে কেডা?

মনছুরের হাতে একখান মোটা লাঠি।—আউক যুগীর ঘোপার মোল্লা ছায়েব। এচ্‌পার-ওচ্‌পার অইয়া যাইব আইজ।

খলিকার ঘুম ঘুম চক্ষু দুইটা ভয়ে বড় বড় হয়ে উঠেছে।—পরমা। পরমা।আলার কোপ বসাইয়া পলাইছে। আলারে পাইলে ওরা কাইটা কুচি-কুচি কইরা ফালাইব।

মোল্লা নি আইল। হ'। আল্লা আল্লা আওয়াজ উঠল। বাতাসে লাঠি আর নড়ি চরকির মত ঘুরতে লাগল। সব হালারে নিকাশ কইর‍্যা ফালামু।

ভয়ে বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। মদন সরে এল ওখান থেকে। সড়ক পেরিয়ে মাঠে নামল। একটু সময় দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল হাটখোলার দিকে।

ভীষণ আওয়াজ উঠতে লাগল। খ্যাপাদের আল্লা চিৎকার। নিকাশ করো। মারো। কাটো।—সব মিলিয়ে অন্ধকার চিরে চিরে ভয়ানক চিৎকার ভেসে আসতে লাগল।

আগুন—আগুন।

পরমা হালুইকরের দোকানে আগুন জ্বলছে। পরমা পালিয়েছে। তার দোকানে আগুন জ্বলেছে। সাইসাই করে বাঁশের মাচা আর বেড়া জ্বলে আগুনের জিভ বেরিয়ে পড়ল। আরও দুখানা দোকানে আগুন লেগেছে। দক্ষিণের আকাশটা লাল হয়ে উঠল।

আরও মানুষ জমল না কি? চিৎকারটা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বিদ্যাধরীর কথা যে এমন করে সত্যি হবে ভাবতেও পারে নি মদন। আগুন লাগল। ভীষণ আগুন। শুধু বাইরে নয়। মানুষের মনে আগুন ধরে গেছে।

আওয়াজটা যেন এগিয়ে আসছে। মাঠের দিকে এগিয়ে আসছে।

চোখদুটো তারা-তারা করে দেখল মদন। লাঠি, সড়কি, রামদা আগুনের আভায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। খ্যাপারা বীভৎস চিৎকার করতে করতে চতুর্দিকে ছুটছে।

হাটখোলাটা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে?

মদন দৌড়োল। মাঠের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে চলল। দক্ষিণ দিক থেকে সোজা উত্তর দিকে দৌড়ে চলল মদন। কোনদিকে তাকাল না। কোথায় যাবে ভাববার মত সময়ও পেল না। উত্তরের ঘোষপাড়ার ঝোপ-জঙ্গলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

একি সব্বনাশ! এদিকেও চিৎকার। হা-হো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ঝোপের ওপারে। ভীষণ আওয়াজ। অনেক মানুষের একত্র চিৎকার।

দাঁড়িয়ে পড়ল মদন।

কি করবে ভেবে না পেয়ে সামনে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল, তার ওপর বেয়ে উঠতে লাগল। এই গাছের ওপর উঠে বসে থাকা ছাড়া এখন আর অন্য কোন উপায়

নেই। বিরাট কাঁঠাল গাছটা। অনেকটা ওপরে উঠল মদন। কিন্তু একেবারে আগডালে উঠল না। কাঁঠালের ডাল পলকা। ভেঙে নিচে মাটিতে পড়লে এখনি মৃত্যু।

একখানা মোটা ডালের ওপর বসে ঝোপের ওপাশে তাকাল। ওপর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গাছগাছালী জঙ্গল ডোবায় জমা আন্ধার। কিন্তু ঘোষপাড়ার ওই জায়গাটায় মশালের আলোয় সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এক দঙ্গল মনিষ্যি। সব যেন ক্ষেপে উন্মত্ত হয়ে গেছে। তাদের হো—হো চিৎকারে বাতাস আন্ধার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ইরে আলায় হাতে রামদা, লাঠি, কুড়াল—একদঙ্গল মনিষ্যি। এখানেও নি কাইজা লাগল? ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছে। হায়রে হায়। কনকনাইয়া আগুনের জিব্বা বাতাসে উঠছে উপুরের দিকে। পাড়াখানই বুঝি ছারেখারে গেল।

ও কেডা? ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল একজন। চলার ভঙ্গি আর দৌড়ানব ভঙ্গি যেন পদ্মদিদির মতন। পেছনে দুটো বাচ্চা। আর একজন মাইয়া।

মার—মার—ভীষণ ডাক চিৎকার শুরু হোল।

হ' ওই তো পদ্মদিদি! ধরেছে, ধবেছে পদ্মদিদিকে। ঠ্যাংদুটো ধরেছে একজন। টেনে খানিকটা হিঁচড়ে আনতেই পাশ থেকে একটা লাঠি পড়ল। ফটাং—ফট্ ফট্—মাথার খুলিখানা দুফাঁক হয়ে গেল।

গাছের ডাল থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মদন! রক্তে ভেসে গেল পদ্মদিদিব মুখখানা।

হাত-পা সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে মদনের। গাছেব ডাল থেকে বুঝি মাটিতে পড়ে যাবে। ও জানে পড়বার শব্দ হলেই ওরা ছুটে আসবে তার দিকে। তাব মাথাটাও নিমেষে দু' ফাঁক হয়ে যাবে।

চোখ বুজল মদন। না। আর দেখতে পাচ্ছে না। এ আর দেখা যায় না।

পদ্মদিদির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। রক্তাক্ত মুখখানা। পদ্মদিদি মরতে চায় নি। প্রাণ নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। ওরা তাকে পালাতে দিল না।

এই পুরো সংসারটা কি আজ পাগল হয়ে গেল। তার নিজেরও কেমন পাগল পাগল ঠেকছে। মাথাটা কেমুন জানি করে।

ও বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে এবার।

॥ উনিশ ॥

কয়েক দণ্ড কিভাবে যে গাছের ওপর ছিল মদন জানে না।

ওর ভাল করে জ্ঞান ছিল না। দু'হাতে একখানা মোটা ডাল বুকে-পেটে চেপে ধরে উপুড় হয়ে ছিল। কতক্ষণ ওর ভাল করে মনে নেই।

যখন ও তাকাল, তখন দেখল, ঘরগুলো ধিক ধিক করে জ্বলছে। মানুষজন এদিকে নেই। দূরে তখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ঘন কালো অন্ধকার সর্বদিক ছেয়ে রয়েছে। শেয়ালের ডাক ব্যাঙের ডাকও শোনা যায় না। তারাও বোধহয় মনিষ্যিদের এই পাগলামীতে ভয় পেয়েছে।

বুঝতে পারছে ও। কাইজা লেগেছে। মদন এখানকার হাওয়া-বাতাস জানে না। পদ্মদিদিই খবরটা তাদের প্রথম দিয়েছিল।—শুনছ নি খপর? কইলকাতায় জবর কাইজা হইয়া গ্যাছে। শ্যাখেগো সব কাইট্যা কুচিকুচি করছে। এয়ানে শ্যাখের পো'রা খেইপা গ্যাছে। তারা জোট বাইন্ধা জটলা করত্যাছে। লাইগ্যা গেছিল। থামাইয়া দিছে দুই-জন কত্তায়। আমাগো বাবু বদনচাঁদ আর ওয়াগো ছাদেক ফকির। ছাদেক ফকির নি কইছে, এউগ্‌গা হিন্দুও যান পিট্টি না খায়! হ, মানুষের মত মানুষ ছাদেক ফকির।

পদ্মদিদির মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল।—আমার নি ডর করে লো। ধড়ে আমার প্রাণ নাই।

সত্যিই পরাণটা তার থাকল না। তার চোখের সুমুখে আজ পদ্মদিদিকে পিটিয়ে মেরে ফেলল ওরা।

হিন্দু-মুসলমানে মারামারি। সাত-জম্মেও শোনে নি ওরা। কলকাতায় দাঙ্গা হয়েছে তা এখানে কি? তাদের ভয়টা কি?

পদ্মদিদি বলেছিল—আলা তুমি এক্কারে বোগদা। হাট-বাজার বন্ধ। দুয়ো পক্ষ বালু দিয়া রামদাওয়ে শাণ দিত্যাছে।

কয় কি কথা। দু'পক্ষ রামদায়ে শাণ দিচ্ছে।

পদ্মদিদি হক্ কথাই কয়েছিল। তার ধড়ে সত্যি এখন আর প্রাণ নেই।

কাঁপতে কাঁপতে গাছ থেকে নেমে পড়েছিল মদন। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল কুমির ঘরে।

আসতে আসতে ওর চোখ পড়েছিল একবার বিদ্যাধরীর ঘরের দিকে। মাঠের

ধারে বকুলতলায় ওই ছাপরটায় বিদ্যাধরী একা থাকে। গোটা দুই শেখের পো এসে যে কোন সময়ে ওর ঘরে ঢুকতে পারে। তারপর কি করতে পারে না পারে সে কথা ভাবা যায় না।

বিদ্যাধরীকে যদি ওখানে পিটিয়ে মেরে বকুলতলার ঘাটের পাঁকে পুঁতে ফেলে কেউ জানতেও পারবে না। কাইজা কাকে বলে মদন জানে না। বিদ্যাধরীও নিশ্চয় জানে না। কুমিও জানে না। আজ নিজের চক্ষে সে যা দেখল, তারপরে তার কোন সন্দেহ নেই যে এ গাঁওয়ে একটা হিন্দুরও ধড়ে মাথা থাকবে না।

চর দখলের কাইজা হয় দু'জমিদারে। তারা বরকন্দাজ লাইঠাল পাঠায়। লাইঠালে লাইঠালে কাইজা হয়। রামদা', সড়কি, তলোয়ার নিয়ে আব্বা-আব্বা রব তুলতে তুলতে এগোয়। একদল চর দখল করে। আর 'একদলের কিছু নিকাশ হয়। কিছু জখমী হয়।

এ কাইজা ত্যামন নয়। তামাম গ্যাশের শ্যাখ-হিন্দুরা কি কাইজা করবে? একি সম্ভব?

কুমির ঘরের দুয়ারের সুমুখে এসে দুয়ারে দুমাদুম ধাক্কা মারল মদন।

—কেডা? কেডা আইল?

কুমির গলার আওয়াজ শোনা গেল।

—আমি মদন। সক্কালে দুয়ার খোল।

মদনের গলার আওয়াজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে কুমি দুয়ার খুলল। মদন ঘরে ঢুকে মাটির ওপরে বসে পড়ল। অনেকটা পথ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসেছে। হাঁপাতে লাগল মদন।

—কি অইল, কোয়ানে গেছিলা? অমুন করো ক্যান?

মদন হাঁপাচ্ছিল। কথা বলতে পারছিল না।

কুমি দুয়ারটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে মাটিতে ওর পাশে বসে পড়ল।

—শুনলাম নি কাইজা লাগছে। ভাইবা মরি আমি। কোয়ানে গ্যালা, কি অইল।

দম নিয়ে মদন বলে উঠল,—পদ্মদিদির নিকাশ কইরা দিছে। ওয়াগো ঘরে আগুন লাগাইছে।

—কও কি কথা!

কুমি হাঁ করে রইল। মুখে আর ওর কথা নেই। ও শুনেছিল, কাইজা লেগেছে। কিন্তু এর ভেতর যে এত কারখানা হয়ে গেছে ও ভাবতেও পারে নি। পদ্মদিদিকে মেরে ফেলেছে! ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছে?

—হ'। অখনো চোখে ভাসে। ধুমা-ধুম পিটাইয়াঁ মাইরা ফালাইল। লাঠির একখান বাড়ি পড়ল মাথায়। মাথাডা দুইখান হইয়া গেল যেন নারকোলের মালা ফটাং কইরা ফাইটা গেল।

—ইস! এক্কারে মাইরা ফালাইল!

মদন জিরিয়ে নিল একটু। বুকের কম্পন তখনো সমানে চলেছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—এট্টু জল দে আমারে।

কুমি তাড়াতাড়ি উঠে কলাইয়ের গেলাসে এক গেলাস জল ভরল মাটির কলসী থেকে। জলের গেলাস হাতে নিয়ে বলল,—খাইছ নি কিছু?

—না।

—রইস। এট্টু গুড় দিয়া জল খাও।

উঠে একটা মাটির ভাণ্ড থেকে হাতে করে গুড় এনে ওর হাতে দিল। গেলাসটা হাতে তুলে দিল। গুড় আর জল খেয়ে মদন একটু যেন ঠাণ্ডা হোল।

কুমি ভাবছিল, মদনকে কি খেতে দেয়া যায়। রান্না-বান্না কিছু করে নি কুমি, ক'দিন ধরেই দেহে ওর বশ নাই। রাঁধতে ইচ্ছে করে না। যা হোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ে থাকে। কি খেতে দেবে মদনকে! নিশ্চয় মদনের খুব খিদে পেয়েছে।

মদনের মুখখানার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখবার জন্যে কুমি লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে দিল। ইস্, দেখছ নি কাণ্ড! মদনের বাঁ হাতের কনুইয়ের ছাল উঠে রক্ত কস বোরোচ্ছে। মুখখানা ঘামে ভিজে। শুকিয়ে আমচুরের মত হয়ে গ্যাছে। মাথার বড় বড় কেশরের মত চুল ভর্তি ধূলা ময়লা।

কাছে এগিয়ে এল কুমি। মদনের মাথার চুল বিলি দিয়ে আঁচড়ে দিল। বাঁ হাতখানা তুলে ধরে বলে উঠল,—ইরে, ব ইটা গ্যাল কি কইর‍্যা?

মদন নিজেও জানে না। বোধভাষ্যি কিছুই ছিল না ওর। দেখবার পরে একটু জ্বালা-জ্বালা করতে লাগল। বলল,—গাছের ঘরসানীতে ছাল উইঠ্যা গ্যাছে। যাইবার দ্যাও।

হাতখানা নামিয়ে নিল মদন।

—ঘরে চিড়া আছে। খাইবা?

মদন মাথা নেড়ে জানাল, দিতে পারে। খিদে পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু জুত করে বসে চিড়ে-গুড় চিবিয়ে চিবিয়ে রসিয়ে রসিয়ে খাবার মত অবসর নেই। সব সময়েই মনে হচ্ছে, এই বুঝি এলো।

কান পেতে ছিল মদন।

না। এদিকে ত্যামন গোলমাল শোনা যাচ্ছে না।

এদিকটায় আসবেই বা কেন? পাড়া বলতে এখানে কিছু নেই। বাবুদের বাড়ির পেছনে মস্ত পচা পুকুর। তারও অনেকটা পেছনে বাবুদেরই এই বিরাট চালতেবাগান। এখানে একটু স্থান দিয়েছে কুমিকে একখানি চালা ঘর তুলে থাকবার জন্যে। পচা পুকুর থেকে বকুলতলা পর্যন্ত এত বড় চত্বরে মাত্র দুটি চালাঘর। একটি কুমির। আর একটি খেপী বিদ্যাধরীর। আর জনমনিষ্যি নেই এদিকে।

তাই এদিকে দল-দঙ্গল নিয়ে কাইজ্যা করবে কার সঙ্গে?

একটু যেন নিশ্চিন্ত হোল মদন। হয়তো এদিকে কোন গোলমাল সহজে হবে না।

—দে', একমুঠো চিড়া-গুড় দে'।

ঘরে চিড়ে বেশি ছিল না। ,আধ ডালা ছিল। দু'দিন ধরে বাজারে হাটে যায় নি কুমি। চিড়া-মুড়ি-গুড় কোন কিছুই আনা হয় নি। আজ রাত্রে ও ভেবেছিল ওই চিড়ে ক'টা চিবিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে শুয়ে থাকবে। তা আর হবে কি করে?

মদনের সামনে চিড়ে আর গুড় আধ ডালা এগিয়ে দিল।

বেতের ছোট ডালাটা নিয়ে মদন খেতে লাগল। কুমি দেখতে লাগল। দেখতে কি ভাল লাগছে। কি তৃপ্তি! মদন খাচ্ছে। কুমির মনে হচ্ছে যেন ওর মনখানা তৃপ্তিতে ভরে উঠছে। ওর খিদে তেষ্টাও যেন মিটে যাচ্ছে। কি অবাক কারখানা!

ভেবে অবাক লাগে এমন তো তার কখনো হয় নি? নিজের খাওয়া নিজের দেহের তরুজুত নিয়ে ব্যস্ত ছিল এতকাল। এখন কি হয়ে গেল কুমি।

—পরাণডা যদি ছিড়া খ্যাখাইবার পারতাম।

কুমির চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল।

মদন নীরবে খাওয়া সেরে চৌকির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

কুমিও কোন কথা বলল না। এক ঘটি জল ঢকঢক করে খেয়ে একটা চ্যাটাই পেতে বাঁ-হাতখানার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। ডান হাতটা বাড়িয়ে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। থেকে থেকেই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠছে। অন্ধকার ঘরখানায় তিলে তিলে সময় কাটছে। রাইতখান পোয়ালে বাঁচন। আন্ধারে মিশকালো একটা ছায়ার স্তূপের মত মাটির ওপর পড়ে রয়েছে কুমি।

চালতে বাগানে একটা পাখী বিশ্রী ডাক তুলছে—কক্কর-র-র—

কাঠঠোকরা না কি কে জানে!

মদন পাশ ফিরল। ঘরে বড় গরম। ভাপসানী গন্ধ ঘরের ভেতর।

হঠাৎ কানে এল অনেক মানুষের চিৎকার। দূর থেকে চিৎকারটা ক্রমেই যেন কাছে আসছে। মদন লাফিয়ে উঠে বসল। বুকের ভেতরে ঢেকি পাড় দিচ্ছে। হাত-পা অবশ লাগছে।

কুমির গলা শুনতে পেল।—চিক্কুর কিয়ের?

মদন কথা বলতে পারছে না। দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

—চিক্কুর এই দিষ্টে আসে মনে লয়।

কুমি তাড়াতাড়ি মদনের পাশে চৌকিতে উঠে বসল।

হ্যাঁ, চিৎকার এই দিকেই আসছে। মদনের বুকে গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে। ও যেন বোবা হয়ে গেছে।

চালতে বাগানে অনেক মানুষের পায়ের ধপধপানী কানে আসে। আর রক্ষা নাই।

—হালা মদন কইরে! অই হালা মদন!

মদন চোখ বড় বড় করে তাকায়। পরিষ্কার শুনতে পায় মনছুর মিয়ার চিৎকার। তারই সন্ধান করছে মনছুর। তার সন্ধানেই এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু কেন, সে কি অপরাধ করেছে?

—অই হালা মদন, বাইর হ ঘর থিক্যা।

কুমি মদনকে দু'হাতে চেপে ধরে।

—দুয়ার খোল হালা। তোফাইয়া হালা—

দুয়ারে দুমাদুম ঘা পড়ে। মদনের সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে। বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। কুমি ওকে জড়িয়ে চেপে ধরে কানের কাছে মুখ এনে বলে,—ওই ঘুপচি দিয়া পাকের ঘরে যাও। পাকের ঘরে এট্টু পিছদুয়ার আছে। সেইডা খুইলা পলাও। সক্কালে পলাও। খেপীর ঘরে যাও।

মদন চৌকি থেকে নেমে পড়ে। দরজায় তখন ধমাধম আওয়াজ।

কুমি চিৎকার করে ওঠে,—কেডা দুয়ার ভাঙে! বাইরে কেডা?

একটা কুৎসিত গাল শোনা যায় উত্তরে।

মদন কুমির দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলে,—তুমি যাইবা না?

—না, আমি ওয়াগো আটকাইয়া রাখুম। তুমি সক্কালে পলাও।

মদন ঘরের বেড়ার ছোট ঝাঁপটা খুলে রান্নাঘরে ঢোকে। ওখানে অন্ধকারে হাতড়ে দেখে চালতে বাগানের পিছনের দিকে একটা ছোট পিছদুয়ার। ওখান থেকে ঘাটে যাবার পথ।

মদন দাঁড়ায় একটু সময়। পা দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে।

—মদন হালা কোয়ানে। ক’ সক্কালে।

মনছুরের গলা। কুমিকে বোধহয় শাসাচ্ছে মনছুর। কুমি কি দরজা খুলে দিয়েছে, না দরজা ভেঙে ফেলেছে ওরা? মনছুরের কাছে কি অপরাধ করেছে ও! অপরাধ করেছে। সেদিন কালাকান্দিতে মনছুরকে মেরেছিল সে, আর সে পরমার বন্ধু পরমাকে না পেয়ে তাকেই মারতে এসেছে।

মদন পিছনের দুয়ারটা খুলে অন্ধকারে চালতে বাগানে বেরিয়ে পড়ে। ঘন অন্ধকার। অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোয়। এদিকটায় জনমনিষ্যি নেই। ভিড় সব ঘরের আগদুয়ারের কাছে।

চালতা বাগান পেরিয়ে সরু রাস্তাটা ধরে দৌড়োতে থাকে মদন বকুলতলার দিকে।

কানে আসে কুমির গলাচেরা একটা আর্তনাদ। আর্তনাদের ভাষাটা বোঝা যায় না। একটা ভয়ঙ্কর বীভৎস আর্তনাদ। কে জানে ওর পেটে সড়কি বা কোচ বসিয়ে দিয়েছে কি না! না কি রামদা’ দিয়ে কোপ বসিয়েছে কাঁধে।

প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে বকুলতলার কাছাকাছি এস পড়ে মদন।

কুমির ঘরের ওদিক থেকে ভয়ঙ্কর চিৎকার ভেসে আসে। অন্ধকারে বন্য উল্লাসের গর্জন। আগুন ধরিয়ে দিয়েচে। কুমির ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা।

ঘামেভেজা দেহখানা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মদন। শ্বাস ফেলতে পারছে না।

কুমি আর নাই। কুমিকে ওরা নিকাশ করে দিয়েছে।

দূরে ঘরজ্বালা আগুনের দিকে তাকিয়ে মদন হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

কুড়ি

প্রাণপণে ছুটে চলেছে মদন আর বিদ্যাধরী। ওপরে কালো আকাশ আর সামনে ধু-ধু অন্ধকার মাঠ। সামনে সার দেয়া নায়ের পাটাতনের মত কঠিন কালো অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। পথের দিশা পাওয়া যায় না। পায়ের নিচে আগাছা কাঁটার জঙ্গল পড়ল কি না বোঝা যায় না। তবু চলতে হবে। যেমন করে হোক ছাদেক ফকিরের আস্তানায় পৌঁছতে হবে।

বিদ্যাধরীর একটা হাত ধরে রয়েছে মদন। ভয়ে শক্ত চিপিতে হাতখানা চেপে ছুটে চলেছে।

দু-পাশে ক্ষেত। কিছু দূরে দূরে মিশকালো ছায়ার মত গাছ-গাছালীর ভেতরে বসতি। এ সব ছোট ছোট বসতিগুলো শান্ত ঠাণ্ডা। একটু আওয়াজ পর্যন্ত নেই। ক্ষীণ আওয়াজ এখনো ভেসে আসছে—দেয়াইল গাঁও থেকে। ওখানে বাবু বদনচাঁদ সরকারের বাড়ি। তা ছাড়া হাটবাজার, ঘোঁট বৈঠক সবই ওখানে। ওখানে গোলমালটা বেধেছে আজ।

বিদ্যাধরী দাঁড়াল। মদনও দাঁড়াল।

পিছন ফিরে দেখল বিদ্যাধরী দেয়াইল গাঁওয়ের কোথাও কোথাও আকাশটা লালচে। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ঘরে। কে পালিয়ে বেঁচেছে আর কে মরেছে কে জানে। দেখনের ভাবনের কো'ন সময় ছিল না।

হা হা রব শুনে বিদ্যাধরী তখন ঘর থেকে উঠোনে বেরিয়ে এসে বোঝবার চেষ্টা করছিল। ব্যাপারখানা কি! এত ডাব চিক্কুর কি কামে? হুনা হুন ওর কানে এসেছিল যে শ্যাখরা সকাল থেকে ঘোঁট পাকাচ্ছে। পরমা হালুইকরের কাণ্ডটা নিয়ে বেশ গণ্ডগোল হয়ে গেছে বিয়ানে হাটখোলায়। বিদ্যাধরী সবই শুনেছিল। এ মহল্লার কোন বার্তা তার জানতে বাকী থাকে না। পাঁচ দুয়ারে যায় সাঁইয়ের নাম নিতে নিতে। পাঁচ দুয়ারের পাঁচ কথা তার কানে আসে। ও রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাবল, কি হলো? কাইজা কি লাগল না কি?

মনখানা হুস্ করে উড়াল দিল মদনের সন্ধানে। মদনডা এয়ানে নতুন মানুষ। কে জানে কোথায় যেতে কোথায় যাবে, লাঠির বাড়ি খেয়ে পড়ে থাকবে ঘুপচি-ঘাপচিতে। ও জানে মদন আবার গেছে কুমির ঘরে। কুমির খাঁচায় গিয়া বন্ধ হইছে। এউগ্‌গা খাঁচার ভিতর আরেক খাঁচায় বন্ধ হইল নি! কে

জানে! পাখীর সন্ধান পাইল না। খাঁচার খোঁচায় জখম হয়ে না যায়। বেচারা কালা মদন!

তবু রাত্রে ডাকচিৎকার শুনে আব্বা রব শুনে ওর মদনের কথাটাই মনে হয়েছিল আগে। মানুষটা ভাল থাকে তবেই ভাল। গাঁয়ের ঘাপ্‌ঘোপ্ জানে না। কি করতে কি হয়ে না যায়।

এরি ভেতরে ছুটে এসেছিল কালা মদন।

আথালি-পাথালি অবস্থা। চক্ষু তারা তারা। গলার জোর দমের জোর একারে শেষ হয়ে এসেছে।

এসেই ওর হাতখানা চেপে ধরে বলল,—সক্কালে পলাও। আলারা আইল বইল্যা।

—আইল কেডা? কি অইছে?

বিদ্যাধরী চমকে তাকাল।

—মনছুরের দলবল। আর কুমিরে মাইর্‌যা ফালাইছে। এই দিষ্টে ধাওয়া করছে।

বিদ্যাধরীর বড় বড় চোখদুটো থমকে রইল। কুমি নেই! কুমির খাঁচাটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভয়-তরাসের কারখানা চলেছে। কি কথা শোনাল মদন।

হাত ধরে টানল মদন।—চলো পলাই।

হৈ হৈ চিৎকারের শব্দটা ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। অন্ধকার বাতাসে বাতাসে বুকে কম্প উঠেছে।

বিদ্যাধরী স্থির হয়ে রইল কিছু সময়।

কোথায় যাবে? বাবুদের বাড়ি? না বাবুদের বাড়ি গেলে কোন লাভ হবে না! কে জানে যে বিষ ওদের কণ্ঠ ছাড়িয়ে মাথায় উঠেছে সে বিষে জ্বালিয়ে দেবে কি না বাবুদের বাড়ি। এ বিষ নামানর রোজা আছে একটি এ তল্লাটে। ছাদেক ফকির। ছাদেক ফকিরের কাছেই যাবে বিদ্যাধরী। তাকে গিয়ে জানাবে সব। একমাত্র ছাদেক ফকিরই পারে এ বিষ যাদের মনকে জারিয়েছে—তাদের দেহ থেকে বিষ নামাতে।

চোখদুটো জ্বালা করছিল বিদ্যাধরীর। ছাদেক ফকির থাকতে এমন কারখানা ঘটে গেল।

মদনকে বলল,—যামু। ছাদেক ফকিরের কাছে যামু।

মদন ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।—শ্যাখের বাড়ি যামু? কও কি?

—হ, তাই যামু। ফকির দাদু নাইলে এ ব্যাড়া আগুনে বাঁচনের পথ নাই।

বিদ্যাধরী টানল মদনকে।

ওদিকের আব্বা আওয়াজ যেন এদিকে এগিয়ে আসছে মনে হোল! আর দেরী করা কাজের কথা নয়। ওরা ছুটল ওখান থেকে। বকুলতলা ছাড়িয়ে মাঠে নামল। ছুটছে তো ছুটছে। মাঠ পেরিয়ে একটা বিরাট বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে গিয়ে পড়ল সড়কে। সড়ক ধরে ছুটল। দু-ধারে শুধু অন্ধকার। ওপরে কালো আকাশ।

ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় এসে দাঁড়াল বিদ্যাধরী।

বিদ্যাধরী হাঁপাচ্ছে। মদন হাঁপাচ্ছে তার চেয়েও বেশি। পিছনে ফিরে তাকাল বিদ্যাধরী। দূরে দোয়াইল গাঁওয়ের কোথাও কোথাও আকাশটা লালচে। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বিদ্যাধরীর ঘরখানা নিশ্চয় পুড়ে খাক হয়ে গেছে। আর ক'খানা ঘর জলছে কে জানে।

মনটার ভেতরে হাতড়ে বেড়াচ্ছে বিদ্যাধরী। একটা জবাব খুঁজছে। কেন ওরা মানুষ মারছে। কেন ওরা ঘরে আগুন দিচ্ছে। কি চায় ওরা? কি চায় ওরা নিজেরাও বোধহয় জানে না। রক্ত যদি বিষিয়ে যায়। সে বিষ যদি মাথায় ওঠে তবে পাগলের মত চারদিক সে লণ্ড-ভণ্ড করে বেড়ায়। কেন যে করছে তা নিজেও জানে না।

কুমিটাকে মেরে ফেলেছে। কেন? ওরা কুমিকে কেন মারল? কুমি ওদের কাছে কি অপরাধ করেছিল? ওরা জানে না। ভাবন-চিন্তনের মন ছিল না। এখানেই এর শেষ নয়। পরমারা যখন শুনবে এ সব কথা, ওরাও হয় তো মনছুরের দুটো বাচ্চার মা নাজমাবিবিকে এমনি করেই মেরে ফেলবে। একবারও ভাববে না নাজমাবিবির কি অপরাধ!

—কোয়ানে আইলাম?

ভার-ভার গলায় বিদ্যাধরী বলে,—বিলের কাছে।

ব্যাঙের ডাক কানে আসছে। অন্ধকারে ভাল করে তাকালে সামনে দেখা যাচ্ছে চিকচিকে জল।

বিদ্যাধরীর বড় বড় চোখদুটোয় জ্বালা ধরেছে।

এই বিলের ধারেই তার বাবাকে মেরেছিল নাটা জুড়ান। নাটা জুড়ান কেন তার বাপকে মেরেছিল নিজেও জানত না। বিষ উঠেছিল নাটা জুড়ানের মাথায়। এ যে কিসের বিষ সবাই জানত। কে - জানত নাটা জুড়ান কেন মেরেছিল দাস খ্যাপাকে!

আজ মনছুরের মাথায় সেই একই বিষ চড়ে উঠেছে। মনছুর নিজেও মরবে! এ বিষ থেকে ওর নিজেরও নিস্তার নেই।

—উই ডাইনমুড়া ফকিরদাদুর ঘর। লও যাই।

মদনের হাত ধরল বিদ্যাধরী।

ওরা ডানদিকে ঘুরে আরও কিছুটা পথ হাঁটল। জোলাদের ঘর ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে একটা মাঠের মধ্যে ছাদেক ফকিরের আস্তানা। চার-পাঁচখানা মস্ত মস্ত ছনের ঘর একটা ঘরে আলো জ্বলছে। চাপা কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসছে। একটা আলোর নড়াচড়া দেখল ওরা।

থমকে দাঁড়াল মদন।

—কি অইল ?

মদন ভয়ে ভয়ে বলল,—আমি যামু না।

—ক্যান ?

—ছাদেক ফকিরবে তুমি চিন ?

বিদ্যাধরী বিরক্ত হোল।—আজাইরা ভয় পাইও না। ফকিরদাদুবে শুাথ-হিন্দু ভাইব না। ফকিরদাদু মানুষের সাদন করে।

মদনের ভয়ে অবিশ্বাসে বিদ্যাধরী ক্ষুব্ধ হয়েছে। ফকিবদাদু মুসলমান নয়, হিন্দু নয়, ফকিরদাদু মানুষের সাধন করে। মানুষ জানে, মানুষ চেনে। মানুষ তাব কাছে সর্বস্ব।

মদনকে টানতে টানতে নিয়ে আসে বিদ্যাধরী।

মস্ত উঠানে দু-চাবজনেব কুপি নিয়ে আনাগোনা দেখতে পায়।

—কেডা ?

বিদ্যাধবীর সামনে একটা লোক আসে। গায়ে আলখাল্লা, মুখে দাড়ি। মদন ভয়ে পেছনে দাঁড়ায়।

আমি বিদ্যাধরী। ফকিরদাদু কোয়ানে ?

লোকটা বলে,—ঘরে।

বিদ্যাধরী মদনকে নিয়ে এগোয়। ঘরে আসে। ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালান। ছাদেক ফকির একটা কম্বলের ওপর বসে রয়েছে। সাদা লম্বা দাড়ি। গলায় একটা মস্ত মালা। আলখাল্লা পবণে। চোখদুটো বড় বড়। বিষণ্ন দৃষ্টি।

—কেডা ?

—আমি বিদ্যাধরী।

—দাস খ্যাপার মাইয়া। বইও।

মদন আর বিদ্যাধরী বসে ঘরের একপাশে। বিদ্যাধরীর মুখখানা শান্ত হয়ে আসে। মদন বিদ্যাধরীর গা ঘেঁসে বসে।

ছাদেক ফকির দাড়িতে হাত বোলায়। আস্তে আস্তে কথা বলে। গলাব স্বরটি মিহি মিঠা শোনায়।

—হাবিব মোল্লারে কত কইর‍্যা কইলাম, আগুন জ্বালাইও না। কথা শুনল না। ধর্মের জিগীর তুইল্যা কাইজা বাধাইল। কি করুম কও দেহি। পারলাম না। বাঁচাইব্যার পারলাম না।

গলার স্বরটা নরম ভেজা ভেজা মনে হোল।

মদন আর বিদ্যাধরীর দিকে তাকিয়ে বলল ফকির।—তোমরা পলাইয়া আইছ?

—হ।

—বুঝছি। নাজিররে পাঠাইছি তোমাগো গাওয়ে। আরও পাঁচজন গেছে।

বৃদ্ধ ছাদেক ফকির চোখদুটো বোজে। —জানি, এ আগুন নিবনের না। জ্বইলা পুইড়্যা খাক কইর‍্যা দিব।

বিদ্যাধরীর চোখদুটো টলমল করছে। কথা বলতে পারল না ও।

ছাদেক ফকির আপন মনেই যেন বিড় বিড় করে।—সাইয়ের আশমান সাইয়ের জমিন, এয়া লইয়া মানুষ ক্যান কামড়া-কামড়ি কইর‍্যা মরে!

লণ্ঠনের নেভা নেভা আলোয় ছাদেক ফকির ধরা গলায় বলে আবার।—মানুষেক থিক্যা বড় অইল জাইত? আজব কারখানা।

বিদ্যাধরীর চক্ষু দুটোয় চকচকানি নেই। কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে খেপী। হায়রে খেদের কথা! মানুষের চেয়ে বড় হোল জাত! ছাদেক ফকিরের কথা ক'টা বুকের ভেতর নড়াচড়া করে। আর কোন কথাই ও ভাবতে পারে না, কিছু বলতেও পারে না; বোবা হয়ে গেছে বিদ্যাধরী।

তার কালা মদন ফিরে এসেছে। কিন্তু কি যন্ত্রণা বুকে করে এল মদন!

মদনের হাতটা ধরল বিদ্যাধরী।

খেপীর হাতখানা ঠাণ্ডা। থরথরিয়ে কাঁপছে। খেপীর চোখে খুশি নেই, বুকে উজান রসের স্রোত নেই। খেপী আজ বোবা হয়ে গেছে।

ছাদেক ফকিরের কথা শুনে মদনের পরাণটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগে। মানুষের চেয়ে বড় হোল জাত?

কথায় কথায় এমন কথা তো কেউ কয় না।

—ভয় নাই। তোমরা ঘুমাও এয়ানে।

বলে ছাদেক ফকির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লণ্ঠনের আলোটা দু'বার দপ দপ করে উঠল। তেল ফুরিয়ে এসেছে বোধ-হয়। বাতি নিভে যাবে।

বাইরে লোকজনের চাপা গলার আওয়াজ। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক। আর কোন সাড়া শব্দ নেই। লণ্ঠনটা এবার সত্যিই দপ করে নিভে গেল।

মদন খেপীর একখানা হাত জড়িয়ে ধরল। মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে সর্ব দেহ ঝিমঝিম করে এল। চোখের পাতাদুটো টেনে আসছে। এতক্ষণের দাপাদাপি ভয়-তরাসের পরে দেহটা যেন এলিয়ে পড়তে চায়।

খেপীর হাতখানা টেনে নেয় বুকের কাছে।

রাত পোয়াতে আর দেরি নেই। এরি মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মদন। খেপীও তার মাথার কাছে শুয়ে ছিল।

খেপীর হাতখানা তার হাতে ধরা ছিল। হাতে টান পড়তেই ধড়ফড়িয়ে উঠল মদন। খেপী উঠে বসেছে। ভোর বিয়ানের ফুরফুরা বাতাস আসছে। বাতাসে ভেসে আসছে কানে ছাদেক ফকিরের গলার আওয়াজ। মিহি সুতার মত তিরতির করে ভেসে আসছে আওয়াজের রেশ।

"তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে। অ তর ডাক শুইন্যা সাই চলতে না পাই। আমারে রুইখা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে। তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।"

ছাদেক ফকিরের আওয়াজে যেন কাঁদনের কম্প তোলে। ভোর বিয়ানে পাখীর কিচিরমিচির। হাওয়ায় হাওয়ায় ডাল-পাতার ঝিরঝিরানি।

ফকিরের আওয়াজ যেন মনডারে মোচড় ছায়।

বড় খেদ, বড় দুঃখের কথা। সাইয়ের দরবারে কাঁদনের নালিশের মত শোনায়।

বিত্যাধরীর চক্ষু দুটোর নাচন নাই। রস-খুশির টলটলানি নাই। বোবা হয়ে গেছে খেপী। চক্ষু দুইটায় দিষ্টি নাই। ক্যাবল ফ্যালফ্যালানি চাওন।

ঘরের বাইরে এল বিত্যাধরী। উঠোনের একটা কোণে মস্ত এক ঝাপড়া চাঁপা গাছের নিচে ঘাসের ওপর বসে রয়েছে ফকির। সাদা লম্বা দাড়ি। চক্ষু দুইটা বোজা। আওয়াজে বুকের ভিতরের কাঁদন-বেদন জানাচ্ছে ফকির। দুঃখ-খেদের নালিশ জানাচ্ছে।

ঠায় বসে রইল বিত্যাধরী দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে ঠ্যাসান দিয়ে। মদন বসে রইল ঘরে।

বেলা বাড়ল। আইসজন-যাইসজন কেউ নাই। মানুষের গতাগতি নাই বললেই চলে।

সব যেন ক্যামন থমথমা। তালপাতায় জোর বাতাস দিলে বুকে কম্প লাগে।

ফকির বলল বিদ্যাধরীকে।—পাঁচ-দশ গাও নিকাশ হইয়্যা গ্যাছে। এ আগুন আর নিভনের না। তোমাগো গাঁয়ের মনছুর রহিমদ্দিরে মারছে। আগুন জলছে ভাল মতে। এ আগুন আর নিভনের না।

বোবার মত চেয়ে রইল বিদ্যাধরী। মদন তারা চোখে তাকাল ফকিরের দিকে। তার কাছে না এলে এতক্ষণে তাদেরও নিকাশ হয়ে যেত। মনছুর মরেছে। রহিমুদ্দি মরেছে। কে মেরেছে। নিশ্চয় পরমা হালুইকর। তাকে আবার মারবে হয়তো মোবারক।

ফকির কি করে কি জানল কে জানে। বললে—সে সব জানে। এও জানে যে এর পরে মদন আর বিদ্যাকে বাঁচান যাবে না। তাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। ইস্টিমারে নিরাপদে তুলে দেবে ফকিরের লোকজন। তারা চলে যাক। এখানে থাকলে প্রাণে বাঁচবে না।

বিদ্যাধরী এতক্ষণে যেন একটা বড় শ্বাস ফেলার মত বলল,—কোয়ানে যামু?

ফকিরের টানা টানা চোখ দুটো ভিজে ভিজে মনে হোল। খেপীর মাথায় হাত বোলাল। কোন কথা বলল না। বোধ হয় বুকের হাওয়া কণ্ঠে এসে আটকে ছিল। কথা বলতে পারল না।

আর কোন কথা নয়। বেলা থাকতে থাকতে মাঠ ভেঙে চলল ওরা। সঙ্গে ফকিরের দুজন মানুষ। ওদের পৌছে দেবে স্টিমার ঘাটে। সেখান থেকে স্টিমারে ভাসবে ওরা। কোথায় যাবে জানে না।

পড়ন্ত বেলায় ঘাটে এসে পৌছল ওরা। ফকিরের মানুষ দু'জন ওদের টিকিট কেটে উঠিয়ে দিল স্টিমারে। ভাইটাল স্টিমার। যাবে সিরাজগঞ্জ। সেখান থেকে রেলগাড়ি। তারপর? তারপর সাইয়ের নাম ভরসা।

ইস্টিমারে ফিসফিসানি গুজগুজানি ছিল, কিন্তু তেমন কোন তরাস ছিল না। গণ্ডগোল যা কিছু বেধেছে এই মুল্লুকে, অন্যদিকে ত্যামন লাঠালাঠি বাধে নি। মানুষে মানুষে গজলা ছিল। ঘোঁট পাকান ছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

ভোঁ দিয়ে ছাড়ল ভাইটাল। সন্ধ্যার পরে পৌছবে সিরাজগঞ্জ।

বিদ্যাধরী মদনের হাতখানা ধরে ছিল। শুকনো লিচুর মত দুটো মস্ত মস্ত চোখ ওর থির পাথর হয়ে গেছে। মুখে আওয়াজ নেই। বুকের ছলবলানী নেই। বুকের হাওয়া থম্ ধরে রয়েছে।

মদন ওকে নিয়ে এল ইস্টিমারের একতলায় ইঞ্জিনের পাশে মোটা কাছির

ধারে। বিরাট মোটা কাছি দড়ি পাকান রয়েছে সাপের মত। তারই পাশে উবু হয়ে বসল ওরা। তারা তারা চোখে তাকায় মদন এধারে ওধারে। না, ত্যামন মানুষ-জন নেই এদিকটায়। বসে রইল কিছুক্ষণ।

কোথায় চলেছে কে জানে। সঙ্গে কিছু নেই। শুধু বিদ্যাধরীকে নিয়ে আজ ভেসে চলেছে। ত্যানা নেই, কাম্বা নেই। পোঁটলা নেই, পয়সা নেই, কিছুই নেই। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, প্রাণদুটি নিয়ে ভেসে চলেছে তারা, কোথায়, তাও জানে না।

বিদ্যধরী ক্যাল ক্যাল চোখে তাকায় মদনের দিকে।

কি করতে কি হয়ে গেল! তার সরিঙ্গা, একতারা, ডুবকি, কিছুই আনা হয় নি। সেগুলো কি আর আছে। ঘরের সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে গেছে। বকুলতলার ছাপরাখানা চোখের সুমুখে দেখ্‌তে পায় খেপী। বকুলতলার পুকুরের জলে হিঞ্চে আর কলমীর সবুজ পাড়ের ঘাসের সবুজের সঙ্গে মিলেমিশে গ্যাছে পশ্চিম কোণে। টুপ্‌, টাপ, বকুল ফুল পাতা ঝরে পড়ে নিথর জলে। ধু-ধু মাঠের শেষ কিনারায় গাছ্-গাছালীর মাথার ওপর মস্ত আকাশ।

বিদ্যাধরীর চোখের পাতা দুটো থরথরিয়ে কাঁপে।

মদন বড় একটা শ্বাস ফ্যালে। কুমির চোখ দুইটা অখনো ভুলতে পারে নি মদন। অখনো সেই মরা মাছের চোখের মত দুঃখে-ভরা চোখ দুইটা মনের ওপর ভাসে। তার মুখখানি দু'হাতে ধরেছিল কুমি। তারপর কাঁদন-কাঁদন গলায় কয়েছিল—পরাণডা যদি ছিড়্যা দ্যাখাইবার পারতাম! তুমি গোসা করতা না।

নদীর ফন্‌ফনে বাতাসে সেই গলার কাঁদন কানে শুনতে পায় মদন।

উঃ! বুকখান বুঝি ভাইঙ্গা গুড়া হয়ে গেল! চোখদুটো জ্বালা করে। জলে ভরে আসে।

রামদায়ের কোপে কেটে ফেলেছে কুমিকে। কুমির অন্ধকারফাটা আর্তনাদ। মদনকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজের পরাণডা দিল কুমি।

ইস্টিমারের চাকার ঝমঝমানি ছাপিয়ে কানে আসে কুমির আর্তনাদ!

বিদ্যাধরীর কাঁধে হাত রাখে মদন।

মস্ত মস্ত চোখদুটোয় নদী টলমল। বাধাল বুঝি মানে না আর।

উপরে আসমান, নিচে নদীর টান, দূর জমিনে কোথায় সাঁই নিশানা রেখেছে কে জানে!

মানুষে মানুষ চিনল না। মানুষে মানুষের খপর পাইল না!

তুফান উঠল বক্ষে। বক্ষ-ভাঙা হাওয়ার উথাল-পাথাল।